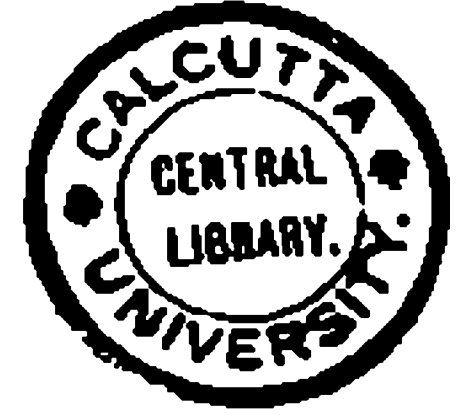


স্বস্ত্য ১ ০ ১৫ ২২
১৬৫৮ - ১৬৫৯

3705
8h 45

শিক্ষা



ম দি কল্যাণকর কলিঙ্গ চরিত্রি ভাও গচ্চতি

১০ম বর্ষ

অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

১ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষার দশম বর্ষ

নবম বর্ষ পার হইয়া এই অগ্রহায়ণে শিক্ষা দশম বর্ষে পড়িল। নব বর্ষের নূতনায় আমরা সকল স্তম্ভকর্ষের যিনি উৎস ঠাহারে বন্ধনা করি। আর শিক্ষার লেখক, গ্রাহক, পাঠক ও তড়াহুদারী সকলকে সাগর অন্তিমখন জানাই। আমাদের প্রচেষ্টা শুভকর হউক। মুগোপগোপী ও নিত্য-কালের শিক্ষার আদর্শের কথা গেন 'শিক্ষার' লেখার মধ্যে স্মরণ ও সন্তোজ উদীতে কুটিয়া ওঠে, পাঠকের মনে যেন আশ্রয়প্রত্যয় ও আশা আগে।

চারিদিকে আজ যে মানি ও হতাশার ভাব দেখা দাইতেছে, তাহা তো একা কোহ দূর করিতে পারিবে না, তাহার অগ্র চাই স্মরণকর আশ্র-প্রত্যয়বান উদার ভাবনাশীল প্রাণরূপে পরিপূর্ণ, শিক্ষিত অনুমানস। এই মনের অগ্র চাই সাধনা, শিক্ষার ও সংকল্পিত সাধনা। সকল সমস্তার সমাধান করিতেই শিক্ষার প্রয়োজন। দেহের শক্তি মনের বীৰ্য প্রাণের আনন্দ আশ্রয় আশ্রয় সবই কি আমরা শিক্ষার বলেই লাভ করি না? আমাদের

কাগজখানা সেই শিক্ষার আদর্শের চুই চারিটি দাবীও যেন পাঠকের মনে সত্য ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা গইয়া নূতন বৎসরের কাগজ প্রকাশ করা হইল।

প্রাণ্ডি স্বীকার

পশ্চিম বংগের প্রগাম শিক্ষক সমিতি হইতে প্রথম প্রকাশিত 'বুলেটিন' আমরা পাইয়াছি। সমিতির বিপোর্ট, মাসামিক শিক্ষা বোর্ডের আলোচনা, বিভাগের লাইব্রেরীতে কাজ, মাসামিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লাইব্রেরীতে কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে। প্রধান শিক্ষকদের সংবন্ধ আলোচনা অবতাই ভাল লাগিবে।

সবজাএত এশিয়ায় শিক্ষার বিস্তার

বিগত ২০শে শতাব্দীর দ্বিতীতে পশ্চিমপূর্ব এশিয়া শিক্ষকপরিষদের উদ্যোগন উপলক্ষে ভারত সরকারের বাহানদ্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারীর অতিভাবণের কয়েকটি কথা যেন ভাল লাগিয়াছে। বহু কাল পর এশিয়ায় নব আগরণ আসিয়াছে, এবং এশিয়া স্বাধীনৈতিক চেতনা লাভ করিয়াছে হুতরাং আজ

সাহিত্য, বৃত্তকা ও নিবন্ধরূপে এই তিন অঙ্গিনাম
হইতে যেন কৈ দৃষ্টি করিয়া গুরু সকলেরই উৎসাহ
হওয়া যুক্তব্য। যেনও বালক-বালিকাগণের মধ্যে
শিক্ষা বিস্তার ও গুরু জীবনযাত্রার প্রশালীযোষ
জাগ্রত করাই এই সকল অভিযান দূর করিবার
সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই সমস্তগুলির সমাধানের
জন্য পাবনাদিক সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের
প্রয়োজন অপরিহার্য। এই পরিদর্শন ও এই ধরনের
সম্মেলনগুলি যতিমানবক্তব্যগণের দৃষ্টি সর্বত্র সজাগ
বাকেন তবেই তাঁহাদের আশা আশোচনা সার্থক
হইবে। রাজকুমারী ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির
উন্নয়ন করিয়া যখন যে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য
অমূল্য শিকড়ের গুরু বলা হয়। শিক্ষক গুরু
তবেই ছিলেন না, তিনি দিগ্বিদ্যার উপাধী,
পরিচালক ও বন্ধুও ছিলেন। আজও যেন শিক্ষা
বিস্তার এখনই ব্যাপক ও সার্থক হইবে যখন শিক্ষক
আবার প্রকৃত গুরু হানে সমালীন হইবেন।

পশ্চিম বঙ্গের মুক্তম প্রদেশপাল

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বহুদিন শিক্ষার
কাষে ব্রতী ছিলেন; শিক্ষকজীবনের অঙ্গবর্ষসম ও
যাত্রার ছবি তাঁহার ভাল করিয়া জানা। তাঁহার
মাননীলতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সর্বজন জীবনযাত্রা
প্রশালী এবং উচ্চ আশর্মে নির্ভর পরিচয় শুধু
বাক্যালী সমাধে আবৃত নয়। বিধান পরিষদে
সহকারী সভাপতির পদে সমালীন হইয়া তিনি
রাজ্যলীর মুখোচ্চল করিয়াছেন। মহাস্বাভাব নৈতিক
আশর্মে তাঁহার অসীম প্রভা। ডক্টর কৈলাস নাথ
কাটজু কেন্দ্রীয় দপ্তরে যাত্রার, ডক্টর মুখোপাধ্যায়
পশ্চিম বঙ্গের গভর্নরের পদে সমালীন হইলেন এ
দাবাবে, বাক্যালী যাত্রারই আনন্দ, শিক্ষকদের বিশেষ
করিয়া আনন্দ। শিক্ষার চূর্ণণার প্রতিষ্ঠার হইবে
কি না জানি না, কিন্তু এখন শিক্ষকেরা যেন খুলিয়া
নিষেধের অস্তর অভিযোগের কথা বহনী গভর্নরের
গোচর করিতে পারিবেন, মহাশক্তি পাইবেন,

হয়তো সভা সভা প্রতিষ্ঠার একটা পথ খুলিয়া
বাইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষক-প্রদেশপালকে
'শিক্ষা' পত্রিকা পদম প্রচার সহিত স্বাগতসন্ধ্যা
জানাইতেছে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-অভিভাষণ

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে
ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় যাত্রার যে কয়টি
কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক তাৎপর্য কথা
আছে। তিনি বলেন যেনও নানা স্থানে নেতৃত্ব
ও তাঁহাদের পরিচালিত জনসাধারণের মধ্যে জনম
যে ব্যাধানের সৃষ্টি হইতেছে তাহা অনতিবিলম্বে
সংকীর্ণ করিয়া আনিতে চাইবে। সমস্ত সমাধান
শিক্ষামূলক নিমোহবর্তিত। ও সংস্কৃতির মধ্যে
নিহিত। কেবল ইহাদের দ্বারা নেতৃত্ব করিবার
যোগ্যতা ভয়ে ও সাধারণের সহিত অতিদূরত্ব বন্ধ
করা যাই। বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সমস্যার সাধনের
দাবিরও শিক্ষিত ব্যক্তির উপর দৃষ্টি।

তিনি বলেন, স্বাধীনতালাভের সহিত বিশ্ব-
বিদ্যালয়সমূহের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশি
হইয়াছে। যেন এখন স্বাভাবিক ও শাসনকার্যে,
শিল্প ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও জ্ঞানানুসন্ধান কার্যে সকল
ব্যাপারেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নেতা পাইবার
আশা করে। সুতরাং বিভিন্ন বৃত্তিতে ও জনসেবার
নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা দেওয়া বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের
শিক্ষার অন্ততম লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক। উপযুক্ত
শিক্ষার অর্থ, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব বিষয়ে
ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করিতে হইবে।

ইংরাজি ভাষাকে অসহেলা করিবার ও পাঠ্য-
তালিকা হইতে অপসারিত করিবার যে চেষ্টা
বর্তমানে স্থানে স্থানে দেখা বাইতেছে তাহার
উন্নয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে
শিক্ষাব্রতী হিমায়ে তাঁহার ইহা মোটেই ভাল মনে
হয় না। তিনি মনে করেন ইংরাজিকে অসহেলা
করিলে আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের গ্রামে আসন হস্তোৎসাহিতা ফেলি। তাঁহার উক্তিও একটি অংশে কেহ আপত্তি করিবে না। ইংরাজি বর্তমানে বিশ্বভাষা, ইহার মাধ্যমে আমরা অপত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রে সফল ভাবে আপন প্রদান করিতে পারি। সে হিসাবে ইহার মূল্য অনস্বীকার্য, কিন্তু ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যোগাযোগের অন্তর হস্তোৎসাহিতা বর্তমান মন বিশ বৎসর ইহার প্রয়োজন তুচ্ছ নয় কিন্তু আমাদের প্রবণ হইল, চিরদিন কেন একটি বিদেশী ভাষার প্রবণ আমরা মানিয়া চলি ?

সুখোপাধ্যায় মহাশয় অকাম্পদ ব্যক্তি, তিনি খাটি ভারতীয়। তাঁহার মূখে এই উক্তি শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস লাগিতেছে। বিশ্বাস আরও বাড়িতেছে এই কারণে যে, যে রাষ্ট্রে ভাষার একমুখে ভারতের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিতে সচেষ্ট, তিনি সেই রাষ্ট্রেই এইজন্য রাজ্যপাল। তিনিও রাষ্ট্রভাষা জান; বতব্বর মনে পড়ে কিছু দিন আগে তিনি সংস্কৃতের কথা বলিয়াছেন। ইংরাজিকে যদি চিরকাল আন্তর্জাতিক ভাববিনিময়ের ভাষা করিয়া রাখি, রাষ্ট্রভাষার (সংস্কৃত বা হিন্দুস্থানি) প্রচার কিরূপে ও কখন হইবে আর তার ন্যায়কর্তে আমরা যে ঐক্যবন্ধ ভারতভাষাতি গড়িতে চাই, তাহাই বা কিরূপে ও কখন হইবে ?

দায় দাবি

কর্তব্য না করিলে অধিকার আছে না। কর্তব্য না করিয়া অধিকারের দাবি যে জুলুম-বাজি একথা আজ আমরা আর বিশ্বাস করি না। দাবি আমাদের আছে কিন্তু দায় বহনের প্রবৃত্তি নাই। তাই সব দিকে অন্যায় এভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্য প্রদেশের রাজ্যপাল ত্রিণাকরানা তাঁহার সমাবর্তন বক্তৃতায় সেই কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি যদি আমাদের কর্তব্য কি তাহা বুঝিতে ও কর্তব্য করিতে শিক্ষার্থীদেরই বলি, শিক্ষাপদ্ধতি বৈদেশিক মত উপকার করিয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন, ১৯৫২ সালের সমস্ত বিষয়ের (বিজ্ঞান ব্যতীত) পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্যতালিকা ১৯৫১ সালের অক্টোবর হইবে। বিজ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও ১৯৫১ সালে বলবৎ পাঠ্য বই সমূহ লঙ্কান চলিতে পারে। বিজ্ঞানের বেলায় ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ (বোর্ডের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে) যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম শ্রেণীর একমাত্র পাঠ্যপুস্তক বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৫০ সালের মূল ফাইনাল পরীক্ষার অন্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫০ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক অনুমোদিত ছিল, কেবল সেই সব পাঠ্য পুস্তক সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত যে কোন অনুমোদিত স্কুলে লঙ্কান চলিতে পারে।

১৯৫৪ সালের মূল ফাইনাল পরীক্ষার অন্ত ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণসমূহের স্থান গ্রহণ করিবে।

শিল্পিতরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন নিম্নের পুনরুৎসাহের পুস্তকচিত্র শিল্পাচার্য ডক্টর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত ৫ই ফিলেবর ৮১ বৎসর বয়সে তাঁহার বাসকপুত্র বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পরিণত বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার তিরোধানের ভারতীয় শিল্পজগতে যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। তাঁহার সৃষ্টি শুধু প্রাচ্যের ললিতকলাকে পুনরুজ্জীবিত করে নাই, ভারতীয় শিল্পকলার নূতন ভাবধারা আনিয়া দিয়াছিল। কবিতরু অবনীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহার অতুলনীয় কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বে ভারতের মর্মকথাটি প্রচার করিয়াছিলেন,

তেমনি তাঁহার প্রাচুর্য, ঠাকুর পরিবারের অসুখম
উজ্জল রত্ন অবনীজনাৎ তাঁহার মোহন তুলিকা
স্পর্শে ভারতের সংস্কৃতি ও তাহার অভিনিহিত মত
ও মূল্যবোধে অগতের সময়ে তখন ও তখন উজ্জল
করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা শুধু শিল্প

সৃষ্টিতেই আবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যসৃষ্টিতেও তাঁহার
হান কম নয়। তাঁহার রাজকাহিনী, নকুলনা,
কীর্ত্তের পুস্তক প্রভৃতি নিতনবানিত্যে অমর হইয়া
থাকিবে। এই মহান শিল্পীকে আমরা প্রভাচর
অবগণ করি।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্প শিক্ষার স্থান

[অধ্যাপক জিগলিচকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ, বিইডি]

সম্প্রতি ভারত গণমন্ডলে পঞ্চ বর্ষে যে
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে
অনুমান ১৪২৩ কোটি মুদ্রা ব্যয় হইবে। কৃষি ও
শিল্প উন্নতি খাতে ৩০৬ কোটি টাকা ভিন্ন অপর
সমূহ ব্যয় (প্রায় ১২০০ কোটি টাকা) শিল্প
উন্নতির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।
এই উন্নতির জন্য দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। বিশেষ
হইতে শিল্পী আনারের অনেক। এই দেশেই উপযুক্ত
সংখ্যক লোকের শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হুঁসি
সম্ভব। বিদেশী শিল্পীর নিয়োগে একে ব্যয় তিন
গুণ পড়িবে, তাহার পর শুধু বেতনের জন্য বরটা
কর্তৃগা ততটুকু কাজই বিদেশী শিল্পীর নিকট আনা
করা যায়। ইহা ছাড়া বিদেশী শিল্পীর বেতন
ব্যয় বহু কোটি টাকা বিশেষে চলিয়া যাইবে।
যেদী শিল্পীর নিয়োগে সেই টাকাটা দেশেই
থাকিবে। এই সকল কারণে অল্পব্যয়ে পরিকল্পনার
সাকল্যের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব দেশী শিল্পী
নিয়োগই হুঁসিসম্ভব। প্রায়শ্চৈৎ বহুত দুট
চাষিজন বিশেষভাবে বিশেষ হইতে আনা হইতে হইবে,
অথবা দুই মনজন ছাত্রকে বিশেষে পাঠাইয়া
ওদেশের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ
করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাপকভাবে শিল্পী সংগ্রহের
ব্যবস্থা এদেশেই করিতে হইবে।

ভারতে শ্রমিকের খসুখী দুই কম, ওখানি
আমরা দেখিতে পাই যে ভারতে প্রস্তুত প্রযোজ
কাটতি বিশেষে হয় না, কারণ মূল্য অধিক। বহুত
পুত্রাভিন বস্ত্রের প্রয়োগ ইহার একটা কারণ, যাহার
ফলে অন্য দেশের প্রতিযোগিতার আমরা হুঁসিতে
শিল্পজ্ঞানের প্রস্তুত সমর্থ। ইহা ছাড়া পাশ্চাত্য
দেশে যুগ্ম শিল্পবস্ত্রের সহিত গৌণনির্মিত প্রয়োগ
হয়। এই গৌণনির্মিত বা byo Products এর
অন্য অনেক সময়ে শিল্পের খসুখী উদ্ভিষ্টা আনে।
কতকটা শিল্পজ্ঞানের আলোকে, কতকটা উপযুক্ত
পরিবেশের অভাবে ভারতে এইরূপ গৌণনির্মিত
প্রয়োগ দুই কম হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটি
কারণের অতিরিক্ত যে কারণ প্রধান, তাহা শিল্পীর
শিক্ষার অভাব। একজন অনিশ্চিত কারিগর
সাহায্য দিলে যে কাজ করিবে, একজন দক্ষ কারিগর
দুই বা তিন বটায় সেই কাজ করিতে সমর্থ।
একলে দুইগুণ বেতন দিয়া দক্ষ কারিগর নিয়োগেও
লাভ থাকে কারণ তিন গুণ কাজ পাওয়া যায়।
বকতা "অর্জন" করিবার জন্য পূর্বে অতিষ্ঠতাই
একমাত্র উপায় মনে করা হইত। কিন্তু পরে
যেদা পেল যে অটমশিল্প প্রতিষ্ঠানে অতিষ্ঠতার
সহিত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। শিক্ষাই
একমাত্র শক্তি বহানুভব সমস্তা সমাধানের

আমাদের সাহায্য করিতে পারে ও বর্তমানে বাস্তব জটিলতার দুপে প্রত্যাহই নূতন নূতন সমস্যা আসা অসম্ভব নহে। প্রায় ষাট বৎসর আগে ইংলণ্ড অনেকটা সেই অবস্থায় ছিল যে সমস্যা আমাদের এখন আছে। সেখানে বাক কারিগর ও দুই তরফে বৎসরের অভিজ্ঞতার দাবীই করিতে পারিত। বাস্তব জটিলতার কারণে তখন শিক্ষার প্রয়োজন অস্বীকার্য হইলে সমস্যার নিরীক্ষণের অন্ত বিবেচ্য ব্যবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে নিয়োজিত হইতে পারিত। ইংলণ্ডে প্রায় তখন দুই হাজার ইংলণ্ডে বাস্তব প্রণালী দৃষ্ট হইল।

কিন্তু আমাদের সমস্যা অন্য প্রকার। ইংলণ্ডের তৎকালীন দক্ষশিল্পীরা অনেকের অক্ষর পরিচয় ছিল, তাহার ফলে সাহায্যিকার কার্যে অনেকটা সাহায্য পাওয়া যায়, সকলে এক ভাষাভাষী হওয়াতে সাহায্যিকার ব্যবস্থা সহজ হত। ভারতের দক্ষশিল্পী অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহা ছাড়া তারা বিস্তারিত বাক্য যদি বাস্তবায়ন ব্যবহার হয় তবে ভারতের দুই তৃতীয়াংশ লোক তাহা বুঝিবে না। অতএব প্রায়শই স্থলে মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা দিয়া ও প্রত্যেক ছাত্রকে বাস্তবায়ন বুঝিবার যোগ্য করিয়া পরে এখানে শিক্ষা দিতে পারিবে। বর্তমানে অধিক সংখ্যক শিল্পশ্রমিক (Artisan class) বুলিয়া ডাকাতে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র তত্ত্ব করিতে হইবে ও শিল্পক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরকে কখন যে যে পদ খালি হইবে তাহাতে নিযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে অল্পমান বিদ্য বৎসরে আমরা সমস্ত শিল্পে শিক্ষিত ও দক্ষ কারিগর নিযুক্ত করিতে পারিব।

দক্ষ কারিগরের কার্য পরিদর্শককে বলা যে পরিদর্শক (overseer, foreman বা supervisor) তাই তাহাদের শিক্ষা অস্তিত্ব ঘাটতি হ্রাসের সমান ও শিক্ষা পটীকতর হওয়া উচিত। ইহাদের অন্তর্গত টেকনিক্যাল স্কুলের

প্রয়োজন। শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও বিবিধ বাস্তবপূর্ণ কাজে যে সকল পরিচালক বা ইন্টারমিডিয়েট থাকিবেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা (Intermediate) অবধি হইলেও কোন কোন স্থলে (যথা টেকনিক্যাল) প্রায়জুয়েট ছাত্রের প্রয়োজন। শিল্প শিক্ষার যান ও অধিক উন্নত হইবে।

নিয়োজিত পবেষণার যান অকিঞ্চিৎকর নহে। নূতন নূতন কাঁচা মালের প্রবোধ (cheap raw materials), ইন্ধন কার্যের সাশ্রয় (fuel economy), সৌণ শিল্পের প্রসার (use of bye products) অবস্থা বস্ত্র উৎকর্ষ সাধন এ সমস্তই পবেষণা সাপেক্ষ।

একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যেনই অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীরা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বুঝি বরফাক। বুলিয়াও শিক্ষা কৃষ্টি। শিল্পের পরিণামক চেষ্টা পাবে, হাতে কলমে শিক্ষা (vocational learning) এর দিকে লোককে আকৃষ্ট করিতে পারে, কিন্তু বিবেচনায় প্রতিযোগী বাস্তব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য শিল্পীরা শিক্ষা পরিচালনা বুঝি সাধন করিতে হইবে।

সরকারী হিসাবে দেখা যায় শ্রমজ ভারতে প্রায় ২২ লক্ষ ছাত্র বিভিন্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা মানের অসুত্রপ নিম্নতর প্রায় বৎসর মাত্র ২০০ ছাত্র তত্ত্ব করিবার ব্যবস্থা আছে। অতএব এই হিসাবে কালির বেলগে কাম্বানো চিত্র অল্প বেলে ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত শিক্ষার্থীদের গণনা হয় নাই। বাকী হইল তাহাদের গণনা করিলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রতি বৎসর এক হাজার ছাত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তারতম্য নাই। অতএব শ্রমজ ভারতে অল্প ২২ লক্ষ দক্ষ কারিগর আছে ও প্রতি বৎসর অল্প ২০০ লক্ষ হাজার নূতন দক্ষ কারিগরের যান খালি হয়।

ভাষার শত করা ২০ ভাগই অনিকিত কাগির
সাহায্যে তত্ত্ব হইতেছে।

আমাদের টেকনিকাল স্কুলগুলি কারখানা ও
মানান্তর শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক সৃষ্টিও চমক
দায়ী। এইগুলি প্রতিবৎসর ২৪৭৯ ছাত্র লইয়া
যাচ্ছে কিন্তু সমগ্র ভারতে অন্তত ৬০,০০০ পরিদর্শক
(foreman, overseer and supervisor)
নিম্নতর আছে ও প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০০ নূতন
লোকের প্রয়োজন। নিম্নোক্ত পরিদর্শনার পরি-
দর্শকের সংখ্যা বিস্তারিত হইয়া ১,২০,০০০ হইলে প্রথম
পাঁচবৎ ১৫,০০০ ও তাহার পর প্রতি বৎসর ৬০০০০
ছাত্রের শিক্ষা ব্যবহার প্রয়োজন আছে।

ইতিমধ্যে, টেকনোলজীর অ্যানালিটিক, কেমিষ্ট্রি
প্রকৃতির শিক্ষার মান ডিগ্রী অথবা মোট গ্রাজুয়েট
মানের অঙ্কন। বর্তমান ভারতে সর্বদাবুল্যে
২০৪০টি ডিগ্রী ও ৪০১টি মোট গ্রাজুয়েট মানের
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ভারতের নবশিল্প পরিকল্পনার
আগামী পাঁচ বৎসরে অন্তত ১০,০০০ ছাত্র তত্ত্ব
করিতে হইবে ও তাহার পর হস্ত ৫,০০০ করিয়া
ছাত্র লইলেও চলিতে পারে, তবে ভারতের মান-
সূচী নিম্নোক্তের তিকে লক্ষ্য রাখিয়া হস্ত ১০,০০০
শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা বহুদিন রাখিতে হইতে পারে।

শিল্পসম্বন্ধীয় গবেষণার কেন্দ্র ব্যাংকালোর, কানপুর
কান্দী, ওয়াশিংটন ও কলিকাতায় আছে, ওয়াশিং
গেছোক্ত তিনটি বিনবিজ্ঞানসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ও
কলিকাতায় গবেষণার সাধারণ ব্যবহারিক
বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র। সরকারী গবেষণা কেন্দ্র
দ্বিতীয় পূর্ণা প্রকৃতি স্থানে আছে কিন্তু তথ্য দ্বারা
বেতনসম্বন্ধ গবেষণার সাহায্য দেওয়া হয়। সর্বদাবুল্যে
প্রতি বৎসর ১০০ নূতন গবেষণার নিম্নস্তির
সম্ভাবনা নাই ও ভারতে পঞ্চাশতাব্দিক ব্যক্তি
শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার নিম্নতর আছে কিনা সন্দেহ।
নিম্নোক্তের দ্বারা অব্যাহত রাখিতে হইলে অন্তত
ইহার দশগুণ গবেষণার প্রয়োজন।

গবেষণার অভাবে ভারতের মানান্তর শিল্পে
যে কতি হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। উদাহরণ
স্বরূপ কাঁচা কয়লা হইতে কোয় অথবা কাঁচ
আলাইয়া কাঠকলার প্রকৃত প্রণালী লইতে পারি।
পান্ডাত্য দেশে এই দুইটি শিল্পই গৌণ পদার্থের
(bye products) ব্যাপক প্রয়োগের অগ্রই বাঁচিয়া
আছে ও দ্বিতীয় নূতন গৌণ পদার্থের প্রয়োগ
আবিষ্কৃত হইতেছে। ভারতে গৌণ পদার্থগুলি
নষ্ট হয় বলিয়াই কোয় অথবা কাঠকয়লা এত মহাব্যর্থ।
কুড়ালের সম্যক গবেষণার অভাবে ভারতের বহু
খনিজ সম্পদ এখনও আমাদের ব্যবহারে আসে
নাই। হিমালয় পালন শীলা (soil rock) একরূপ
শীলার পাথরুলে ও গণ্ডোয়ানা খনির দ্বারা আকর্ষ্য
পেট্রোলের খনি আশা করিতে পারি। ভারতের
পূর্বপ্রান্তে তিব্বত ও পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে
আটক সেই সম্ভাবনাই ইঙ্গিত করিতেছে। যুক্ত
প্রদেশের তথ্যই অকলে কয়েকটি স্থানে কুপের অলে
কেরাসিনের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু পর্যাপ্ত গবেষণার
অভাবে ঐ সকল অব্যাহত আছে। ছোটনাগপুরের
অনুসন্ধান খনিজ সম্পদ বিজ্ঞান প্রদেশের নিম্ন ও দাত্তোল
জেলার ও মধ্যপ্রদেশের চাঙ্গা বা অমোয়া জেলার
পাওয়া বাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উপযুক্ত
গবেষণার অভাবে আমাদেরকে ঐ সম্পদ হইতে
বঞ্চিত রাখিয়াছে। এই সকল সম্পদের ব্যবহার
তখনই সম্ভব হইবে, যখন যথ্য গবেষণা প্রত্যাশিতিক-
প্রণালীর ব্যবহারের অতিরিক্ত অগ্র দেশের অজ্ঞাত
নূতন প্রয়োগের ব্যবহারও করিবেন।

ব্যাপক নিম্নোক্ত করিতে হইলে শিল্প শিক্ষার
অগ্র ব্যয় করিতে সৃষ্টি হইলে চলিবে না। পঞ্চবার্ষিক
পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্প শিক্ষার ১২ কোটি টাকা
ও ষোল্লবার্ষিক অগ্র ০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ
হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে ৫০,০০০ ডিগ্রী প্রার্থীর ছাত্রের
অগ্রই ছাত্রপ্রতি বৎসরে ১,৬০০ টাকা ব্যয় করিয়া
আট কোটি টাকার আবশ্যক। প্রতি বৎসর ১৫০০০

পরিদর্শক ও ৪০০০০ কারিগর বসতি করিলে যদি দ্বিতীয় পলিটেকনিকের হিসাবমত ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ৮০০ টাকাও খরচ করা হয় তাহা হইলে ৩২,৪০০০ ছাত্রের জন্য পাঁচ বৎসরে ২৬ কোটি টাকা প্রয়োজন। ইহা তিন গবেষণার উন্নতি ও ব্যয়পাতি ক্রম ইত্যাদিতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা পড়িবে। অর্থাৎ পরিচালনা ক্ষমতায়ী ব্যয়ের চতুর্ভুজ অর্থাৎ ৯৪ কোটি টাকা

ব্যয়ের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন। আপাত দৃষ্টিতে টাকার পরিমাণ বেশী মনে হইলেও, অল্প রাখা সরকার যে সমস্ত নিম্নোক্তিতে যে ১২০০ কোটি টাকার ব্যয় হইয়াছে ইহা তাহার শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র ও ইহার অর্ধাংশে সমস্ত নিম্নোক্তিতর পরিচালনা ব্যয় হইবার আশঙ্কা আছে।

নিরক্ষর শিক্ষা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন]

নিরক্ষর মানুষও শিক্ষিত ও জানী হইতে পারে। ভারতের গ্রামে অল্প লাড়া-পায়ে একজন নিরক্ষর শিক্ষিত ও জানী লোক বিঘল নহে। নিরক্ষরতার প্রশস্তি ইহা নহে। আক্ষরিক শিক্ষা ছাড়া আর একটা শিক্ষা—মনকর বা আচরণ শিক্ষার কথাই এখানে বলিতেছি। এই উভয় শিক্ষার কোনটির স্থান আগে : মানুষ যেরূপ গড়ে, কি ইচ্ছা পড়ে তাহা বিচার করিবেন পাঠক।

সকাল বেলা ছোট ভারতী ও দ্বাপরথি পড়িতে-ছিল, সন্ধ্যা সন্ধ্যা কথা বলিবে। বহির্বাণে পাওনা দায়-দায়িক 'বাবু'। গৃহকর্তা কতটা ভারতী বা পুত্র দ্বাপরথিকে অগ্রত্যাগিত নিরক্ষর বলে—'বলে দাও, বাবা বাড়ী নেই'।

আক্ষরিক শিক্ষা কঠিন হইল। আর আচরণের শিক্ষা হইল তথিপরীত। অর্থাৎ লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। এ কেনেও হয়ত তাহাই। অর্থাৎ নাই এমন লোকের মধ্যেও কিছু এইরূপ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎকর্ষিত গ্রহণ একপ্রকার চৌধ। তাহা সর্বথা পরিত্যাগ। আশা হই সাধনে বসিয়া ছেলেবেলায় একথা মুখের করে। স্বভাবের জন্য পাত্র দেখিয়া

অত্যাগত গৃহকর্তা আশার মুখেই আবার তাহার ক্রন্দ—'ছেলেটির মাইনে অবশ্য কম। তা হোক, পুথিরে যাবে : উপরি দুই পয়সা আছে। আর ছেলেটিও চাপাও চড়া, কবে কবে নিতে পারবে। গৃহকর্তা নিজের অজান্তেই উৎকর্ষিত গ্রহণ সর্বথা পরিত্যাগের' ভাষা করিলেন—আমার বেলায় নয়, তোমার বেলায়।

বাড়ীর মেথর বা দ্বাপরকে অভিযাননে যদি 'দামদাম' বলত, তোমার ছোট নাতি বা নাতনি বলিবে 'এ বাম, দাদু মেথরকে নমস্কার করে। সমাজের নানা কাজ নানা জনে করে তাই সমাজ বাঁচিয়া আছে (চলে)। সুতরাং সমাজ চালু রাখার কোন কাজই নীচ হইতে পারে না। মেথর দ্বাপরকে আশ্রয় দণ্ডা করি অর্থাৎ কোন মা সন্তানের মলমূত্র প্রতিদিন না পরিষ্কার করেন। মা বা সন্তানের জন্য করেন, মেথর সে কাজই সমাজের জন্য করে। তবুও সমাজের এইরূপ প্রকৃষ্ট সেবকে আশ্রয় শৈশব হইতে দণ্ডা করিতে শিখি।

স্ট্রাম কণ্ঠের, সে যদি নিজ নিজামের বহুসেরও হয়, তবু সে 'তুমি।' বল বহুসের ছেলে মূখ হইতেও আপনি সম্বোধন বাহির হয় না।

যে শিক্ষায় মানুষ মানুষকে চুপা করিতে, ছোট মনে করিতে শিখে, সে শিক্ষা কেমন !

বিলাতে লোকে টায়-বাসে উঠিয়া গল্পব্যাহানের নিষিদ্ধ ভাড়া হাতে বাহির করিয়া থাকে। কতাইয়ের ভাড়া চাহিতে হয় না। আমাদের এখানে একটা আচরণ প্রায় নিরন্তর ব্যতিক্রমের মতই বিরল।

পাঁচা পীয়ে বাস্তব বাবে, মলাপরের পায়ে লোকে বিটা-ত্যাগ করে; শ্রীলোকেরা পুঙ্খের মল ময়লা করে। সেই মলই তাহার বাত, আর সেই মলেই ঠাকুর পূজা করে। অচ্যাসটা বে কবুত ও অসামান্য এই বোমটাও আমাদের নাই। কলিকাতায় তরুণী লোককে পাড়াইয়া স্ট্রিটবিনের পায়ে পথের দূর ত্যাগ করিতে দেখা যায়। আর যেখানেই বাস-স্ট্যাণ্ড, সেই দলটা দানই প্রচলিত। ক্রাফটসময়ের চৌ-বাস্তব ঘোড় হইতে বেলগাচিয়া পুল পথের আর, তি, কব বোতের দুই পাশে বাস-স্ট্যাণ্ড। বেল এগারটার পরে এই বাস্তব সিঁচা চলা ফুটিল, সঙ্গে নাক মলে। এই শু মেল অতুখিয়া ও বাস্তবের চিত্তকার কথা। তবাতা ও কচিৎ দিক হইতে বিচার করিলে ব্যাপারটা নেহাত সুখসিৎ। বাস-স্ট্রাইটার ও কতাইর বাস্তব চাকার কাছ বেঁদিয়া বসিয়া যায়। বাস্তব বেবেগাও চলেন। কলিকাতায় সব বাস-স্ট্যাণ্ডে এই একই চিত্র। কল্পপোষণ বা সরকার কাহারও চক্ষেই এই ভক্তাবলম্বক বিনিময়টা পড়ে না। বিবেকে ভাবকের

মান বাড়াইবার জন্য আমাদের সরকার সচা ব্যক্তি, অথবা প্রকৃত অর্থ জলের মত ব্যয় করে। বিমানবাঁটি হইতে কলিকাতার প্রবেশকালে, ও কলিকাতা হইতে বিমানবাঁটি বাওয়ার সময়ে বিবেকের লোকেরা কি দৃষ্ট দেখিয়া ও কি ধারণা লইয়া যায় সে দিকে সরকারের খেয়াল নাই।

এই বিষয়ের শিক্ষা দিখেন কে? শিক্ষা? সম্পূর্ণ বোকা দিতা নছেন। এ ত যেরে ব্যাপার। দিতাকে বেনীর ভাগ বাহির লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। শিক্ষকের কাছ হইতে এ কাছ পাওয়া যায় না। সে ভাবনা, সে বালাই তাঁহার নাই। তিনি আকর্ষিত শিক্ষার বণিক। তবে এ কাছ কাহার? জননী, গৃহকর্তা। যারো বেমন সন্তানের প্রমুখি, মায়েয়া তেমন সবায়েগও বাজী। সমাজের ভালমন্দ রূপ দেওয়া তাহারের হাতে। শাসকের হানিতবে শাকিত সিংহিনী যেমন শাবক রক্ষাকল্পে থাকুন হয়, সিংহমুখি ধারণ করে, প্রয়োজন হইলে গৃহকর্তার বিকল্পেও গৃহকর্তাকে সম্মান ও সমাজের হিতকল্পে সিংহিনীর মত উগ্রমুখি ধারণ করিতে হইবে। মাতার যদি এই দিকে মন ঘেঁ, এট দায় বহন করেন, তবে যেখানে যেখানে তাঁহারের সন্তানেরা পড়ে সহজে অনেক শিক্ষার কল্পম শিক্ষকত্ব পথে বাটে বিচরণ করিবে। আর অচিরে আতি ক্রটিমুক্ত হইয়া জনতের কাছে সম্মানলাভ করিবে। এই মহান দায় ও দৌর্গব বাস্তবেরই।

বৈশাখী (নাটিকা)

[ঔপনিষৎকৃত চরিত্র]

ভূমিকা—নাটিকাটি আট নয় বছরের ছেলে-
মেয়েদের উপযোগী। এটির সূচনা ঐ বয়সের একমল
ছেলেমেয়ের খবর বলা থেকে। বাণীপুর শিশু-
নিকেতনের তৃতীয় শ্রেণীর ছোট্ট একটা বাগানে
কুকো, চোঁকন, কুট্টা ইত্যাদি লাগানো হয়েছিল।
কিন্তু ছাগল গরুর অভ্যাচারে বেচারি গাছগুলোকে
প্রায়ই বিকলাকৃতি হ'তে হ'ত। বৈশাখ মাসের
এক সোমবার পোপাল খবর মিল, “বাগা বাগ
আমাদের খুটাগাছ সব ছাগলে খেয়ে গেছে।
হুপুরে আমি কলোয়ান ক্যান্সে বাজিগাম, যেদি
বাগানে ছাগল চুষেচে। তখন তাড়িয়ে দিবেছি।
কিরে এনে যেদি গাছগুলো খেয়ে গেছে।” কানন
নালিশ জানালো, কলেজের আম গাছ থেকে হুপুরে
প্রায়ই ছেলেমেয়েরা কচি কচি আম পেড়ে খায়।
শ্রেণীর অনেকেই সে দোষে দোষী। আরও নানা
খবর এল। খবরগুলো নিয়ে আলোচনা করতে
করতে নামা মত্তরা বেরিয়ে আসে। সেগুলো
ছেলে সাজতেই নাটিকার সূত্রপাত হয়। ওরা
উৎসাহের সঙ্গে নতুন নতুন চরিত্র আমদানী, নতুন
সংলাপ সংযোজন ইত্যাদি শুরু করে। কে কোন
চরিত্রের অভিনয় করবে ঠিক হয়ে যায়। তখন
শ্রেণীতে ‘জাকবর’ প্রদর্শন চলছিল। যীশা
জাকবরের কথাও নাটকে চুকিয়ে দিতে চায়।
• অন্তরাত্ম সত্ত্ব কলকাতা ঘুরে এসেছে। সে চাইলো
• নাটকে আত্ম একটা ট্রেন চুকিয়ে বেবে। হির হল
শনিবারের সন্ধ্যা নাটিকাটি অভিনীত হবে।
দাবির ভাগ করে দেওয়া হল। মুখোশ নিশান
ইত্যাদি তৈরী করার ব্যস্থা হল। মকের কথা
ওঠাতে একমল হলল কোন মকের ব্যবহার নেই।
খোলা হয়েই হবে। অন্তরাত্ম অবশ্য একটু খুঁত

খুঁত করে। পরে হির চম ভাগ কাগজ দিয়ে
অভিনয়ের স্থানটুকু ঢেকে দেওয়া হবে। নাটিকাটি
শনিবারের সন্ধ্যা অভিনীত হলে সকলেই এর
আনন্দটুকু উপভোগ করে, বিশেষ করে ছেলে-
মেয়েরা।

এই হল নাটিকার ইতিহাস। এটি দ্বিতীয়
তৃতীয় শ্রেণীর উপযোগী। সংলাপে আমার হাত
একেবারে নেই তা নয়। তবে শেটুকু হস্তক্ষেপ
করেছি নতুন পথ বেঁজার উদ্দেশ্যে আর পরিবেশ
পর্ববেকনের সাহায্য হিসাবে। নাটিকা অভিনয়
কালে কোন মক তৈরী করার ব্যবহার নেই।
গাছতলায় বা শ্রেণীরকে অভিনীত হতে পারে।
বৈশাখ তৈরীমানের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য
রয়েছে এটি বচিৎ। সূত্রগত সে সময় অভিনীত
হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ছেলেমেয়েদের সাহায্যে খবর,
সংলাপ কথামর্ভা অবলম্বন করে ওদের সাহায্যে
শিশু সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব এটা তাই নমুনা।

আরম্ভ

(একটি ছেলের প্রবেশ) এদিক ওদিক
জাকবরী কাগজকেও বেধিতে না গাইয়া)

বেণু—বাঃ বেশ হয়েছে। মালীটাও ড্রপেছে।
আম খাওয়া বাবে মজা করে। গাছ তলা কাটা
আম, টক টক পক।

(পাছে টিপ ছুঁড়িল) (কাছের প্রবেশ)

কাছ—হারে বেবে বেবে—কী মজা, কী মজা।
(বেণুকে দেখিয়া) এই বেণু কী করছিল ওখানে ?
এঁা আম খাওয়া হচ্ছে চুবি করে। গাফা...

বেণু—না তাই আম তো গাড়িনি আমি।
(কাছের হাত ধরিয়া) একটা মজা করি ? মালীডো

নেই। ঐ ঐ দেখ, ওই আঁচটা কত বড় হয়েছে।
খাবি? আমার সঙ্গে নুন আছে।

কাহ্ন—(হাত ছাড়াইয়া) যা যা, চুঁবি করে
আম খাই না আমি। (পরে ফিরিয়া) কাঠবি
কী বিয়ে?

বেণু—বাবো, আমার সেই কিছুকের ছবিটা?
কেমন কচ্ কচ্ করে কাটে।

কাহ্ন—আমি কিন্তু তাই নাহে উঠতে পারি
না। শেষটার ইমুলে গেলে দাদা আবার 'চোর
চক্রবর্তী' বলে ডাকবে।

বেণু—কে আবার দেখতে পারে আমাদের?
এমন কাঁকা করছে বোদ্ধব। লম্বাই ঘুমিয়ে আছে।

কাহ্ন—ঐ যে রাবাল ছোঁড়া পক চম্বাচ্ছে, যদি
বলে দেব।

বেণু—যা তোমার দত্ত ভদ্র। উঠবো? উঠবো
পাছে?

(পেছন থেকে কাঠ বিড়ালি)

কাঠ বিড়ালি—(গম্ভীর স্বরে) কী বলাবলি
করছো তোমরা? যান বাগ্গার মতলব বুঝি?
ইমুলে বুঝি এই পেখো তোমরা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বেণু—(চারদিক তাকাইয়া) বেশ মজাভো।
কেউ কোথাও নেই। অথচ কে যেন কথা বলল, না?

কাহ্ন—ওমা! কী হবে। আমার তাই চর
করছে। ঠাকুমা সেদিন কি সব জুতোর গর
কল্হিলেন। তাহাই কেউ হবে বোধ হয়। চল
পালাই। (কাঠ-প্রবেশ)

কাঠ—যাঃ খুব বীর পুরুষ তো। এতই যদি
জুতোর ভয়, হুপুয় যোমে বেরিয়েছ কেন? আম
চুঁবি করার মতলব কেন? যাও বাড়ী গিয়ে
ঘুমিয়ে থাকগে।

কাহ্ন—ওমা! কাঠবিড়ালির কথা শোন
একবার। যেন গুরুমশাই এগেছেন। তা-ও
যদি না লাগিটা একটু ছোট হত।

কাঠ—আমার লেজ বড় তো তোমার কী?

ইমুলে পড়; চুঁবি করে আম খেতে এগেছ। লজ্জা
করে না?

বেণু—কেন ওকে খাপাচ্ছি? কাহ্ন। না তাই
কাঠবিড়ালি, চুঁবি খুব ভাল। কেমন লাগিয়ে;
লাগিয়ে ছুটে বেড়াও।

কাঠ—এই তো ভাল ছেলের মত কথা। চুপ্
চুপ্।

কাহ্ন—কেন? চুপ করবো কেন? তোমার
হকুমে নাকি?

কাঠ—ঐ দেখ হুতুম বুড়ো আনছে লাঠি ঠক্
ঠক্ করে। বেজার মাপী কিন্তু।

(হুতুম বুড়োর প্রবেশ)

হু-বুড়ো—প্যাচা আম প্যাচানি খানা তোম
চ্যাচানি। কে অনন করে চেঁচাচ্ছে। কে বলি?
আমার ঘুমটা বিল মাটি করে।

কাঠ—না ঠাকুর্না, ওরা তোমাকে খাপাতে
আসেনি। খেলতে এগেছে।

বুড়ো—(তাকাইয়া) খেলতে এগেছে? এই
হুপুয় যোমে খেলতে এগেছে? তারি আশ্পর্শ তো।

বেণু—না, না। আম খেতে এগেছি আমি।

বুড়ো—কী? আম খেতে? এই বোদ্ধবে কচি
কচি আম খেতে এগেছ? আবার বলতো তুমি?

কাহ্ন—(ভয়ে ভয়ে) আপনি রাগ করবেন না।

বুড়ো—রাগ করো না? কী বলে, রাগ করো
না? কেন? তুমি কেন? তোমার ভয়ে নাকি?
এঁ।। বপ্, কমিরা লাক দিরা ছাগলের প্রবেশ।

বেণু—এইরে, সেই ছাগলটা। খর খর খর
কাহ্ন। আমাদের কুটাপাছগুলো সব খেয়ে গেছে,
সেদিন।

(ছাগলের পলায়নোত্তর ও কাহ্নের ধরে আনা)

ছাগল—খেয়েছি বেশ করেছি। আবার খাবো।
এঁ।, আমার খেড়া দেওয়া হয়েছে।

কাঠ—কেন তাই তুমি যোম যোম ওদের গাছ
খেয়ে যাও? ওরা কত কট করে এসব লাগায়।

ছাগল—ওঃ কষ্ট করে লাগবে। আর আমার কষ্ট কে দেখে? হুপু বেল। আমাকে ধরে নিয়ে যে বেঁধে রাখে। গুন দোষায়। সে খবর যাখো।
বুড়ো—কোন খবর? কিণের খবর শুনি? খবর দাখবো কেন বলতো? এঁা, ডাবি খবর মেনেওলাবে।

কাঠ—নাঃ তুমি একটু চুপ করতো। কথা হচ্ছিল ছাগলের সঙ্গে।

বুড়ো—ছাগলের সঙ্গে? বেশ। এই চুপ করু'ব আমি। কিন্তু এই ছোঁড়াঘের ছেঁকো না। খবরদার। ছাড়বে না। (প্রস্থান)

(চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বীণার প্রবেশ)

বীণা—ওমা। ওমা তুমি এখানে। আমি এদিকে দিল্লী দিল্লী খুঁজে বেড়াচ্ছি। গুটীপোকা পেয়েছি। এত বড়। দেখবে?

ছাগল—চুপ। বেশী কথা বলোনা। মেনা চোঁচিও না।

বীণা—আরেক, ছাগল যে আমার চোখ বাঁড়াব। বড়ি ছিঁড়ে গালিবেছে বুকি?

ছাগল—নাঃ চোখ বাঁড়াবে না। চুপ করে ওর আবেল ভাবোল শুন্তে হবে। মজা মজা নয়।

কাঠ—ঐ দেখে হুড়ুং হুড়ুং করে ঘুঘু আসছে। কী দিদিমনি, কী খবর। (ঘুঘুর প্রবেশ)

বীণা—তোমাকে তাই দেখতে অনেকটা পারবার মতো, নয়?

ঘুঘু—তা হবে। তোমরা কী করছো এখানে। তোমার সেই পাখীর ছড়াটা বলতো শুনি?

বীণা—কোনটা? সেই যে শনিবারের সতর বলেছিলাম? তুমি বুকি ঘরের ঢালে বসে শুনছিলে? শোন তবে—

বকবকাকম্ বকম্ বকম্ পাররা ডেকে লারা
ফুলিয়ে গলা এদিক ওদিক নাচে কেমন খাবা।
তাইনা দেখে টুনটুনিরা হুড়ুং হুড়ুং উড়ে
পালিখ পাখী গান জুড়েছে কিচির মিচির হয়ে।

প্যাঁচা বলে 'খামনা বাপু বাড়াগনে আর জালা
তোলের তরে ঘুমটি ঘাটি কানটি ঝালানলা।
বাবুই বলে এসো না ডাটে আমার ঘবে চলে,
তালের মাখার বাশানানি হাওবার দেখে হোলে।
কেমন হয়েছে?

ঘুঘু—বেশ হয়েছে। তবে তাই আমার নাইটি কিছু বাধ পড়েছে।

বীণা—আচ্ছা দাদাকে বলবো। আর একটা ছড়া লিখে দিতে।

কাছ—কেন, তুই লিখতে পারবি না? সেই যে লিখেছিলি?

ঘুঘু—আচ্ছা তাই চলি। অনেক কাজ।

বেগু—আবে শোন শোন। তোমাকে যে বড় দেখতেই পাই না আরকাল।

ঘুঘু—এখন কী আর গুরে বেড়াবার সময় আছে?

বী—কেন? গরম পড়ে গেছে বলে? বেড়াও না?

ঘু—না না। বড়কুটো গিরে মাথথোতে একটা খা চোক আতানা তো করেছি। যোগ দেবছি ভিম কুটে ছানা কখন বেথোবে।

কাছ—ও হো হো, ঠিক ঠিক। পাখীরা তো চৈত্র বৈশাখ মাসেই ভিম পাড়ে।

বীণা—পাররা কিন্তু বারমাসই ভিম পাড়ে। না দাদা?

(ঘুঘুর প্রস্থান)

(একটি ছেলে ও মেয়ের প্রবেশ)

মেয়ে—পোষ্টাপিস্ট। কোথায় বলন্তে পার তাই?

বীণা—কেন? টিকিট কিনবে বুকি?

মেয়ে—না। আমার দাদা আসাম থাকে কি না। যা এই চিঠি লিখেছেন। ডাক যাক্সে বেলতে হবে।

বীণা—দাদা, বলবো সেই কথাটা।

বেণু—কোন কথা ?

বী—সেই যে আম'দের ক্রমে ডাকঘর হবে। তুমি দু'একদিন নব্বু কর ডাট, ডাকঘরটা হয়ে যাক।

ছাগল—হা হা হা হা...

বী—হাসলে যে বড়। বিশেষ হল না বুঝি ? আম'রা কত খান করেছি। নাহ, ঘর, পাখীর ছান নিয়ে টিকিট করেছি।

কাণু—দূর থাকা। সেতো এখনো অনেক ঘেরী। তুমি তাই ঐ দান বাজটার চিঠি কেলে এস।

ছাগল—কুনডো। গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে। যেখি বেড়াটা ভাঙতে পারি কিনা।

বেণু—খবরগার। এক পা এগিয়েছ কি তিল ছুড়বো কিছু। সাপের কত !

ছাগল—ব্যা ব্যা (প্রস্থান)

ছেলে—তোমরা হাতে বাবে ? তবে চল আবার লবে।

(একদল হাটুয়ের লুড়ি মাথা চলে যাওয়া)

কাণু—নাঃ, অতদূরে কে বাবে।

ছেলে—চলনা। কতই আর দূর ! কেমন সুন্দর সুন্দর বোকান। কত বেগুন কুমকুমি, পুতুল, সুড়ি ওঠে হাতে।

বীণা—খেলনা ওঠে ? মাটির হাড়িকুড়ি ?

বেণু—কত ? আবার ম্যাংকিকও হয়। চলনা। দেখবে যাতার খাবে খাবে মেহগনি পাচের কচি কচি পাঠা বেড়িয়েছে।

ছেলে—সাদা সাদা শিশুল তুলো আকানে উড়ছে। কত আকর্ষ, কুতূহলবী ফুল ফুটে আছে।

বী—সাদা বাবে হাতে ? বেশ মজা হয় কিছু।

বেণু—হঁ। আর ইশুল ! লাড়ে তিনটার মনে আছে ? না তাই তোমরা যাও।

(ছেলেমেয়ের প্রস্থান)

(গাড়ির প্রবেশ)

কাণু—এই গাড়ি এলে গেছে। ইশুলে যাওয়ায় সময় হল।

ইঞ্জিন—পুঁ-উ-উ-উ—ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি।

গাড়ী—গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্।

গার্ড—কে বাবে কলকাতা, কে বাবে কলকাতা।

- ইঞ্জিন—পুঁ-উ-উ-উ—ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি।

গাড়ী—গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্, গত্।

গার্ড—(বাণী বাঘানো ও নব্বু নিশান দেখানো ।)

(গাড়ির প্রস্থান)

কাঠ—এই যে মালী আগছে। দেখলেই শুড়া করবে। পালাই। (প্রস্থান)

(মালীর প্রবেশ)

মালী—দেখ দেখ দেখ। যেই না একটু বাইরে গেছি আর তিন তিনটা ছেলেমেয়ে এসে জুটেছে।

বীণা—আম'রা তো আর তোমার গাছ থেকে কিছু পাড়িনি। কেন বন্ধ বন্ধ ?

মালী—নাঃ পাড়ো নি। বললেই বিশেষ করব কি না।

বেণু—(আগাইয়া) বেশ। মূখ তঁকে দেখ। আম'রোই কি না বুঝতে পারবে।

মালী—(বল করিয়া হাত ধরিয়া) এই বাব বরোছি। তুমিই হলো জটুয় শিরোমণি। যোজ ফুল চুমি করে নিয়ে যাও। ডাকলেই ছুটে পালাবে।

কাণু—এঁা, চুমি করে ফুল নিয়ে গিয়ে ক্রাস সাধানো হয়। দাতাও সন্সাইকে বলে দেব আজ।

মালী—(বেণু'র পকেট হইতে নুনের পুটলি বাহির করিয়া) এগুলো কী ? (নুনে দিয়া) থুঃ থুঃ নুন আনা হয়েছে আম'র বাওয়ায় ভদ্র ! আজি বাহাজুর ছেলে তো।

(স্বপ্নের প্রবেশ)

স্বপ্ন—কী হচ্ছে ? তোমরা এখানে কী করছো ?

বেণু—আমি আম বাথোনা । আমার ছেড়ে দাও বানী তাই ।

বানী—হ্যাঁ । আর যেন আম পাছে টিল ফুটোনা । কচি আম পেড়োনা ।

(প্রস্থান)

স্বপ্ন—চল সব । দাদা ওমিকে বসে আছেন । কখন গাড়ী চলে গেছে । বিয়েটারে বিহাঙ্গিন দিতে হবে না ?

কাহ্ন—তাইতো চল্ চল্ । আমার কথাগুলো আমার লিখে নেওয়া হয়নি । মোমাছি হব আমি ।

বীণা—আমি কিছু প্রাণশক্তি হতে টেতে পারোনা । তার চেয়ে নীল নরী হওয়াই ভাল । নেই যে আমাদের লাইব্রেরীর বইয়ে নীল নরীর গল্প আছে না ?

স্বপ্ন—আমি হব শিকারী । বনে বনে বাঘ শিং শিকার করে বেড়াব । তীর ধক্ক থাকবে লুকে । মাথায় থাকবে পালকের সুট ।

বেণু—আমি আমি ?

কাহ্ন (চোঁচাইয়া) কুই হবি চোর ।

(সকলের প্রস্থান)

নাটক সম্বন্ধে জুচার কথা

এ সম্বন্ধে বিদ্যুৎ আলোচনার স্থান এ নয় । তবে নাটিকাটি রচনা পরিচালনা ও মঞ্চস্থ করার

সময় বে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে তা উল্লেখ যোগ্য । প্রথমত ওদের ডাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষার ব্যবহার এবং সেগুলোর একত্র গ্রন্থিত করে একটা নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা । ওরা বনগড়া কতগুলো কথাই যে কেবল বলেছে জানব । নানা অনেক নানা ভাব ও কথাকে মিলিয়ে একমুখী করে সেগুলোর একটা বিশেষ খাতিয়ে বহানোর চেষ্টা এবং তাই ফলে একটা নতুন আখ্যান সৃষ্টি করেছে । এই যে সুমহাশয় আত্মপ্রকাশ এটি নাটক রচনার সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি । দ্বিতীয়ত একটা বা দুটো বিজ্ঞান ঘটনাকে কেন্দ্র করে সময় পরিবেশকে জানবার চেষ্টা । ওদের অবচেতন মনে পরিবেশের বেকগ ছায়ায় অবস্থিত ছিল, আলোচনার দ্বারা সেটিই এসে স্পষ্টতর হল এবং একটা নতুন আলোকপাত বেন হল ওদের চিত্তে । আন মেহগনি, নিম্ন আকাশ প্রভৃতির রূপ বৈচিত্র্য এবং কাঠবিড়ানি, চাগল, ঘুসু, আবগাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ওদের উৎসাহ আগলো, নানা প্রাণির জীবন কৃষ্ণক জানবার আগ্রহ আগার সঙ্গে সঙ্গে মানা এর বিজ্ঞানিত হল, নানা দিক থেকে আলোচনা হল । ফুলপাতা, ভাল পাল, বনপ্রান্তর সম্বন্ধে যান্তব অভিজ্ঞতা হল । ওরা কোন ভাষা থেকে কিরে এসে নতুন অভিজ্ঞতা । এমন সব চাকলাকর বর্ণনা দিত যে শ্রেণীভেদ ঘন উত্তরনার নিদ্রণ এসে যেত । এই সুযোগে পরিবেশ পরিচিতির প্রথম পাঠ শুরু করা যায় সহজ ও বাস্তবিক ভাবে ।

আমাদের প্রকাশিত খানকতক ভাল বই

রবি-রশ্মি (প্রথম খণ্ড)	৭।০	দীনবন্ধু গিত	১৫০
(দ্বিতীয় খণ্ড)	৭।	ডাঃ সুনীলকুমার দে	
চাক্ষুঃ বন্দ্যোপাধ্যায়		বাংলা প্রবাদ (যন্ত্রস্থ)	
বলাকা-কাব্য পরিক্রমা (যন্ত্রস্থ)		ডাঃ সুনীলকুমার দে	
ত্রিভিষেকমোহন সেনগুপ্ত		শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ (যন্ত্রস্থ)	
		ডাঃ মণিকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	
শরৎচন্দ্র	৩।০	সত্যের সন্ধানে	২।০
ডাঃ সুরবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত		মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে	
শিঙ্গ-লিপি	৩	একখামা এলবাম	
ডাঃ মণিকৃষ্ণ দাশগুপ্ত		সুভাষ আলোচ্য	২।০
সমালোচনা সাহিত্য	৭।	পি. সি. এল. পরিকল্পিত ও অঙ্কিত	
ডাঃ ত্রিভুজ বন্দ্যোপাধ্যায়		শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান	৬।
ও ত্রি প্রফুল্লচন্দ্র পাল		ত্রিবিজয়কুমার ভট্টাচার্য	

কিশোরকিশোরীদের উপযোগী কয়েকখানি উপহারের মেরা বই

রামধনু (গল্প সংকলন)	৩।০	শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান	১।
ডাঃ চাক্ষুঃ বন্দ্যোপাধ্যায়		তুরস্ক উপন্যাসের গল্প	২।০
সোনার বাংলা	২।০	ত্রিভাষ্কর চন্দ্র দাশগুপ্ত	
সম্পূর্ণ গল্প		শিশুপাঠ্য কল্পিবাস	৩
আবুত্ব মণ্ডু বা	৩।০	ত্রিবেদীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
ত্রিভুজ বন্দ্যোপাধ্যায়		শিবাজী-গুরু রামদাস	১।০
সেকাল ও একাল	২।০	চন্দ্রগুপ্ত-গুরু চাপকা	১।০
নিম্নাচাধ্য ত্রিপ্রমোদ চট্টোপাধ্যায়		ত্রিবিজয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
নূতন নূতন দেশ	১।০	শতাব্দীর সূর্য	৩।০
প্রবোধকুমার সাহা		মণিকৃষ্ণদেব বসু	

এ. মুখার্জী এও কোং লিঃ—২, কলেজ স্ট্রায়ার—১২

কোন বড়বাজার ৩৮০ : : টেলিগ্রাম - প্রকাশিকা

নবম বর্ষের লেখক ও প্রবন্ধের সূচী

আত্মমানে শিক্ষাব্যবস্থা—ঔষধবানী	৫৫
আমাদের কি শিখতে হবে—ঔষধু মিত্র	২০
আমার অতিক্রমতা—ঔষধীনাথ	২৮
আলোচনা	১, ১৭, ৩৩, ৪৩, ৬৫, ৮১, ৯৭, ১১৩, ১২৩, ১৪৫, ১৬১, ১৭৭
ইংরেজীর মোহ—ঔষধবানী	১১
ইতিহাস-চর্চা—ঔষধবানী	১০৪
কিনোচিত্র ও পথের পাচালী—ঔষধবানী	১০
কিনোয় সাহিত্য—ঔষধবানী	১২১
জাত-পরিচয়—ঔষধবানী	১০৩
ধাওয়াপাত—ঔষধবানী	৬৮
নদীজালেলায় শিক্ষক সংকলন—ঔষধবানী	১৫৫
পতিত মহানগর—ঔষধবানী	১০৭
পথ চলতে সাবধান—ঔষধবানী	৮৬
প্রকৃত শিক্ষা দান—ঔষধবানী	২৩
প্রধান শিক্ষক পার্শ্বনাথ—ঔষধবানী	১৮২
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা—ঔষধবানী	৫৭
বর্তমান শিক্ষার প্রগতি—ঔষধবানী	১৬৫
বাংলা ব্যাকরণের পাঠ্যক্রম—ঔষধবানী	১৪০
বিদেশী ছাত্রসমাজ ও বিশ্বশান্তি—ঔষধবানী	৭৭
বিজ্ঞান দর্শন বিনয়—ঔষধবানী	৪৪
বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা—[সংকলিত]	৬৩
বুনিয়াদি শিক্ষা—মহাত্মা গান্ধী	১৩১
বুনিয়াদি শিক্ষা—জ্যোতিষচন্দ্র রায়	
বুনিয়াদি শিক্ষা ও বই—ঔষধবানী	৪
ভাষা নমনা—ঔষধবানী	১১৭
ভারতবর্ষের ইতিহাস—ঔষধবানী	১৬০
ভারত সরকারের শিক্ষাপরিকল্পনা—ঔষধবানী	১৫১
শিক্ষার ব্যক্তিগত—ঔষধবানী	১০৭
শিক্ষার শিক্ষা—পূর্ণিমা বসাক	১২০
শিক্ষার নৃত্য—ছন্দ ও পদ্য	১৮৬
শিক্ষক—ঔষধবানী	১৭৩

ନିକାୟ ଓ ଜୀବନ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୨୫
ନିକାୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷା—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୫୫
ନିକାୟତୀ ନିବାସନ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧
ନିକାୟତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷା—	୨୦
ପୁସ୍ତକ-ପରିଚୟ	୩୧, ୫୫, ୧୨, ୨୫, ୧୫୨-୩, ୧୧୫
ନିକାୟ ମତ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୫୨
ନିକାୟ ମତ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୫୫
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୩୫
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୫୧
ନିକାୟ ଓ ବାସିନ୍ଦା ନିକାୟ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୫୫
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୫
ନିକାୟ ବାସିନ୍ଦା—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୧
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୫୫
ନିକାୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୫୧
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୫୫
ନିକାୟ କୋର ନିକେ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଭୂଷାବେ	୧୫୫



শিক্ষা

স্বাধীনতা কল্যাণকর কলিত্ব দুর্গতি ভাঙা গড়তি

১০ম বর্ষ

পৌষ ১৩৫৮

২য় সংখ্যা

আলোচনা

বুনিয়াদী শিক্ষা ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাভিযান

গ্যানিং কমিশনের অগ্রমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান বর্ষে (১৯৪২-৪৩) শিক্ষার একটি পাঁচ দফা পরিকল্পনার অঙ্গ এক কোটি টাকা ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। প্রত্যাশিত পরিকল্পনাগুলি চানু হইলে সম্ভবত আরও বেশি টাকা খরচ করা যাইবে।

এই পাঁচ দফার প্রথমটি হইল বুনিয়াদী শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা। প্রত্যেক প্রদেশে পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষার অঙ্গ ব্যবস্থা থাকিবে, এমন কি বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অঙ্গ একটি স্বাভিকোত্তর কলেজও করা হইবে। তাঁহাদের শিক্ষার অঙ্গ উপযুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকিবে যেখানে তাঁহারা হাতে কলমে কাজ শিখিবেন। এই পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষকদের অঙ্গও বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ থাকিবে। তাঁহাদের শিক্ষা চর্চার অঙ্গ দুইটি করিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও পাঁচটি স্থানবিকল্পিত সংস্থা থাকিবে।

এই পাঁচ দফা পরিকল্পনার গ্রাম সেবার নেতৃত্ব গঠনের অঙ্গ একটি জনতা কলেজের প্রাথমিক শিক্ষা ও লাইব্রেরী পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। একদম গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র থাকিবে যেখানে গ্রাম ও সহরের সংস্কৃতি ও সমাজ সেবার উপযোগী সামগ্রিক গঠনমূলক কাজের শিক্ষা দেওয়া হইবে। গ্রামই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, অতএব গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাহাই দেশের প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করিবে। প্রত্যেক গ্রামে শিক্ষার সকল রকম সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া আজ রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। জাতিধর্ম নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের মধ্যে সমতার নীতিতে কাজ করিবার শিক্ষা দেওয়া বুনিয়াদী শিক্ষার অন্ততম লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় এইদিকে কিছু কাজ হইলে দেশের স্বাধীনতা উন্নতি সম্ভব হইবে।

এই পরিকল্পনার প্রথম দফার উদ্দেশ্য দেশের প্রাথমিক শ্রেণী হইতে স্বাভিকোত্তর বিভাগ পর্যন্ত বুনিয়াদী আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাবিধি পড়িয়া তোলা।

এই ব্যয়ের কতক অংশ কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা
করিয়েন আর কতক অবশ্য রাজস্বকার। পরি-
কল্পনার দ্বিতীয় দফার আছে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার
পর্যালোচনা ও তাহার উন্নতির কথা। তৃতীয়
দফার পুস্তকাগার প্রভৃতিতে সাধারণ দ্রব্য ও সমাজ
শিক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি রচনা, ছিটকী ভাষা
প্রচার প্রভৃতির কথা আছে। চতুর্থ দফার বলা
হইয়াছে যে, নানারূপ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বাহ্যিক
শিক্ষা ও সংস্কৃতি কার্যে নিযুক্ত তাহাদিগকে সাহায্য
প্রদান ও যুব শক্তির আশ্রয়কল্পে নানাবিধ বলাপ
প্রচেষ্টার উৎসাহন করা হইবে। পঞ্চম দফার একমুখ
টাকা ব্যয় করিয়া অপরাধপ্রবণ তরুণদের জন্য একটি
শিক্ষাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

আগামী ১৯৪১ ও ১৯৪২ খ্রিঃ কেন্দ্রীয় শিক্ষা
উপদেষ্টা সমিতির এক অধিবেশনে এই বিষয়ে
আলোচনা হইবে। আরও ফলাফলের প্রতীক্ষার
থাকিব।

মূল কাইন্ডাল পরীক্ষা

এই বৎসর মাটিকুলেশন পরীক্ষা আর পুণ্ডিত
হইবেন। আগামী ৩রা মার্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের
পরিচালনার প্রধান মূল কাইন্ডাল পরীক্ষা পুণ্ডিত
হইবে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আনুমানিক ৪০
হাজার। আরও এই নূতন পরীক্ষার প্রবেশার্থীদের
সুত কামনা জানাই। ইহাদের ফলাফল ও কর্তৃ-
পক্ষের পরীক্ষা-চালনার দিকে দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ
থাকিবে। একটি বিবৃতিতে যেখানায় বখাসদ্বয়
কিছু কল বাহির করা বোর্ডের অতিশয়, সেজন্য
পরীক্ষক ও পরিচালকদের সহযোগিতা একান্ত
প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও পুস্তক প্রকাশন

ঐক্যগনিত্ব বাগ্‌চির লেখা একখানি খোলা চিঠি
আমাদের হাতে আসিয়াছে। ইহাতে মাধ্যমিক
শিক্ষাবোর্ডের পুস্তক প্রকাশনের ব্যবস্থা সংক্রান্ত কিছু
অভিযোগ আছে। সরকারি টেক্সট বুক কমিটি

এতদিন বিক্ষোভের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করিয়াছেন।
বলেছেন বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কিছু কিছু
বই আছে, ইহাতে তাহাদের কিছু আর দর। এবার
মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক বলা হইছে যে এই নিজেদের
জায় নিয়াছেন এবং তাহা হইতেই প্রকাশকদের
সহো বেল একটি অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।
সম্প্রতি অনিলাম, এই মনোমালিন্য দূর করার জন্য
চেষ্টা করা হইতেছে, এবং বোর্ডের সঙ্গে পুস্তক
প্রকাশকদের একটি আশোষ যীমান্সা হইয়া
নিয়াছে। ইটা সুখের কথা। ভালো ছাপায়,
ভালো লেখকের ভালো বই বখাসদ্বয় কম মূল্যে
ছোলেমেয়েদের চাতে দেওয়াই আদল উদ্দেশ্য।
সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলেই দেশের মঙ্গল।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনোবাজীর অভিভাষণ

আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁহার জন্মদিন বক্তার
পরিচয় ভাষাতত্ত্ব উত্তর দক্ষিণ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে
অতিক্রম করিয়াছেন। এই পরিভ্রমণের পথে তিনি
সম্প্রতি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে
যে অভিভাষণটি দেন তাহাতে ভাবিবার কথা
অনেক আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাইল
চ্যান্সেলার ডাঃ ডাকিয়ার চোলেন বলেন যে, বর্তমান
ভাষাতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইংরেজের সৃষ্টি।
ইংরেজের তেমনীতির ফলেই পাকিস্তানের সৃষ্টি
আর হিন্দুগণমানে এই বিভ্রমের উদ্ভব। তিনি
আরও বলেন যে তাহাদের সম্বন্ধে বাহির হইতে
তিনিরাই লোকে নানারূপ বিকল্প মতবাদ করিয়া
থাকে। বিনোবাজী এইবার নিজের চোখে দেখিয়া
গেলেন, তিনি যেন ক্রমে সত্যকারের অবস্থা প্রচার
করিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে লোকের
মনের অশুদ্ধ ধারণা দূর করিতে চেষ্টা করেন।

উত্তরে আচার্য বিনোবা ভাবে বলেন, "বিশ্ব
বিদ্যালয়গুলি বিশাল নদীর মত, ছোট এক উৎস
হইতে উৎপাদিত হইয়া ক্রমে নানা বিভিন্ন মনোবাহ

সঙ্গে যিনি আপনার মেহকে পুষ্ট করিয়া পুতুলদিগা
নদীর মত বিশাল জল পরিগ্রহ করে। গঙ্গাঘরের
মত বিশ্ববিদ্যালয়ও নিতাই পুষ্ট ও প্রবহমান
থাকি উচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমাদের দেশের
ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। এই
বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন আমাদের সংস্কৃতির একটি নিদর্শন
পাওয়া যায়। ইসলাম একদিন তাহার বৈশিষ্ট্য বিহীন
ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আবার পুটলও পরবর্তী
কালে তাহা করিয়াছে। সব সংস্কৃতিবই ভাল মন্দ
দুই দিক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হইল বিচার
করিয়া ভালটি গ্রহণ করা, মন্দকে বর্জন করা। কোন
এক সম্প্রদায় এই বিশাল দেশকে গড়িয়া তোলে
নাই, সকলের মানে দেশের ইতিহাস আজ সমৃদ্ধ।
এই সময়ই আজ দেশের উন্নতির পথ প্রদর্শন করিবে।
চাকার ছাত্রদের উপর নির্ভর

চাকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাৎ বিদ্যোত্তকরী এক

মল ছাত্রের উপর পুনিম গত ২১শে ফেব্রুয়ারি লাঠি-
চালনা ও গুলিবর্ষণ করে। দরদলীর রাষ্ট্রত্যাগ কর্ম-
পরিষদের সমগ্র প্রদেশব্যাপী সাধারণ বর্ষকট পালন
করাই সিদ্ধান্ত অনুসারে রাষ্ট্রত্যাগ আন্দোলনের
একটি অংশ এই বিক্ষোভ। ছাত্রগণ ১০০ ব্যক্তি
অসম্পূর্ণ করিয়া দলে দলে এই বিক্ষোভে যোগ দেয়।

পূর্বপাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হইবে উর্দু—
খান্না মাজিহুদ্দিনের এই ঘোষণার কলমেই এই
বিক্ষোভের স্রষ্টি। উর্দু পূর্বপাকিস্তানের লাঞ্চে চার
কোটি লোকের ভাষা নয়, অর্ধচ ইহায়াই সমগ্র পাকি-
স্তানের অধিবাসীর দুই তৃতীয়াংশ। এই লাঞ্চে চার
কোটি লোকের উপর একটি বিনোদী ভাষাকে রাষ্ট্র-
ভাষা করিয়া চাপানো ইহায়া কোন মতেই সম-
র্থ্যে প্রস্তুত নয়। এই দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসীর
মাতৃভাষা বাংলাকেও অগ্রতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া
মানিতে হইবে, ইহাদের এই দাবী তো অগ্রাহ্য নয়।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সমস্যা

[প্রিন্স বোদকুমার সেনগুপ্ত]

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষাদানের সমস্যা
বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা,
একথা যে কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষককেই
স্বীকার করতে হবে। অসম্পূর্ণ শ্রেণীর শিশু
বিদ্যালয়ে কিছুদিন অবস্থানের কালে বিদ্যালয়ের সঙ্গে
কিছুটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে, অতএব শিশুকে
সঙ্গে সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করে শিক্ষাদানে অগ্রদর
করা। খুব কিছু কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর
শিশুদের হচ্ছে পূর্বাভেদজনিত ভিত্তি, যার সঙ্গে
শিশুদের বিনিয়োগের যথেষ্ট পার্থক্য। অতএব প্রথম
শ্রেণীর শিশুদের নিকট বৎসরের প্রথম দিকে প্রবৃত্ত
সমস্যা দেখা দেয় যার সমাধান বাইরের লোকেরা বড়

সহজসাধ্য বলে মনে করেন, ততটা নয়। বিদ্যালয়ের
কার্যক্রম ও রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রায়
৩০টি শিশুকে নিয়ে শ্রেণী-শিক্ষককে যে কত
অসুবিধার পড়তে হয় তা যার এ বিষয়ে
অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন। বাড়ী এবং
খেলার ছোট আদিনা থেকে শিশু যখন বৃহত্তর
আবেষ্টনীতে এসে প্রবেশ করে তখন শিক্ষককে
করতে হয় দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান।
গৃহ ও বিদ্যালয়ের ব্যবধান বিরাট সমস্যা নাই,
কিন্তু যে শিক্ষক, সেই ব্যবধানকে পত ছোট করে
শিশুদের নিকট উপস্থিত করতে পারবেন, তিনিই
হবেন শ্রেণী-শিক্ষক হবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

এই ব্যবস্থান নিয়মিত পদ্ধতি খুবই কঠিন সম্বন্ধে
সাহে। শিক্ষককে সম্পূর্ণভাবে শিশুর পিতামাতা
তাইবোনের পথারি নিয়ে চলতে হবে, তবেই শিশু
পাবে অভ্যস্ত আপন মন, যার কাছ থেকে কোন
কিছু গ্রহণ করতে তার আর আগ্রহ থাকবে
না, বরং শিশু মনে অস্বাভাবিক আগ্রহে আনা,
আনন্দ ও উদ্দীপনা।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা একবার বিবেচনা
করে দেখলে হয়। প্রথম শ্রেণীতে শিশুরা হয়ত
আছে ৩০ জন। দু'একটি পরিবার থেকে ২৩
জন করে এলেও কম-বে-কম ২৪টি বিভিন্ন পরিবার
থেকে তারা বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষালভের জন্য
এসেছে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে
যেখা থাকে ২৪টি বিভিন্ন আবেষ্টনী থেকে শিশুদের
আনার ফলে বিভিন্নপ্রকার 'জীবন-যাত্রার মানের
মধ্যে পরিচিত হয়ে এবং তাদের তাবতারার
পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ও শিক্ষার আদর্শের মধ্যে
সামঞ্জস্য রেখে, একটা Golden mean বা মধ্যপথ
অধিকার করে, শিক্ষককে চলতে হচ্ছে।

এইত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে
প্রত্যেক শিশুর প্রায় প্রথম শিক্ষার্শ্ব হিসাবে
সব কিছুই শিখতে হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিংবা অন্যান্য শ্রেণীতে শিশুর
পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শিক্ষককে পড়া
লেখা, অঙ্কনিকা বা অন্যান্য শিক্ষার জন্য আবেষ্টনী
তৈরী করতে হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের
পূর্বজ্ঞান কতটুকু? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,
তারা শিক্ষার পূর্বজ্ঞান শুধু শিশুর কথা বলা, বা
শিশু-জীবনে এখনও স্থনিয়ন্ত্রিত হয়নি। লেখার
পূর্বজ্ঞান হিজিবিজি অঁকা, অঙ্ক শেখান পূর্বজ্ঞান
লংখ্যা সহজে অঙ্কটি খাটনা। স্বাদ্য ও পৌর
কর্তব্যাদি সহজে জ্ঞান বা বৃহোপযোগী। হাতের
কাছে এলোমেলো পুস্তকাদি কাজ করার ইচ্ছা
আছে অথচ প্রেরণা নেই।

এইত গেল সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীর শিশুদের
অবস্থা। অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা হতে
এদের অবস্থা কত বিভিন্ন তা বলে শেষ করা যায়
না। প্রতি পথে শিশুদের জন্য তির তির আবেষ্টনীর
সৃষ্টি করে তাদের চালনা করতে হবে, তা নইলে
মুখে বলা বা আদেশ করার পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিই
অসুসঙ্গ করা হবে। গৃহের প্রভাব যদি বিদ্যালয়ের
শিক্ষাচারার পরিপন্থী হয়, তবে স্বাস্থ্যরক্ষা বা পৌর-
কর্তব্যাদি সহজে জ্ঞানদান খুবই কঠিনসাধ্য হয়। এমন
কি লেখাপড়া, অঙ্কনিকা বা পূর্বজ্ঞান শিশুর খুবই
কম, তাও শিশুমনকে সহজে আকর্ষণ করে তবুও
জীবনে পথম প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিশুদের দ্বারা
অসুসঙ্গ করার সম্ভাব্য হয়ে ওঠে না।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের অবস্থা যখন সর্বত্র
এইরূপ, তখন সাধারণ শিক্ষক কি ভাবে
অগ্রসর হলে কাজের কিছু সুবিধা হবে, লেখা
আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে শিশুর শিক্ষার জন্য
উপযুক্ত আবেষ্টন তৈরী করা এবং সেই আবেষ্টনী
ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল হলেও একটা
সাধারণ আবেষ্টনী শিশুদের জন্য থাকবে, যাকে
প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করে শিক্ষককে শিশুদের
নিরে চলতে হবে। এই সাধারণ আবেষ্টনীটি তৈরী
করতে হবে শ্রেণী কক্ষে। শ্রেণী বিন্যাস এবং
শ্রেণীকে উপযুক্ত উপকরণে সজ্জিত করা শিক্ষকের
হক্কার পরিচায়ক এবং এর উপরই শিশুর শিক্ষার
প্রতি নির্ভর করছে।

এখন প্রথম শ্রেণীর কথা, শিক্ষক কি ভাবে
সাজাবেন এবং সর্বনিম্ন কিছুটা ব্যবস্থা করলে শিশুদের
মন সহজে আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, সেই বিষয়ের
আলোচনাই এখানে হবে।

শ্রেণীকক্ষ খুব যে নানা রকম হবি দিয়ে সাজাতে
হবে, তা নয়। শিশুর প্রয়োজনের উপর নির্ভর
করে শ্রেণীকক্ষ সাজাতে হবে; অতএব বাইরের

লোকেরা যবে এসে শ্রেণীর চাকচিৎ দেখে যাওয়া দেবেন, এই উদ্দেশ্যেই শুধু শ্রেণীকক সজ্জিত হবে না।

প্রথমত, শ্রেণীতে বহুকেটি বাধান স্তম্ভের ছবি থাকবে, যাত্র বহুকেটি ছবি, বেশী নয়। স্তম্ভের ছবি শিল্পমনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু যদি শ্রেণীককে খুব বেশী ছবি থাকে, তাহলে শিল্পেরা সেই ছবিগুলিকে আসবাবের মতই মনে করবে, ওদের তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টাই করবে না। শ্রেণীতে ছবির মধ্যে ছবির কন্ঠের ছবি থাকবে, একরকম থাকবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রকাশক, আর একরকম ছবি দেশের অল্প বহুকেজন বড় বড় নেতাব, ধানের কীটন-কাচিনীর মধ্যে শিল্পেরা সর্বদা বিভ্রান্তের উপর অস্ত্রাভ্যাসের মধ্য দিচ্ছে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে এবং ধানের কীটন শিল্প-জীবনকে রীতিমত প্রভাবান্বিত করবে। তাই এইগুলি হচ্ছে শ্রেণীর স্থায়ী ছবি, এগুলোর কোন সময়ে বদলাবার প্রয়োজন নেই।

এই স্থায়ী ছবিগুলি ছাড়া শ্রেণী কক্ষের দেওয়ালে কতকগুলি frieze থাকবে। এই friezeগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। friezeগুলি তৈরী করার শিল্পকের। তিনি শিল্পের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে frieze তৈরী করে দেওয়ালে টানিয়ে দেবেন। friezeগুলি হবে ছবির মতো। একরকম হবে বস্তুর বিস্তারিত কল্পনামাত্রের ছবি। বলা বাহুল্য, সম্বোধনযোগ্য নির্দিষ্ট কল্পন ছবিই শুধু থাকবে। শুধু বস্তু হলে ছবিও বস্তু হলে হবে। আর দ্বিতীয় রকম frieze হচ্ছে বহু প্রচলিত গল্প বিষয়ক। গল্পগুলি বহুকেটি ছবিতে কল্পনামাত্র থাকবে। ছবিগুলিকে পর পর সাজিয়ে রাখলে শিল্পমনের সৃষ্টি আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নাই। এছাড়া ছবি সম্বন্ধিত ছড়া ও কবিতা বড় বড় করে লিখে টানিয়ে রাখা চলে। যে সব frieze-এর কথা বলা হল, তাদের চাহিদা শিল্পের কাছে দিতে গেলেই, শিল্পক

শিল্পের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুধাবন করে সৃজন frieze তৈরী করা যেন। এই সৃষ্টি শিল্পের আকা ছবি ও প্যাটার্ন শ্রেণীর দেওয়ালে স্থান পাবে। তবে সেগুলোর আকর্ষণ শিল্পের কাছে কখনোই ও ক্রম পরিবর্তনশীল। শিল্পের আকার নিজেই সৃষ্টি না হয়ে আরও ভাল ছবি একে সে স্থান পূরণ করতে তারা চাইবে।

frieze-এর কাজের সাথে সাথে শিল্পক আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজ করবেন। শ্রেণীর প্রতি আসবাব এবং আনালা সম্বন্ধে কার্ডবোর্ডের লেবেল লাগাতে হবে এবং সেট লেবেলগুলিতে বড় বড় মোটা অক্ষরে তিনিদের নাম লিখে রাখতে হবে। তা ছাড়া 'সবজা খোল', 'বই আন', 'কলম দাও', 'আনালা বন্ধ কর' ইত্যাদি আদেশসূচক নানাবিধ বাক্য বড় বড় করে কার্ডে লিখে শিল্পক নিজেই কাছে রেখে দেবেন এবং যখন শিল্প উপস্থিত হবে, তখন যুগে আদেশ দেবার বসলে শিল্পকে আদেশসূচক কার্ড দেখিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করাবেন।

পূর্বেই বলেছি শ্রেণীকক শিল্পের আকৃষ্ট করবে এই উদ্দেশ্যে লিখে শিল্পক শ্রেণী-কক সাজাবেন। শ্রেণীকক আকর্ষণীয় করতে হলে নানা ভিন্‌নিবেশ যেমন আয়োজন করতে হবে, তেমনি ককটি বেশ বড় না হলেও চলবে না। সাধারণত ৮ বর্গ-ফুট স্থান হলেই শিল্পের বসবার মত স্থানের সন্ধান হবে যাবে কিন্তু যেহেতু শিল্পের নানাবিধ সৃজনাত্মক কাজ এই শ্রেণীতে বলেই করতে হবে, এবং নানা ভিন্‌নিবেশ ব্যবহারও রাখতে হবে সেই হেতু প্রতি শিল্পের জন্য ১৫—২০ বর্গফুট স্থান পাওয়া গেলে শ্রেণীর কাজ সূচায়ত্রে সম্পন্ন হওয়ার আশা করতে পারা যায়।

যে স্থানটিতে বলে শিল্পের পড়াশুনা করবে সে স্থানে কোন চেয়ার বেঞ্চি ইত্যাদি থাকবে না, সেখানে আসন নেতে শিল্পেরা বসবে। ৩০ জন শিল্প ও এক জন শিল্পকর জন্য একটি শ্রেণীতে

অন্ততঃ পক্ষে ৩১টি আঙ্গুর ও একটি ছোট ভেঁড় থাকবে। শিক্ষকের ডান হিঃবা ঠা হিকে ব্র্যাকবোর্ড থাকবে, কোন দিকে ঠিক থাকবে সেটা অবশ্য হবে আলো আলোর উপর নির্ভর করবে। বড় বোর্ডের সঙ্গে ছোট একটি বোর্ড থাকলে ভাল হয়। যদি ছোট বোর্ড রাখা সম্ভব না হয় তাহলে ১৬'x২' লাইটবক্সের উপরের দিকটার আঠা দিয়ে কাগজ লাগিয়ে বা অন্য একটি কার্ডবোর্ডের মাঝার উপর কাগজ লাগিয়ে দিনপত্রী তৈরী করে বেওড়ালে আটকে রাখতে হবে। দিনপত্রীর মধ্যে বাব ও তারিখ লেখা থাকবে। সেই দিনপত্রীতে প্রার্থীও নেতা প্রতিদিন বড় বড় করে তারিখ লিখে দিবে আসবে। ক্যালেন্ডারের মত মর কাটা থাকবে, প্রতিদিন একটা করে মর পূরণ হবে। তা ছাড়া পূর্বেই বাংলা ও ইংরেজী নামের ক্যালেন্ডার শিক্ষক শিত্তদের সাহায্যে তৈরী করে বেওড়ালে টানিয়ে রাখবেন। এই ক্যালেন্ডার দ্বারা প্রতিদিনকার তারিখ লেখা হবে। ক্যালেন্ডারের কাগজের নীচের অর্ধেকের মধ্যে থাকবে তারিখ আর উপরের অর্ধেক থাকবে যে মাসের তারিখ লেখা হচ্ছে, সেই মাসের শুভ বৈশিষ্ট্যের ছবি।

দিন-পত্রী তৈরী যেমন শিত্তদের বাব তারিখ ইত্যাদি শিববার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ভেদনি আবহাওয়ার একটি চার্টও আবহাওয়ার সম্বন্ধে জানদাতার বিশেষ সহায়ক। পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং সে হিসাবে আবহাওয়ার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া শিত্তদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ। আবহাওয়ার চার্টে তারিখ থাকবে ও আবহাওয়ার বস্তুর নানাতাবে বিশ্লেষণ করা থাকবে; সূর্য বস্তুতে কোণার রোদ রয়েছে, মেঘের চিহ্ন নেই : মেঘাণ্ডত সূর্য মানে, মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে মেঘ, গাছগুলি হয়ে পড়ছে তার মানে বাতাস বইছে, বাতাসের দিক বোঝা থাকে গাছের স্তম্ভ-পড়া থেকে, তারপর

বুড়ি পড়ছে, এইরূপে নানা ছবির সাহায্যে আবহাওয়ার বিভিন্ন রূপ চার্টে সুবিধে দেওয়া থাকবে। প্রতিদিন শিক্ষক শিত্তর সঙ্গে আলোচনা করে সেইদিনের বৈশিষ্ট্যগুলি শিত্তদের দ্বারা নোট করা যেন।

শ্রদ্ধী কক্ষের একটি কোণে একটি টেবিলে পরিবেশ থেকে সংগৃহীত বস্তু বস্তু থাকবে। সংগ্রহ করার প্রথম দাবি হচ্ছে শিক্ষকের কিছু শ্রদ্ধীর কাজ কিছুটা অগ্রসর হতেই তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করার মত শিক্ষক শিত্তদের কাছে প্ররোচনা করা যেন। বলা বাহুল্য শিক্ষক এ বিষয়ে আশ্চর্যবিশিষ্ট সাহায্য পাবেন। শিত্ত চার কাজ করতে এবং এ কাজের কাজ শিত্তর খুঁই মনোমত এ বিষয়ে বিশেষ ঘোর করেই বলা চলে। শুধু এবং শুধু মনে সম্পর্কে যেসব ছবি টানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার পোষকতা করবে, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এই সকল বস্তু। প্রকৃতির মান সামান্য নয়, একটি টেবিলে তার সন্মিলনও হবে না, তাই যে সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে শিত্তরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করবে, যেগুলির সংরক্ষণ সম্ভব সেগুলিই শিক্ষক রেখে দেবেন। বাকীগুলির সঙ্গে শিত্তদের পরিচিত করে তিনি তাদের বখাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন। নানারকম পত্র, কলম, গাছের ডাল পাতা, ব্যাঙের ছাতা, পান্থক, মৌমাছি, ককিৎ, গাভীর পদিত্যক্ত ভিম, গাভীর পদিত্যক্ত বাসা, গিপড়ার ভিম, মৌমাছির চাক, ইত্যাদি বা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব সবই শিত্তর কাছে ঐতিহ্য ও শিক্ষাপ্রদ হবে।

সংগৃহীত বস্তুগুলির নিকটে একটি কাচের ঘেরা উপরের দিক খোলা থাকুক যেন, তার তিত্তর জল দিয়ে ছোট ছোট বাছ বা ব্যাঙাচি রেখে, তাদের বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে শিত্তরা খুঁই আনন্দ পাবে। কাচ-ঘেরা বাক্সও খুব ব্যয়পাধ্য নয়। কুণলী শিক্ষক একটি

কাচের বাস্ক অনায়াসে তৈরী করে ফেলতে পারবেন।

একটি পেন কাঠের চারদিকে চারটি কাঠ খাঁচ করে লম্বাভাবে বসিয়ে দিবে কাচগুলি খাঁচের মধ্যে লাগিয়ে দিলেই কাচের বাস্ক হল। জল যাতে চুইয়ে না পড়ে, তারজন্তু পুটিং লাগিয়ে মোড়ানুলি আটকে দিতে হবে। এভাবে কাচের বাস্ক তৈরী করলে খরচ খুবই কম পড়বে অথচ শিশুদের মনের খোঁষাক জোটান যাবে প্রচুর।

পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য যে বস্তুগুলি সংগৃহীত হল তার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ থাকবে শ্রেণীর বাগানের। প্রথম শ্রেণীর জন্য একখণ্ড জমিতে বাগান করতে হবে, শিশুদের সাহায্য নিয়ে শিশু সৈন্যে ফুল ও গজির গাছ রোপন করবে এবং বস্তু করে শেগুলিকে বাঁচিয়ে ও বড় করে তুলবে।

শ্রেণী কক্ষের একদিকে যেমন একটি প্রদর্শনী ঘাইল, সেইরূপ আর একদিকে থাকবে একটি খেলার ঘোড়ান ঘর। এই ঘোড়ানে থাকবে নানা বস্তুদের জিনিষ। জিনিষগুলি সবই কোটার বা বড় বড় কার্ডবোর্ডের বাক্সে থাকবে। কোন বাক্সে বা কোটার কি আছে তা জানবার জন্য সেই কোটার বা বাক্সে লেবেল লাগাতে হবে এবং সেই লেবেলে লেখা থাকবে বড় বড় অক্ষরে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের নাম। আর তারপর থাকবে জিনিষের দাম সহ একটি তালিকা। জিনিষের দাম করনা-প্রস্তুত হবেন। বাস্তব জীবনে জিনিষের যে দাম প্রচলিত আছে সেই দামই তালিকায় লেখা থাকবে। জিনিষের নাম ও দাম প্রথমে লিখে দেবেন শিক্ষক, তারপর শিশুদের পরিচালনার কলে ঘোড়ানের অবস্থা নানাবিধ থেকে উন্নত হবে, তখন শিশুগাই বা কিছু লেখবার সব লিখে নেবে। ঘোড়ানে দাঁড়ি পাড়া ও শুভন থাকবে। প্রতিদিন একজন হবে যিক্রেতা আর সকলে হবে ক্রেতা। জিনিষ কিনতে হলে টাকা পয়সার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মিটেবে

কার্ডবোর্ডের টাকা পয়সা তৈরী করে। কিছু টাকা আধুলি, সিকি, দু আনি, আনি, আশ আনি ও পয়সা শিক্ষক নিজেই তৈরী করে রাখবেন, যাতে করে এই কার্ডবোর্ডের মুদ্রাগুলির সঙ্গে সহজ পরিচয় স্থাপন করতে পারে। দাঁড়িপালার সঙ্গে বাটখারার প্রয়োজন। দাঁড়িপালা-শিক্ষক অতি সহজেই তৈরী করে নিতে পারেন কিছু বাটখারা আসল হওয়া বাছনীয়। এ বাড়ীর জিনিষ দ্বারা দুটো কাজ সিন্দ হয়, অর্থাৎ সত্যিকার ওজন সহজে ব্যবস্থা এবং সেই ওজন নির্ধারণ নামের সহজে জ্ঞান অধ্যান হয়। দুইয়ের সামঞ্জস্য যাতে হয় সেজন্য আসল বাটখারা বিশেষ কার্ণকরী হবে। দম ওজনের ইট পাটকেল ততটা মনোগ্রাহী হবে না কিংবা তদ্বারা ওজনের প্রচলিত মানের সহজে ব্যবস্থা পাওন হবে না।

ঘোড়ান সহজে আড়া দু একটি কথা না যাতে শ্রেণীতে ঘোড়ান কথার উচ্চারণই ব্যর্থ হবে। ঘোড়ানের দেওয়ালে ঘোড়ান পরিচালনা সারিয়ে করেকটি কথা লেখা থাকবে। যথা—

এক ঘর। দ্বারের বিক্রী নাই। দ্বার চাহিয়া লক্ষ্য দিবে না। লাইনে দাঁড়াইবেন। কেবল পয়সা শুধে নেবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেহেতু এক কোণে ঘোড়ানঘর হল, আর এক কোণে থাকবে একটি পুতুলের সংসার। একটি বাড়ী, পুতুল, তার স্ত্রী ও চেলমেয়ে। খাট, বিছানা, কাপড় চোপড়, খাদ্য বাগান ইত্যাদিও কিছু কিছু থাকবে। সামান্য ছোট সংসার, এর উপর ভিত্তি করে শিশুরা পুতুল দম্পত্যের যথেষ্ট উপকার করতে পারে। বিশেষ অর্থপ্রাপন ও অস্ত্রাঙ্ক উৎসব এই পুতুলের সংসারকে কেন্দ্র করেই করতে পারা যায়।

অনেক শিক্ষাবিদ প্রথম শ্রেণীতে এরূপ একটি পুতুলের সংসার রাখা সহজে সম্ভব প্রকাশ করতে পারেন। সংক্ষেপে এর প্রয়োজনীয়তা সহজে বলতে গেলে এটাই বলতে পারা যায় যে প্রথম

শ্রেণীর শি্ষতা তেমনভাবে project অঙ্গসঙ্গ করতে পারে না, অথচ শুধু খণ্ড খণ্ড activity তাহের সহ সহায় আনন্দও দিতে পারে না, তাই এমন একটা চিত্তাকর্ষক কেন্দ্র শ্রেণীতে স্থাপন করা গেল, যার উপর চি্ষিত্তি করে শি্ষতা, project না হলেও project-এর মত কিছু করতে পারে। পুস্তকের সংসার, নিত্যের সংসারেরই ছাঁচ বলে শি্ষকের কাছে ঐ কেন্দ্রকে ঘিরে কোন কিছু রচনা করতে পারা অসম্ভব মনে হবে না।

শ্রেণীর এক অংশে যেমন পুস্তকের সংসার বইল, সেজন্য আর এক অংশে থাকবে একটি ছোট লাইব্রেরি। ছোট একটি আলমারি, তাতে থাকবে শি্ষকের উপযোগী কিছু ছবির বই। আলমারির নিকট একটি বীচু অথচ বড় টেবিল থাকবে, আর তার চারিদিকে থাকবে ৫-৬ খোলা চেয়ার। যেদর শি্ষক কোন activity-তে যোগদান করতে চাইবে তা অথচ পড়তে চাইবে, তাহের জন্য এ ব্যবস্থা থাকবে। তবে শি্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রত্যেক শি্ষকই যেন বই পড়ার সুযোগ পায়।

শ্রেণীতে এসব জিনিস ছাড়াও, শি্ষকের শি্ষতা ব্যবহারের উপযোগী নানাবিধ জিনিসের সংগ্রহ থাকবে। চক্ ফেনে, হং, তুলি, বীণ, বেতা, কাটাচি, কাগজ, কাচি, তুলি, তকলি, কাঠ, পেনসেল, হাতুড়ি, কলম, আঁঠা, কোলাল, খুঁপি ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিস শ্রেণীতে যত্নে রাখবে। শ্রেণীকক্ষের বাইরে একটি বালির পুণের ব্যবস্থা রাখতে হবে, আর তার অধরে থাকবে মাটির কাছ কাছের স্থান। সুবিধা হলে কাছেই খুব অগভীর একটি চৌধাড়া বাটির সমস্তলৈ তৈরী করে রাখলে ভাল হয়।

Activityগুলি কিভাবে পরিচালিত হবে সে প্রশ্নের আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কিন্তু activityর সঙ্গে যুক্ত যে সে শি্ষকের বিবরণ যুক্ত থাকবে, তার জন্য পূর্বাঙ্কে প্রস্ততি প্রয়োজন। Activityর উপর নির্ভর করে সাহিত্যের যে যে

পাঠ উদ্ভব হওয়া সম্ভব প্রথম অবস্থায় সেসব পাঠগুলির প্রতি বাক্য ১০"১২" বৈধি এবং ২৫"৩০" প্রস্থে কার্ডবোর্ডে, বড় বড় মোটা হরকে লিখে, সেই বাক্য এবং বাক্যের অংশ, এবং ও অক্ষর বড় বড় ঘাসে পুঁতে রাখতে হবে। প্রয়োজন অঙ্গসঙ্গী শি্ষক সেই পাঠগুলি দিতে হবে। শি্ষক সেগুলো পড়বে এবং বাক্য ও শব্দ তৈরী করবে, তাহবে এবং আবার পড়বে। Activity হতে উদ্ভূত বস্তুর ছবির মিলিত সংখ্যাও মোটা হরকে লিখে শি্ষককে প্রয়োজন অঙ্গসঙ্গী দিতে হবে। সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য activity ছাড়াও নানাবিধ খেলার যোগাড় রাখতে হবে, এই খেলাগুলো অধিষ্ঠিত শি্ষক নিজেই তৈরী করে দেবেন। এই আতীর খেলার মধ্যে লুডো, সান ও সিঁড়ি, গোলকর্ষাণ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। খেলা ছাড়া সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য শ্রেণীতে কয়েকটি বলক্রয়ের যোগাড় করতে হবে।

সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীর শি্ষকারীও অন্য শ্রেণীতে কি কি জিনিসের প্রয়োজন, তার সাহায্য ইদিত দেওয়া হল। শ্রেণীর প্রয়োজন অঙ্গসঙ্গী জিনিসগুলি সংখ্যার কমবে বা বাড়বে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে পুঁথোনা শি্ষকপদ্ধতি থেকে মুক্ত হয়ে যদি কর্মকেন্দ্রিক শি্ষককেন্দ্রিক শি্ষকার দ্বারা অঙ্গসঙ্গ করতে হয়, তাহলে শ্রেণী নানা উপকরণে পূর্ণ রাখতে হবে। শি্ষক কর্ম চাও, কাজ করতে গেলে সে বস্তু সঙ্কটে ও আনন্দিত হয়, যেন যদ শি্ষকের নির্দেশ অঙ্গসঙ্গী পড়াশুনা করতে সে তার শক্তিশালী এক অংশও আগ্রহ বোধ করবে না। কিন্তু কর্ম করতে চাইলেই শি্ষক যেভাবে ইচ্ছা কাজ করতে দিলে চলবে না, সেইখানেই চাই শি্ষকের পরিকল্পনা। যেন রাখতে হবে, প্রথম শ্রেণীর শি্ষক পক্ষে সমস্তই নৃত্য, লেখাপড়া, সংখ্যা, পরিবেশ সম্বন্ধী বিবরণ, আত্মবিদ্য, পৌরকর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই তাকে নৃত্য শি্ষতে হবে।

অতএব শিক্কে স্থানীয়ভাবে কর্মের মাধ্যমে আনন্দের মধ্যে শিক্কা দিতে পারলেই, কাজে শিক্কে পকে সহজ হবে। নানা উপকরণে সজ্জিত শ্রেণী চলে নাটকাত্মকভাবে বাবা স্টেজ, যাকে নির্দিষ্ট অস্তিত্বের অঙ্গ সামান্য পরিবর্তন করে কাজে লাগান যেতে পারে। যেসব উপকরণের কথা বলা হয়েছে, সেসব উপকরণ সংখ্যায় ও প্রকরণে কমবেশি, স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী প্রতি স্থানীয় বিদ্যালয়ে থাকবে, তবেই শিক্কাপকে কর্মে প্রবৃত্ত করা সম্ভব হবে।

উপকরণের তালিকা দেখে দ্রুত শিক্কা বলছেন যে, স্কুলবোর্ডের পকে একটি শ্রেণীর জন্য এত খরচ করা করা সম্ভব নয় এবং চাইলেও টাকা পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেসব শ্রমিকের কথা লেখা হয়েছে, তাতে টাকা দিয়ে কেনবার মত শ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশি নেই। টাকা বেশি খরচ হবে দ্রুত লাইব্রেরিতে। কিন্তু বইয়ের ব্যবস্থা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গ শিক্কা অধিদপ্তরের ১৯৫০ সনের সাকুলার অনুযায়ী যা হয়েছে, তাতে লাইব্রেরিতে খুব বেশি টাকা খরচ হবে না। তবে প্রত্যেকটি শিক্কা শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন লেখকের একটি করে বই কিনবে এবং সেই বইগুলি শ্রেণীর লাইব্রেরিতে থাকবে। তাহলে সব শিক্কাই সব বই পড়বার ও দেখবার সুবিধা পাবে। এ ব্যবস্থা খুব বেশি কার্যকরী হওয়া মুক্তি পাবে কারণেও উচ্চশিক্ষা শিক্কা যদি অস্তিত্বের সঙ্গ সঙ্গেই যোগাযোগ করা করেন তবে শিক্কাের পুস্তক শ্রেণীর লাইব্রেরিতে রাখা খুব বেশি অসুবিধাজনক না-ও হতে পারে।

উপকরণের দ্রুত নির্মিত খরচ (recurring expenditure) হবে চক্, যং কাগজ ইত্যাদিতে। আর কোয়াল, খুঁপি, হাতুড়ি, কাটাতি, কথাত ইত্যাদি কিনতে খরচ হয়েছে স্কুল স্থাপনের সময় এককালীন খরচের টাকা (capital expenditure) হতে। এককালীন টাকা ও স্কুলের প্রথম অবস্থা

পেতে চলেই, আর সামান্য পৌনঃপুনিক(recurring) খরচ ও স্থানীয় স্থানের দ্রুত যেভাবে হোক যোগাড় করতে হবে। কিন্তু উপকরণের সুলভ্য খরচ হবে অতি সামান্য একবারে শিক্কা করে বলা যায়। যেসব চাপ শ্রমিকই শিক্কাকে পরিচাল করে তৈরী করে দিতে হবে। প্রত্যেক শ্রমিক কেনবার অপেক্ষায় থাকলে খরচে শুধুলাবেই না, দ্বিতীয়ত পরমা দিবেও ঠিক উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া যাবে না, অতএব শিক্কাকেই যাকে যাকে শিক্কাের লাভানো সমস্ত শ্রমিক তৈরী করে ফেলতে হবে। বলা বাহুল্য শিক্কা কাছে এর স্কুল বোর্ডেই অতিক্রিয় নয়।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্কাের কালে কি কি শ্রমিকের প্রয়োজন হয় সামান্য ভাবে তার তালিকা দেওয়া হল। এই উপকরণ ও শ্রমিকগতাদি কিতাবে কাজে লাগালে দ্রুত পাওয়া যাবে সে আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়, তবুও এই উপকরণগুলির সাহায্যে শিক্কা কতটা শিক্কা পেতে পারে তাই শুধু সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। Activity থেকে শিক্কা শুধু কাজ করতেই নেবে না ব' তাহলে হাতের মাংসপেশীগুলি স্থানীয়ভাবে হয় না। পড়তে, লিখতে অক করতে, পরিবেশ সহজে জানলাও করতে, পরিচাল পরিচাল থাকতে, সজ্জায়ে চলতে, মিলেমিলে কাজ করতে দেখে।

২। Hobbiesগুলি থেকে শিক্কা সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। গল্প বলনা থেকে তৈরী করতে, বলতে ও লিখতে দেখে। কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় করতে দেখে এবং আবেগী জ্ঞানও তাহলে বৃদ্ধি পায়।

৩। যোগান যত থেকে লেখাপড়া অঙ্কনিকা ছাড়াও, পৌরকর্তব্যাদি, পরিচাল পরিচাল থাকা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্কা লাভ করে।

৪। পুতুলের সমোহ থেকে দ্ব্যাহারকা, পৌর কর্তব্য, শুকচন্দকে শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি শিক্ষা পায়।

৫। সংস্কৃত ভাষাদি থেকে পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় গভীর হয়। পড়তে ও লিখতে প্রেরণা জাগে।

৬। লাইব্রেরিতে পড়া থেকে শিশুরা নীরবে অস্ত্রের অগ্রবিধা না করে পড়তে শেখে ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদানের সমস্তা খুব বেশি। মোটের উপর শিক্ষককে সর্বদা শিশুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের নিজে কি করতে চাই, কি আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, কি তাতে চললে সেই আদর্শে পৌঁছান যেতে পারে সেই দিকে শিক্ষকের সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, তবেই প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সফল হবে।

শিক্ষাব্রতীর আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনী

[শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস]

শ্রীচরণকমলেষু—

দাস্তাবমশাই, আসিবার দিন হঠাৎ ঠিক হইল; যদিও উদ্ভোগ আয়োজন অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছিল। এখানে M. A. পড়িবার জন্য যুগ্মি পাইব, তাহাতে আমার একানবাব লক্ষ্য ধরত চলিয়া দাইবে, এ ধরত Graduate Collegeএর Dean Mr. Willie G. Swartz আমাকে গত মার্চ মাসেই জানাইয়াছিলেন। কিছু কথার মাছে, বাবো হাত কাঁকড়ের তেতো হাত বীচি। বাস্তবাত্ত বরচই তো চার পাঁচ হাজার টাকা। নয়া দিল্লীতে U. S. Educational Foundation Officeএ Fulbright Travel Grantএর জন্য আবেদন করিয়াছিলাম; পাইলে বাস্তবাত্ত বরচের জন্য চিন্তা থাকে না। অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু বাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলাম যে বাস্তবাত্তের ব্যবস্থা ঠিক। কিছু তখন কলেজ পুলিশে মোটে দুই সপ্তাহ বাকি; ওড়াপথে না গেলে অত্যন্ত খেরি হইয়া যায়। একথা জানাইতে আগের টেলিগ্রাম আসিল যে আমি আকাশপথে আমেরিকায় বাইতে পারি; কলিকাতায় আমেরিকান এম্বাসেল সব ব্যবস্থা করিবে। আলীপুরে পাসপোর্টের জন্য অতিরিক্ত

ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে গেলাম। অনেক আগেই আবেদন করিয়াছিলাম; পুলিশ তদন্তও হইয়াছিল, কোন বিতর্ক কথা পুলিশে লেখে নাই বলিয়া জানিয়াছিলাম। কিছু কেরাণীদ্বাবু বলিলেন, application form মশাই পাওয়া বাইতেছে না। আমাকে পুলিশ অফিসে বাইতে বলিলেন। সেখানে গেলে তাঁহার্য্য বলিলেন যে সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার্য্য কেবল দিয়াছেন। এইভাবে তিন দিন যুগ্মিবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিতেই তিনি কেরাণীদ্বাবুকে ধমক দিয়া আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা তাকাতাড়ি সারিতে চক্রম করিলেন। তখন কেরাণীদ্বাবু বলিলেন যে সমস্ত কাগজপত্র তারপর দিনই Writers Buildingএর পাসপোর্ট অফিসে দাইবে। এইভাবে কাজ করিয়া অবশেষে পাসপোর্ট বাহির করিলাম।

ভ্রমণের জন্য বিয়ার্ড ব্যাকের নিকট আবেদন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় যাবকত অনেক আগেই করিয়াছিলাম। তাঁহার্য্যও প্রতিশ্রুতি করিয়া শেষ মুহূর্তে পাঠাইলেন। তাগো একাউন্ট্যান্ট মহাশয় ভাল লোক ছিলেন। তাহাতেই ৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ হইল—জু কেরকটা কথা লিখিয়া দেওয়া। হাসিয়া বলিলেন

যে এই সামান্য কাজ সারিতে অকস্মিক এক সপ্তাহ সময় নেয়। এদিকে তিনবার ভ্রমণ আমেরিকান কন্সাল অফিসে গেলে তাঁহারা ঘানিতে চাছিলেন যে আমি Exchange Visitor Programএর অন্তর্ভুক্ত কিনা জানা ব্যবহার। তখন Graduate Collegeএর Deanএর নিকটে কেবল কহিলাম; নয়া দিল্লীতে U. S. Educational Foundation Officeএও জানাইলাম যে তিনা অফিসার এইসব অনুবিধার সৃষ্টি করিতেছেন। উভয়ে জানাইলেন যে কন্সাল অফিসকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বাহ্যিক তিনা বাহির হইতে দেবিনা যেন। এদিকে কেবলগ্রামের উত্তর আসিল "you will be under Exchange Visitor Program p-281"; তখন দুইটি অহুই জানাইতে জানাইতে Visa Officerএর নিকটে গেলাম। তিনি তখন নরম হইয়া তিনা দিতে প্রকৃত করিলেন। আনুষ্ঠানিক সব কাজ শেষ করিয়া তিনিলাম পরদিন সন্ধ্যা হইবার পর পাওয়া বাইবে। তিনা, পাসপোর্ট, জন্মের সার্টিফিকেট দুটো দুটি করিয়া একই দিনে অর্থাৎ শুক্রবারে বাহির কহিলাম। আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে গেলে তাহারা বলিলেন যে সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক পর্যন্ত টিকেট পাওয়া বাইবে কিনা তাহা পরদিন শনিবারে জানা বাইবে। শনিবারে গেলে পর তাহারা নিউইয়র্ক পর্যন্ত আকাশ পথে ও নিউইয়র্ক হইতে আমার কলেজ পর্যন্ত রেলের টিকেট অর্জাবলি। কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত Air Indiaর বিমানে, সেখান হইতে Trans-World Air lines (T. W. A.) সোজা নিউইয়র্ক।

এ কয়দিন অত্যন্ত তাঁড়ান্ডার মধ্যে কাজ করিতেছিলাম। ঠিক হইল, ব্যবহার বাজে হুইপস আমার বাড়িতে থাকিব। পরদিন সোমবার ওয়াশেংটন সন্ধ্যা ৭টার সময় হইতে আমাকে আকাশ পথে ছুটিতে হইবে। সপরিবারে এবিধ

হুইপস আমার বাসাটো বাড়ি কাটাইলাম। পর-দিন ভোর ৪টার শিলং মাঝা মাঝী নিচা আসিলেন। স্ত্রী, বন্ধা, হুইপসমাঝা ও শিলংমাঝা সহ বসনা হইলাম। কিন্তু বেলগাছিয়া পার হইবার কিছু পরেই মোটরের চাকা ফাটিল। শিলংমাঝা বাতায়ই থাকিয়া গেলেন; আমরা বাসে চাপিয়া বিমান ঘাটিতে গেলাম। দিবা বেলা যে আমার বড়াকার চেপেরা আগের উপস্থিত।

আমার সাথে মিনিসপত্র অর্থাৎ ছিল, একটা বড় চামড়ার স্ট্রিকেস ও TWA কোম্পানীর দেওয়া কানডের ব্যাগ মাত্র। ওজন করিয়া ৬৬ পাউন্ড হইল।

৭টা বাজিল। মাটোফ্রান্সে সংবাদ প্রচারিত হইল যে আমাদেও বিমান প্রস্তুত। সন্ধ্যা বিমান ঘাটির প্রস্তুতি পর্যন্ত গেলেন। বলাচীতি বিমান সারিয়া বিমানে চালিলাম।

বিমান উড়িল। Viking জাতীয় বিমান; ২৫২৬টা আসন। কোথাও না বাহিয়া বোম্বাই পর্যন্ত ঘাইবে।

Hobless ৬টার সময় পাবার ছিলেন; সংবাদ-পত্র ছিলেন। বাহ তের হাজার কুট উপর বিরা বিমান উড়িতে লাগিল, প্রপলায়ের গর্জনে কানে ডালা লাগে আর কি! নীচের সব কিছুই অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কোথাও না বা না বা মেঘ উড়িয়া বাইতেছে; কোথাও বা তাহাঙ্গিকে বরফের উঁচু নীচু পাহাড় বলিয়া মনে হইতেছে, আবার কোথাও বা বিমানের উপরে এবং নীচুতে সবাই না বা মেঘের পাহাড়। দিন পরিষ্কার ছিল না; একতরফে প্রায়ই তাল করিয়া ঘেঁষিতে পাই নাট।

মাটোফ্রান্স বিমান সময়ের ১২-২০ মিঃ সময় পৌঁছিলাম। TWA কোম্পানীর কর্মচারীরা সন্ধ্যা ৬টা বাহ্যিক করিলেন। নিউইয়র্ক পর্যন্ত আমার বাহ্যিক বাহ্যিক সব বাহ্যিক তাহা

করিয়েন। বিমান খাটির বেতেরাধা খাইয়া
বিজ্ঞান করিতে লাগিলাম। কিছু পরেই TWA
বিমান আসিল। এটার সমস্ত কাউন্স, বাহা,
পাসপোর্ট বিভাগ শেষ করিয়া নৌনে পাচটার
বিমানে চাপিলাম। এটার উড়িলাম।

বিমানখানা Lockheed Constellation;
এটার ৮৮খানা আসন আছে। শুইবার ব্যবস্থা নাই;
ক্রমোত্তর হটলে হাতল চালিয়েই পৃথক পৃথক
সিটনে বেলিয়া ইতি চেয়ারের মত হয়। তাহাতেই
বসটা শোয়া যায়।

আমাদের বিমান ক্রমেই উপরে উঠিতে লাগিল।
কিছু সময় নীচুতে সমস্ত দেখা যাউতে লাগিল।
তাহার, সবই অস্পষ্ট; শুধু নীল—নীল—নীলাভ।
নীচে থাকিতে অত বড় ভেঁই, উপরে এখন মনে
হটল, বুঝিবা কোন লাভ নীল স্রোত। তাহা
আরও উপরে—১৮,৫০০ ফুট—কিছুটা আর চোখে
পড়ে না। শালা শালা ছোট ছোট মেঘ অত্যন্ত
নীচে দেখা যায়। অসংখ্য সীমান্তীন আকাশ।
আর কিছু উপরে উঠিলেই নাইট এভারেস্ট, তব
করিতে পারিলেন; তাহা আরও উপরে,
ট্রাটোফিয়ার।

হোটেল আসিলেন। বস, অভ্যর্থনা, পাওরান,
পরিবেশন ইত্যাদির তার ওঁচায় উপর। অসংখ্য
লোক। হোটেল যাত্রাই অসংখ্য—শুধু শেষ
দিকের যাত্রার নতুন আর একজন হোটেল কিছু
ব্যতিক্রম ছিলেন।

পূর্বদেব অত গেলেন। তখনও আকাশ বেশ

পরিষ্কার। গাভারের সময় হইল। প্রতি আসনের
পিছনে আসনের চাকরীত মধ্যে টে লুকান থাকে।
টে বাহির করিয়া আসনের পিছনে হোটেল খাটিয়া
ছিলেন। তাহা আরও নানাবিধ খাবার আসিল; চর্বা,
চোন্দ্র, কোফ, পের। বহুলা নর, কাহিনী নর,
চৌক ভাগ খাবার। খুদ করিয়া খাইয়া লইলাম।

আমার সাথে কোন যাত্রী বাকী নাই।
বোম্বাই হইতে ডায়েন হাউ উঠিয়াছিলেন—একজন
মহিলা। একটি ছাত্রের সঙ্গে পুর্বে বস; এ বহু
মাত্র আই. বস. গান করিয়াছেন। পেনসিলভানিয়া
বিদ্যালয়ে Business Administrationএ
এম. এ. পড়িয়েন; পুর্বা চারি বৎসর নাকি
লাগিবে। বোম্বাইয়ে বাবার ব্যবসা আছে;
কোডারমারও অত্রিক ব্যবসা আছে। ছেলেটি বড়
মনমরা। অবশেষে, নিউইয়র্ক পর্যন্ত আসি তাহার
অভিভাবক হইয়া চলিলাম। আমার উপর সে
বড়ই নির্ভরশীল।

শৌদি আরবের বিমান খাটি চাড়াপে
নাযিলাম। বাকি বোধ হয় তখন ২টা—আমি
নিউইয়র্ক পর্যন্ত কলিকাতার সময় রাখিয়াছিলাম।
চাড়াপের সময় বড়ই অসহ্য যোধ হইতে লাগিল
—বহিঃপাশ্চ উপসাগরের কূলে। আমেরিকান
লৈক্যের ছড়াছড়ি; অসংখ্য লোক এবং বিমান
কমই চোখে পড়িল। স্থানা পত্র লিখিয়া
এখানে ডাকে দিলাম। আধবর্টা থাকিয়া আমরা
বিদায় লইলাম।

কমল:

শ্রীশঙ্করের শৃঙ্খলা

[শ্রীশঙ্করদেব লেন]

অষ্টম শ্রেণী, এই শ্রেণীর কবিতার কথা
শ্রীশঙ্কর শ্রীশঙ্কর শ্রীশঙ্কর শ্রীশঙ্কর শ্রীশঙ্কর
সমস্তে কিছুটা বাহা পূর্ব হইতেই অসিগাছে।
এই শ্রেণীতেই বাংলা, ইতিহাস ও ভূগোল
পড়াইবার নির্দেশ পাওয়া গেল।

ছাত্রদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত হইতেই
তাহাদের কথ্যভাষা যে তিস্তিশীল নহে, শ্রীশঙ্কর
তাহা বুঝিতে পারিলেন। কোনরূপ নিয়ম
শৃঙ্খলা বহুনেই তাহারা আবদ্ধ নহে। ইহা বেন
বিভাগের বন্ধ নহে—সমস্তই সর্বদেব একটি

মজলিস। গঠনীয় বিষয় ছাড়া আর সকল প্রকার আলোচনাই ছেদনীয় অবাধগতিতে এখানে চলিয়া থাকে। শিক্ষাবিত্তীয় উপস্থিতি সেখানে মিতাক্ষরিত অব্যাহত ঘটনা। মিনিট কয়েক তাহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাবিত্তী পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা শুরু করিলেন। তাহার পূর্বে তাহাদের প্রেরণকে পালনীয় বিষয়গুলি সহজে গড়ে তুলে রাখিয়া দিলেন। নিম্ন পালনের প্রতিশ্রুতি সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সমবেত কর্তে পাওয়া গেল।

কিন্তু যেখানে গেল তাহারা প্রতিশ্রুতি দিতে যেমন তৎপর, তাহা ভাবিতে তৎপর ততোধিক। শিক্ষাবিত্তী যখন কাছাকাছে কোন প্রশ্ন করিতেছেন, তাহায় নির্দেশ অল্পমাত্রী তৎপরতা তৎপরতার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পাঠ্যালোচনায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দেওয়ার তাহায় কোন অর্থেই বোধগম্য হইতেছে না। কিছুকণ নীরবে নতমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বসিবার সুযোগ পাওয়া যায় আবার সঙ্কোচনীয় নিঃশব্দতায় পার্থক্যবিশিষ্ট হইতে দৃশ্যবিশিষ্ট পর্বত সকলের সঙ্গেই আলাপ জড়িয়া দিতেছে। পর পর প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ক্রমে এবং ইত্যন্ত বধেই প্রশ্ন করা— উত্তর প্রকার পর্যায়েই একই কল পাওয়া গেল। অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়ে তাহাদের অনাগ্রহ এবং অনমনোযোগিতা দায়ণাতীত। প্রশ্নের উত্তর দিতে পাওয়া বা না পাওয়ার মধ্যে কোন সীমাবদ্ধতা টানিয়া তাহারা তাহাদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক বিবেচনা করে। প্রথম ঘটায় এই চরম বিশৃঙ্খল ছাত্রসমষ্টি লইয়াই পাঠ্যালয়ের নিজস্ব চেষ্টা করিয়া বিধার লইতে হইল।

পাঠ্যালয়ের দিক দিয়া নিজস্ব হইলেও ছাত্রদের চারিদিক বিশেষত্ব সহজে খেঁজু দায়ণ। অতীত, তাহাকে একেবারে মূল্যহীন বলা চলে না। বিশেষ করিয়া এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষাবিত্তী গেলেন একটির পর একটি কোণল আবেগ করিয়া

যেখিত্তেছিলেন ছাত্রদের মনে তাহা কিরূপ প্রতিজ্ঞা করে এবং তাহা প্রকাশের ব্যবহারিক রূপই বা কি দৃষ্টি লইয়া প্রকাশ পায়।

নবম শ্রেণী হইতে ইহাদের প্রেরণ প্রকৃতি সম্পূর্ণই ভিন্ন প্রকারের। নিম্নশৃঙ্খলার স্বাক্ষর অল্প তাহারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে মিষ্টকায় তাহা স্বতন্ত্র করাইয়া দেওয়ার কলে দেখা গেল অধিকাংশ ছাত্রই কণকালের অল্প নীরব থাকিয়া তাহাদেরই আবার পূর্বরূপ ধারণ করিল। অবশিষ্টাংশ তাহাদের আলাপনে বহু সময়ের অল্প ছেদ টানিবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করিল না, তাহাদের কর্তব্য অপেক্ষাকৃত নিম্নগামে নামিয়া আসিল যায়। ইহাদের বোধশক্তি কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? অথবা স্বতন্ত্রশক্তির দুর্বলতা এত মারাত্মক যে পূর্বমুহুর্তের কথা পর মুহুর্তে মনে রাখিতে পারে না? শিক্ষাবিত্তী এবার গভীর ভাবে তাহাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি উল্লেখ দিকে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবশ্য পালনীয় বিশেষ করেকটি নিম্ন বোর্ডে লিখিয়া দিলেন। ইহায় যে কোনটির উল্লেখ ব্যতিক্রমও তিনি বরদাস্ত করিবে না, তাহাও দৃঢ়তার সহিত আনাইয়া দিলেন।

চতুর্থ ঘটায় সুপোল পড়াইবার কথা। ইতিমধ্যে বিধায়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় নতুন কোন পড়া সহজে চিহ্না করিবার অবকাশ ঘটে নাই। তা না-ই হোক, যেহেতু প্রকৃতি পাঠের সুযোগ মনেই তিনি এ সময়টিকে গ্রহণ করিলেন। শিক্ষাদানে সাফল্য লাভ করিবার প্রচেষ্টায় এরূপ সময়ক্ষেপ যে সময়ের অপব্যবহার নহে, এ বিষয়ে শিক্ষাবিত্তীর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। দ্বিতীয়ত ছাত্রদের উপর গাভীরের প্রভাব তিনি ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছেন, সুতরাং গভীর মুখেই কক্ষ প্রবেশ করিলেন। ছাত্রদের সভাব্যবহারী দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবার কথা নয়, কিন্তু

এবার তাহাদের মধ্যে অনেক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং অপরাপর ছাত্রীগণকে দাঁড়াইবার পরামর্শ দিতেছে দেখা গেল। এমন কি দুই চারি জন কিছুকণের জন্য কথা বলিতে বন্ধ করিল, অথচ অপরাংশ দ্ব্যাপূর্ব চালাইতে লাগিল। শিক্ষিত্রী কণকালের জন্য ইহা শুদ্ধকৃত করিয়া ছাত্রীদের প্রত্যেক সাধিত্রী দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহদের শান্ত গভীর মুখে সবলমুখলি বদ্যাহানে স্থাপন করার দিকে দৃশ্য দিলেন এবং সেই সর্বপ্রথম অল্পভব করিলেন—সুহ সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গিয়াছে।

এই সুযোগেই পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন; কিন্তু অব্যাহত কথা বন্ধ রাখিতে না পারিলে পাঠ্যমানের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতার পর্যবসিত হইবে। ইউরোপ তাহারা পড়িয়াছে। আজ উত্তর আমেরিকার অবস্থিতি ও চতুঃপীনা পড়া হয়। আলোচনার ক্ষেত্রে ইউরোপ কোন গোলাপে অবস্থিত শিক্ষিত্রী প্রশ্ন করিলেন। পূর্বে না পশ্চিমে? নিরুপ রেখার উত্তরে না দক্ষিণে? উত্তর কাহারও নিকট হইতেই পাওয়া গেল না, কিন্তু কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাম করিতে লাগিল, অতঃ কিছুকণ। শ্রেণীগত অবনোবোগিতার একমাত্র প্রমাণ বিম্বদকর। এই লক্ষ্যের প্রতিক্রিয়াই হয় তো তাহাদের কিছুকণের জন্য চূপ করাইয়া দিয়াছে। লক্ষ্যের অস্বস্তিও এই প্রথম দেখা গেল—ইহা আশার কথা। নীত্রে তাহাদের নীরব থাকার নৈবেদ্য সীমা অতিক্রান্ত হইল বটে কিন্তু এবারকার কথা বেশ কতকটা অনাতিতে চলিতে লাগিল এবং সংক্ষেপেও। অর্থাৎ কথার মধ্যে মধ্যে ছেদ আছে। শিক্ষিত্রী এক মুহূর্ত তাহারা লইয়া মানচিত্র ও কুগোলকের সাহায্যে আমেরিকার অবস্থিতি বুঝাইয়া দিলেন ও বলেন যে যেটি বেশি কথা বলিতেছে, তাহাকেই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ছাত্রীরা লক্ষ্য করিয়াছে, যে কথা বলিবে শিক্ষিত্রী তাহাকেই

প্রশ্ন করিবেন, সুতরাং শ্রেণীকক্ষ নীরবতার আশ্রয় নিস্তব্ধ হইয়া গেল। প্রথমে উত্তর দিবার ভাব-প্রসূত এ নীরবতা শিক্ষিত্রীর মনঃপুত হয় নাই। পাঠ্য বিষয়ে আলোচনার যোগ দিবার ভাবই কি তবু ইহাদের মধ্যে পৃথল্য আশার পথ? এ পৃথল্য এ নীরবতা শিক্ষার পথ সুগম করিবে না শিক্ষিত্রী তাহা আনিতে। তাই পরদিন নূতন পথ অবলম্বনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বহিলেন।

• • • • •

পরদিন প্রথম ঘণ্টা, বাংলা সাহিত্য পড়া হইবে। পূর্বদিনের সচিবতার উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষিত্রী দ্বিগ্ন করিয়াছিলেন গাভীরের আশ্রয়ে নয়, আত্মরিকতার উদ্ভূতির দ্বারা পৃথল্য আশার দ্বিগ্ন কি না তাহাই তিনি আজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বস্তুত তাহাদের প্রেহ দিয়া আশ্রুত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাদের কাছে একমাত্র ভীতি সত্যক মুহূর্তে উপস্থিত হওয়ার দুর্ভোগ তাঁহাকে কাঁটার মত বিধিতেছিল। সুতরাং সহজ স্বাভাবিক শান্ত মুখেই শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কল বিপরীত হইল। পূর্বদিনের শেষের ঘণ্টার মনোযোগ না হোক—যে নীরবতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহার কিছুমাত্র আভাশও আশ্রিত্য ব্যবহারে পাওয়া গেল না। গতকালের প্রথম ঘণ্টার মতই তাহারা অধায়ে নিঃশব্দ চিত্তে গম্ব করিয়া চলিল।

শিক্ষিত্রী বুঝিলেন এইরূপ বিশৃঙ্খল মনোভূতির বিপুলমাত্র প্রকাশও দেখা চলিবে না। চকিতে তাঁহার কোন সুবিখ্যাত অধ্যাপকের শ্রেণী পরিচালনার পটভূমি মনে পড়িল। তিনি আশ্রিত মনে সেই পন্থাই গ্রহণ করিলেন। নাম যেরেটারি করিবার সময় প্রথম যেরেটির নাম তাকিয়াই তাঁহাকে পুস্তকের পাঠ্য অংশ হইতে কয়েক পংক্তি স্পষ্টভাবে পড়িতে ও অপরাপর সকলকে নিজেদের বই খুলিয়া লইয়া উহা মন দিয়া শুনিতে আবেশ করিলেন। কিছুটা পড়া হইবার পর দ্বিতীয়

নাম ভাষিকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁটাকে পরমর্থা পংক্তি হইতে পড়িতে বলিলেন। এই ভাবে নাম ভাষার কাক কাক সর্ব পাঠ ও সেই সঙ্গে সমার্থ ভাষার প্রকৃতির আলোচনা চলাইবার সময় প্রথম কিছুক্ষণ দেখা গেল একের পাঠ কোন পংক্তিতে শেষ হইয়াছে অথবা কোন শব্দে আলোচনা করা হইতেছে, সে সময়ে উদ্ভিষ্ট বালিকা, তাহার পার্শ্ববর্তিনী এবং সঙ্গবর্তিনী সকলেই সমান অজ্ঞ ও অমনোযোগী। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হটতেই এ ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। শ্রোণীককে প্রশ্ন ও উত্তর ছাড়া তখন আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। সকলেই হয় পূর্বের দিকে নয় শিক্ষয়িত্রীর দিকে নিবিষ্ট চক্ষু।

শিক্ষয়িত্রী যেন আশার আলো দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন অবিস্তৃত কথা বলা এবং নিয়ম না মানা ইত্যাদির এমন সম্মিলিত বড়াবে পরিণত হইয়াছে যে শুধু প্রেরণা দিয়া লাফলা লাঠ করা সম্ভব হইবে না। মূল্য্য তত্ত্ব করার এবং অন্তর্যমী হইবার সকল পথ বাহাতে বন্ধ থাকে, সেই ভাবেই প্রতিটি বৃহত্তর কাজ দিয়া গরিয়া রাখিতে হইবে।

পূর্বোক্ত পদ্য অবলম্বন করার ফলে নাম বেজেটাবির কাজ পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটায় শেষ পর্যন্ত দিগা পৌছিল বটে, কিন্তু আজিকার পাঠদান সম্পূর্ণ নিফল হয় নাট, শিক্ষয়িত্রীর মনে এ গাফনাটুকু থাকিল।

পঞ্চম ঘটায় ইতিহাস। শিক্ষয়িত্রী এংর শ্রোণীটিকে সমগ্র ভাবে কতকটা বুঝিয়া লইয়াছেন। স্তম্ভরাং কক্ষ প্রবেশ করিয়াই তাড়াতের বাক্যলিপির কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া পূর্বপাঠের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখিতে আদেশ দিলেন এবং শ্রোণীর কাছের অস্ত্র নবর দেওয়া হইবে তাহাও জানাইয়া দিলেন। সবাইকে একই সঙ্গে কাছে দ্যানুত্ত রাখার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। ছাত্রীদের মনে

নবরের প্রভাস খবর যে বেশী তাড়াতের ক্রমান পাওয়া গেল। তাড়াতা নিবিষ্ট চিত্ত লিপিতে হস্ত করিয়াছে।

কয়েক মিনিট নিবিষ্টমনা হইয়া থাকিবার সুযোগ দিয়া তাঁহার পরিকল্পিত পদ্য কার্যকরী হয় কি না শিক্ষয়িত্রী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বসন্ত করিলেন। নিশ্চয়ল মনকে যে কোন বিষয়ে একবার একাগ্র করিতে পারিলে সেই একাগ্রতা স্বেকোলনে নিবদ্যন্তরেও নিবদ্য করা যাইতে পারিবে তিনি এই আশাই মনে পোষণ করিতেছিলেন। শুধু বংশের বৃত্তান্ত তাহারের লিখিতে বলা চটতালিল। যেরূপা ইতিপূর্বে সমুদ্রগুপ্ত পড়িয়াছিল স্তম্ভরাং সকলে তাঁহার কথাট লিখিতেছে। শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক দাবিতে শু- একজনকে তাহারের লিপিত অংশ হটতে লিখিয়া পড়িয়া শুনাটতে বলিলেন। একজন বধন পড়িয়া শুনাটতে লাগিল, অপর সকলে তখন উৎকর্ষ হটয়া তাহা শুনিবার ভঙ্গ উন্নয়ন হটয়া উঠিল। কারণ তাহারের বাহা মনে নাট, এট সুযোগে তাহা শুনিয়া লইয়া তাহারে ভাল করিয়া লিখিতে পারিবে এবং বেশি নবর পাঠবে এট প্রেরণাই তাহারের মনকে আবৃত্ত করিয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী ইহাই চাহিতেছিলেন। কেহ কেহ সমুদ্রগুপ্তকে শুধু বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা কেন? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে কি শ্রেষ্ঠ রাজা বলা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সমুদ্রগুপ্তের শ্রেষ্ঠ প্রতাপের কথা আরম্ভ করিয়া তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিল। কিন্তু অবশিষ্ট সকলেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা জানিতে চাহিল। বলিল—তাঁহার কথা তো আমরা কিছুই জানি না, কি করিয়া বুঝিব কে শ্রেষ্ঠ রাজা? শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক দাবির বেধেধের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সকলেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিষয় জানিবার মন্ত আগ্রহাবিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বুঝিতে তাঁহার মন গরিয়া

গেল। তিনি দ্বিতীয় চক্রান্তের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিয়া গেলেন এবং উভয়ের মধ্যে কাহাকে স্রেষ্ঠ রাজা বলা যায় এ সম্বন্ধে তাহাদের অভিযুক্ত জানিতে চাহিলেন।

অতাবনীৰ হৃদয় পাওয়া গেল। কিন্তু এখনও
নিশ্চিন্ত হওবা চলে না। সচেতন মন ও সত্যক
বুজি লইয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে এ নদিকটন। নত্যা
নত্যাই বেছা-অনোদিত স্বাদী পুখলা আনিতে পাৰে
কি না।

পর দিন প্রথম ঘটাব বাংলা সাহিত্য।
 দিকদ্বিগ্নী ককে প্রবেশ করিয়া আর একটি বিশেষ
 পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন—প্রত্যেকেই উদ্ভিন্ন
 ঝাড়োঠোঠো। কিন্তু তবু সমস্তকে না করিয়া
 সেদিনকার পঠনীয় বিদ্য মেয়েদের জানাইয়া
 দিলেন—কৈশোরের পল্লী। ছাত্রীদের নীরবে নিশ্চিহ্ন
 অংশ পড়িবার নির্দেশ দিয়া নাম হেঁচকোঁচকি
 শুরু করিলেন। পুস্তকের অবলম্বিত পৃষ্ঠাভূমিতে
 সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যোপকরণ আলোচনা চলিতে
 লাগিল। একটি ঘানা বালিকা বহুদললার
 বসিয়া লতার সাহায্যে বাংলা গাঁথিতেছে। ছ-
 চারিটি ছল কলচাত চট্টা ভূমি স্পর্শ করিবার
 আগে মহাপথে তাহার উদ্ভব শুক চলে
 আটকাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কোণ কাড়
 লতাগুল্মের ঘন সঙ্কেতের সমাবেশ। তাহার সাহায্যে
 বর্ণিত হটলেও ইহা কি একটা ছবির মত চোখে
 তালে না? মেয়েদের চোখে আনন্দের বিলিফ
 খেলিয়া গেল। কেহ কেহ সোৎসাহে জানাইল,
 ছবির মতই তাহার ইহা দেখিতে পাইতেছে।
 এখন ছবি তাহার বাস্তবেও দেখিগাছে।

আলোচনা। মায়লীল ডব্বিয়ার কলনাবিনী
অবস্থানীয় যত বহিরা চলিল। আশ্চর্য চবির
প্রভাব ও সাহিত্যগ্রন্থের আবেশন। ছাত্রীরা এমন
উন্মুখ হইয়া উঠিল, নিজেদের সৌন্দর্য্যের অল্পকৃতি
প্রকাশের জন্য এমন প্রতীক্ষমান হইয়া বহিল—
যাহা শিকড়িত্রীয়া আশ্রয় কলনাকও অনেক দূর
ছাত্রীরা নিরাছে। পাতার পাতার লেখক অপূর্ণ
কুশলতার অনেকগুলি মনোহর ছবি আঁকিয়াছেন।
বালিকারা বর্ণমালা পরিবেষ্টিত সৌন্দর্য্য তাগারে
দুগার খুলিবার চাবিকাঠি যেন আজ প্রথম হাতে
পাইরাছে তাই আশ্রয়নের আনন্দ উপচাইয়া
পড়িতেছে।

ନିକ୍ଷେପିତ ଆଦେଶ ଆଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା

শিখা পৌড়িযাছে । তিনি ছাত্রীদেব প্রকৃতি এবার
 দর্পনে প্রতিবিম্বিত চিত্রের মতই মুগ্ধই দেখিতে
 পাইতেছেন । পাঠ্য বিষয়ে অমনোযোগিতা
 তাহাদের স্বভাবগত । শ্রেনীকক্ষে নৃখলা বিপর্যত
 করার যে প্রকৃতিকে আর তাহাদের মজাগত
 বলিয়াই মনে হয়, তাহাও তো অবহেলায়
 সুযোগেই একদিন আত্মপ্রকাশ করিতে
 পারিয়াছিল এবং সেই পথ ধরিয়াই প্রকৃতিতে
 দামা দাবিয়া আর ছাত্রাবোধ্য ব্যাধিতে পরিণত
 হইয়াছে । এ স্বভাবের পরিবর্তন আনিতে
 হইলে ইহাদের প্রতি মূর্ত্তে কালে বাপ্ত রাবিত্তে
 হইবে এবং পাঠ্য বিষয়ের আলোচনার দূত্রে অকৃত
 প্রথম কিছুদিন প্রচুর কথা বলার সুযোগ দিয়া
 ক্রমশ তাহা কমাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে
 হইবে । আর অমনোযোগিতা দূর করিবার জন্য
 প্রয়োজন ইহাদের প্রকৃতি অনুগামী দ্বারার পাঠের
 পরিচালনা । সাহিত্যে ইহাদের रुচি আছে এবং
 সাহিত্যের রস অপেক্ষা রূপের প্রভাব ইহাদের মনে
 বেশী । এই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে শ্রেনীকক্ষে
 নৃখলা বন্ধার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের আলোচনাও
 যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা
 চলে ।

শিকড়িছৌর মিডান্স কেনিচুল, তাহা মণ্ডাহ কান
মধোই প্রমাণিত হইল। কৃত্রিম পাক্তীর্থেব শোষাক
পরিষা ছাত্রীহের মন্দ্রবীন হওয়ার কুর্ভোগ আয়
বেশিদিন তাঁহাকে জুগিতে হইল না। দিনের
পর দিন মার্ককতার আনন্দে সাহিত্যের পল্লব
হইতে পুষ্প পল্লব কুলিগা কুলিগা তিনি বিস্তরণ
করিতেন, ছাত্রীরা কুণ্ডিতা মুখে দ্বহান্ত পাতিয়া
ঐহম করিত—উপলব্ধি করিত।

সাহিত্যের বাধ্যতায় কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য মানসিক ডিগ্রিও প্রাপ্ত হইয়া নুখলা স্থানান্তরিত হইয়া গেল। সুতরাং ইতিহাস কুপোলের পাঠনা আকর্ষণীয় কাহিনী তুলিতে আর বেশি বেশি পারিতোষিত হইল না। সঙ্গে এবং চিত্রে বালক বালিকাগণের যে সাধারণ অসুস্থতা, তাহার সহায়তার বিষয় দুটিকে আনন্দদায়ক করিয়া তোলায় পথ ভ্রম হই দিল। মধ্যাহ্ন শেষে দেখা গেল অত্যন্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের নিকট যে অটম প্রেরণা পাঠদান সর্বাঙ্গব্যাপী বিবর্তিত হইয়া বসিয়া প্রতীক্ষমান হইয়া থাকে, ইহার নিকট তাহা সম্পূর্ণ চিত্রবৃত্তি লইয়া আশ্চর্যজনক বর্ণিত হইল।

শিক্ষা

এ হি কল্যাণকর कन्तिह् दुर्गतिं तात गच्छति

১০ম বর্ষ

মাঘ ১৩৫৮

৩য় সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের অতিক্রমণ

আমরা গত মাসের শিক্ষার বলিমাছিসান কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ডের উন্নয়ন অনিবেশনের বিবেচনাবাদী উৎসুক আগ্রহে চাটিয়া আছি। সম্প্রতি দিল্লীতে সেই অনিবেশন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের অতিক্রমণে স্বকল্পপূর্ণ অনেক কথা-বলা হইয়াছে। মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন যে আগামী পাঁচ বৎসরে শিক্ষাবোর্ডের প্রধান লক্ষ্য হইবে উন্নয়ন, ডায়ালগ ও নতুন মাহুদ গড়িয়া তোলা—যে মাহুদ সাহসে, মতভাব, দৃষ্টিভঙ্গির সহজতা, প্রাণবন্তির প্রচুর ও তত্ত্ববুদ্ধির বলে নতুন এক ভারত গড়িয়া তুলিবে।

তিনি বলেন, জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন দেশের জনশক্তি ও জনশক্তি সংগঠনের মস্ত শির বাণিজ্য কবি কলকারখানা ইত্যাদির সম্প্রদায়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা গ্রন্থসমীক্ষ, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা না থাকিলে জাতীয় উন্নতি-মূলক কোন পরিকল্পনাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারেনা। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি পর্বাঞ্চে প্রয়োজন। মৌলানা

আজাদ তাই বলিয়াছেন যে ডায়ালগবাক্যে শীঘ্রই একটি ধার্মিক শিক্ষা কমিশন গঠন করিবেন। এই কমিশনে ডায়ালগ বিশেষজ্ঞরা থাকিবেন, বিশেষ হইতেও বিশেষজ্ঞ নেক কেহ আসিবেন। ইহারা প্রচলিত ধার্মিক শিক্ষার অমরা পর্বাঞ্চে আলোচনা করিবেন এবং এটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবে বর্তমান যুগ ও জীবনের উন্নয়নগামী পথে চালিতা সাজা বাব তাহার মস্ত সরকারকে সাহায্য করিবেন।

তাঁহার মতে বর্তমানে প্রচলিত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশী মানন আমলে তাঁহাদের কাছের সুবিচার অস্ত্রই-বচিত হইয়াছিল, কাছেরই আমাদের কল্যাণের কথা সে ব্যবস্থায় চিন্তা করা হয় নাই। সেসকল কলিতবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কারিগরী বিজ্ঞান ও উৎপাদনমূলক শিক্ষা অপেক্ষা কলা-সংস্কৃতির চর্চাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাই যত বুদ্ধিজীবির সৃষ্টি হইয়াছিল তত বুদ্ধিজীবির সৃষ্টি হয় নাট, আর তাঁহারই ফলে আজ দেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশি। আজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের

অল্প ব্যাপকভাবে কাচিগলী ও কুঠিফুলক শিকার প্রদর্শন করিতে হইবে। দেশবাসী বাহাতে মিথিচারে কেতাবী শিকার অল্প বাগ না হয় সেদিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর দেশের উন্নতির অল্প চাই স্থানীয় শিকার।

শিশুদের আশ্রয়ক

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান বাহ্যাবিদ্যুতঃ আমের সন্ততি যুক্তরাষ্ট্রে হইতে কিরিচাছেন। তিনি মাস বাপী সফরে লঙ্ক অভিজ্ঞতার কথা তিনি রোটারি ক্লাবের এক সভায় বর্ণনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রে লোকেরা কেন পড় পড়তা আমাদের অনেক বেশি দিন বাচিবার প্রত্যাশা করে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি দেখিরাছেন যে, দেশের বাহ্যাবিদ্যুতঃ শিকার তাহারে প্রতি প্রথম দৃষ্টি। অল্প সব বিভাগের আগে বাহ্যাবিদ্যুতঃ বিভাগের দায়ী। এই বিভাগের কাজ সনাতনের সকল স্তরে। সহরে গ্রামে পানীয় এবং অল্প জলের প্রচুর সরবরাহ, মলমূত্র ত্যাগ ও তাহা নিষ্কাশনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা, প্রকৃতি ও নদজাত শিশুর বাহ্য পরীক্ষা ও তাহারে অত্যন্ত পূরণ, খাদ্যবোর উৎকর্ষ পরীক্ষা ও ভেজাল নিবারণ, সংক্রামক ও জাতীয় কলকারক ব্যাবিগলির প্রতিবোধের চেষ্টা করা—এগুলি তাহারে জাতীয় কর্তব্যের যথো দায়ীরা গিয়াছে। বিভাগের তত্ত্বি করিবার আগেই শিশুর শিকামাতা বা অভিভাবক জানেন যে শিশুকে ডাক্তার দেখাইয়া বাহ্য পরীক্ষা করাইতে ও দরকার হইলে সংক্রামক রোগের প্রতিবেদক টীকা ইত্যাদি দেওয়াইতে হইবে। শিশু বেই বিভাগের তত্ত্বি হইতে আনিবে তখনই বিভাগের বিশেষজ্ঞ নাসের কাছে তাহাকে পরীক্ষার অল্প পাঠান হইবে এবং যতদিন বিভাগের থাকিবে নিরূপিত সনয়ে তাহার বাহ্য বিদ্যে বাবতীয় বিবরণ বাগ থাকে দেওয়া হইবে। বাগবার

সামর্থ্য না থাকিলে বিভাগই চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।

শিশুরা কি পড়ে কি পেখে তাহা যেমন বিভাগের দায়িত্ব, তাহারি কি বাগ, কি বকম থাকিতে থাকে, কি আবহাওয়ায় দিন বাগন করে তাহারও দায়িত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের। বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র যদি আমরা শিশুদের শিকার ব্যবস্থা করিতে পারি ও শিকাকালে তাহারে বাহ্যের দিকে নজর রাখি তবে যে আমরা সুস্থবেহ নাগরিক গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ কি? তখন তাহারি এই আলো-হাওয়া-বিকির, ভেজাল থাকে মাছের হওয়া, দুর্বল শরীরমন, বর্তমান ভারতবাসীদের অসৌখ্য দূর করিরা অতীতের ভারতবর্ষকে আবার খুঁজিয়া পাইবে।

পল্লী অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন

বিগত ১৬ই মার্চ দিল্লীর প্রধান স্বাস্থ্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ষিক অধিবেশনের অধিষ্ঠান হয়। সভাপতি শ্রীমঙ্গলজীবন রাম আর্থ সমাজের অবদানের কথা উল্লেখ করিরা বলেন যে, আর্থ সমাজ একদিন আমাদের সমাজের সংস্কার সাধনে প্রচুর সাহায্য করিরাছে। আজ যুগের পরির্তন হইরাছে, এই পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে এখন নূতন প্রাণ সঞ্চার করা দরকার। ইহার অল্প চাই নূতন পরিকল্পনা। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যকার বিরাট ব্যবধানের প্রাচীর আজ ডাকিতে হইবে। ইহার অল্প চাই শিকার বিভাগ। প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত নূতন জীবনযাত্রার সমন্বয় সাধন করিরা শিকাকে আজ ভারতের পল্লী অঞ্চলে ছড়াইয়া দিতে হইবে। পল্লীতে শিকার বিভাগ ব্যতীত জনসাধারণের উন্নতির কল্পনা নিরর্থক।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মার্লীসংঘ

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় মার্লী সমিতি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মার্লী সংঘের তিনজন

সমস্রকে ১৯৪২-৪৩ সালের মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহাদের মধ্যে আছেন দিল্লীর ডাঃ মিসেস গণপতি, ও মিস মি, নাথারন এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস জোন্স। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীদের মধ্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নারী সংঘে চেষ্টা করিতেছে।

মহাভূতি ও সহযোগিতা। এই দুইটি আশঙ্কিত মনে একান্ত আবশ্যিক। যেনে যেনে আতিথে আতিথে যে শাস্ত মানবতার সূত্র বিবাহিত আছে, তাহাকে খুঁজিয়া পাইলে মনস্তত্ত্বের কল্যাণ ও ত্যাগ হইলেই এই সব সংঘের সার্থকতা।

পারলোকগত শ্রীমতী নন্দী

কালিম্বাঙ্গার মহারাণী শ্রীমতী নন্দী একালে পারলোক গমন করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার পিতা স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ নন্দীর মত তাঁহারও দানের পরিমাণ কম ছিল না। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, অতীত বহু ছাত্র তাহার প্রদত্ত সাহায্যে লেখাপড়া করিয়া মাস্তুল হইয়াছে। সময় সময় এমন গোপনে তিনি দান করিয়াছেন, যে তাহারা জানিতেও পারে নাই কে তাহাদের সাহায্য করিতেছে। অসামান্য ব্যবহার, সৌম্য বোধ, মহাভূতবতা, যাজ্ঞিক কঠি, প্রথম কর্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি নানা গুণে তিনি সকলের পিতৃ ছিলেন। আমরা তাহার মৃত্যুতে পরিজনগণের প্রতি শ্রদ্ধা সমবেদনা জানাই।

পারলোকে শিক্ষাত্রুতী

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক এম. ডি. পুনটাবেকারের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছি। ইনি বহুদিন কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। ইনি নাগপুর হইতে মৃত্যু

বাণেশ্বর পথে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের আক্রান্ত হইয়া ট্রেনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু সমস্র

অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ ও মিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকমলেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাই।

নারী শিক্ষা পরিষদের বক্তৃতা-অনুষ্ঠান

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা পরিষদের 'বক্তৃতা-অনুষ্ঠান' উপলক্ষে মাননীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি সোমলে মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে ইহার যথাযথ আয়োজন আয়োজন করেন, মিসেস মুখার্জি পুরস্কার বিতরণ ও শ্রীমতী নন্দী বাবোদ্যোতন করেন। সভানেত্র্য করেন মণীন্দ্রনাথ বসু। মাননীয় মহারাণী হটাক দেবী, এই পরিষদের সর্বপ্রথম সভানেত্রীও তিনি। অতঃপর পরিষদের পটিন বন্দ্যোপাধ্যায় কার্ণ বিবরণী এবং তাহার শ্রীমামণ্ড ও চাকুরিয়া কেন্দ্রে ব্যক্তি নারীদের শিক্ষা কেন্দ্রের বিবরণ পঠিত হয়। শ্রীমতী নন্দীতিবালা গুপ্তা "আতিথে ডায়েরী মহিলা কর্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাহার পর "মণ্ডলেন সমাপন" এবং স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথের ব্যবস্থা ছিল।

অধিবেশনের অন্তিম দিন "বক্তৃতা নারী-শিক্ষার প্রয়োজন", "আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলের বিবরণ" প্রভৃতির বিষয় আলোচনা হয়। শেষদিন বিভিন্ন স্কুলের সহযোগিতায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। বিভিন্ন স্কুল হইতে প্রেরিত ছাত্রীদের দ্বারা শিল্পের প্রদর্শনী কয়েকদিনই খোলা থাকে।

মিসেস কলকাতাকে উপাসি দান

বিস্তৃত ১৮ই মার্চ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবেশে উৎসবে মিসেস কলকাতাকে 'ডক্টর অফ ল' এই উপাধি দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে। উপাধি প্রদানের সময় তাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাপ্রদান বলেন যে, বিভিন্ন

জাতির মধ্যে সম্পর্কে সহজ ও সুন্দর করিবার উদ্দেশ্যে মিসেস রুজভেন্ট যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয়।

বিস্তৃত ২২শে মার্চ বিব্রভারতীও অল্পকাল একটি অল্পকাল করিয়া মিসেস রুজভেন্টকে 'ভাই অক মিটারেচার' বা 'দেখিকোত্তমা' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। বিব্রভারতীর

আমন্ত্রণপত্রে দেখিতেছি, তাঁহাদের বিদ্যান মিসেস রুজভেন্ট দ্বর্বল ও নিপীড়িত দেশ ও জাতিগুলির যত্ন। পয়সারের মধ্যে শান্তি এবং বৈদ্য স্থাপনের প্রয়াসেই তাঁহারা এই সফর।

শ্রীমতী রুজভেন্ট বিব্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছুকাল বয়োরা তাহে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

—

পাঠাগার ও বাংলা পড়ানো

শ্রীমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য

দৈনিক কথাপ্রসঙ্গে এক অধ্যাপক বন্ধুর আক্ষেপোক্তি জানে এল—“প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে শরৎবাবুর ‘অভাগীর বর্ণ’ পড়িবার সময় শরৎবাবুর সম্বন্ধে ছেলেদের জানের বহর দেখার জন্য প্রশ্ন করলাম—‘তোমরা শরৎচন্দ্রের আর কোন কোন ছোট গল্প পড়েছ?’ ছাত্র-সমূহের মধ্যে হু’ একটি মোটে হাত উঠল—তাও ‘মেজদিদি’তেই পাও। সাহিত্যে কী নারসিংকর বৈশিষ্ট্য?”—তখন দুঃখে অভিভূত হইনি মোটেই, বরং আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, তাগো ছেলেরা অন্য কোন লেখকের গল্প শরৎবাবুর নামে চালায় নি। বিভ্রালয়ে হামেশাই এই রকম ঘটে থাকে।

মাতৃভাষা ও সাহিত্যে আমাদের ছাত্রদের এই বৈশিষ্ট্য বর্ধাঙ্কিত, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, তবে স্বীকার করে নিতে হলেও আক্ষেপের কারণ থেকে যায়। বর্ণাঙ্কিত, ব্যাকরণগত সমগ্রমাণ, উচ্চারণ-অভি ইত্যাদি নানান তুলের মাঝেই আমাদের নিতা পরিচর শ্রেণীককে হয়ে থাকে; কাছেই লেখানে সাহিত্যের খুঁটিনাটিতে ছেলেদের মাজেহাল হতে দেখলে চমকে উঠি না; তবে

নিজেরের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি সমস্ত অন্তর দিবে।

সজাগ হতে হবে মাতৃভাষা-শিক্ষককে, কারণ অন্তরের চেয়ে দাবিত্ত তাঁরই বেশি, মাতৃভাষার ক্রটি-পূর্ণ শিক্ষা মনে আনে জড়তা, চিন্তাশক্তিতে আনে বিন্দুখলা, তাই শৈশব হতেই বাংলা মাতৃভাষা-ও-সাহিত্যের হাতে পেল না বহুক্ষণ আনামোনার সুযোগ, তাই আর বাই হোক, মাহুস হতে পারল না, এ কথা কোর গলায় ঘোষণা করতে কুষ্ঠা নেই। আর এই অমাহুসের দল যতই মলে ভারী হতে থাকে, জাতীয় বোধ ও বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য ততই দুর্বল হয়ে চলে কসতে থাকে। আমাদের দেশে এর দৃষ্টান্ত সহজলভ্য, উপরোক্ত আলোচনার স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মাতৃভাষা-শিক্ষক শুধু শিক্ষকতার উপযোগী করেকটি সাধারণ গুণ থাকলেই হওয়া যায় না। তাঃ জরুরে বলেন—“১০০জন বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত ও মাতৃভাষা-বিশেষজ্ঞের মধ্যে এমন দশজনও পাওয়া যাবে না, যাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সুযোগ্য শিক্ষকে পরিণত করা যায়। শুধু বিষয়ের উপর দখল আর শ্রেণী-পুথলা বিধানের চাবিকাঠি হাতে থাকলেই মাতৃ-

ভাষা-ও-সাহিত্যের রূপ-রসলোকে প্রবেশের অধিকার
যেলে না—তার অন্তর্গত চাই সংবেদনশীল রসজ্ঞান, মন,
মস্তিষ্ক চিন্তাশীলতা, আর চাই ছাত্রদের মনে রসের
ধারা বইতে দেবার মত শিক্ষাদান-নৈপুণ্য।

কোনো ছাত্রই একটা পরিমিত রস-সংবেদনা
নিজে বিভাগ করে আনে—এই রূপ রস-চৈতন্যের
উদ্বোধন ঘটানোই প্রাচীন যাত্ৰা-শিক্ষকের প্রধান
কর্তব্য। নিজে সাহিত্যরসিক না হলে, অপরের
অন্তরে রস-স্পর্শ জাগানো কেমন করে সম্ভব হবে?
যদি অন্তর স্বাভাবিক ভাবেই ‘তরুণ কাঠ’ তাঁর
পক্ষে সাহিত্যের রসাহিত্য অন্বেষণ কোমল হইবে
সম্ভব নয়। আমাদের দেশে অনিকাংশ বিভাগেরই
যাত্ৰা-পাঠ্যের তার এমন শিক্ষকের গুণের ব্যাপ্তি
ধরা। ব্যাকরণ-ধর্মী নিয়মভিত্তিক অধ্যাপনাত্মক
অভ্যাস। পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যভাগগুলির পাঠ,
অর্থনির্ণয়, ব্যাকরণগত রূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং
সাধারণ প্রশ্ন—এই সীমাবদ্ধ গতি ছাড়িয়ে এক পা
যেতে এঁরা না পারেন। বৈচিত্র্যহীন একধারে এই
নীচ অন্বেষণ ছাত্রদের মনে আনে পাঠ্যের প্রতি
মস্তিষ্ক বিদ্বেষ ও বিমূর্তি—কিছু নতুনত্বের অন্তর্গত
বুদ্ধির উদ্বোধন আভিভূত করে ওঠে, কিন্তু উত্তর মস্তিষ্ক
রসের অন্তর্গত এ কাণ্ডালপনা সার্থক হতে পারে কই?

কাজেই দেখা যাক, ছাত্রদের ভাষা ও সাহিত্যে
বৈচিত্র্যের অন্তর্গত প্রাচীন-পাঠ্যের বৈচিত্র্যহীনতা বিশেষ
করে ধরা। তাহা এক সাহিত্য ছাত্রদের জ্ঞানের
প্রসারতা আনতে হলে (পূর্বোক্ত পরিকল্পনা)
পাঠ্যগারে মননমূলক কর্মপর্যা অঙ্গসংগণ করতে হবে।

পাঠ্যগার বলতে আমরা বিভাগের সাধারণ
পাঠ্যগার এবং বিভিন্ন প্রাচীন অন্তর্গত নির্দিষ্ট পৃথক
পৃথক পাঠ্যগারকেই বুঝি। সাধারণ পাঠ্যগারে
শিক্ষকগণের জ্ঞান-জ্ঞানীয় সমৃদ্ধ করে ভোলায়
ব্যবস্থা থাকে। আদর্শ শিক্ষকের গুণগণা ব্যাখ্যা
করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বলেছেন—
‘আদর্শ শিক্ষকে সর্বদা পাঠ্য হতে হবে, তিনি

কোন অবস্থাতেই নিজের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন
না।’ হুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে—আমাদের
অধিকাংশ শিক্ষকের এই ছাত্র-মূলক জ্ঞানার্জনমূল্যের
অভাব দেখা দিচ্ছে—সে যে কোন কারণেই হোক।
সাম্প্রতিক সাহিত্য, বিভিন্ন সাহিত্যিক পত্রিকা,
আন্তর্জাতিক সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষকের
বিশিষ্ট সংযোগ না থাকলে চলে না; এককালে
বিভাগগার, বংকিম, নবীন, মদুসূদন দত্তের জানা
থাকলেই চলত, কিন্তু আজ যখন যুগ-বিতাপে
সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নির্ণীত হয়ে গেছে, যখন
পাঠ্যপুস্তকে বিবৃতিভূষণ, তাত্ত্বিক, কৈশোরনাথ
স্বপ্নাশাধার ইত্যাদির সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকে
স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, তখন বহু জ্ঞান নিয়ে
সাহিত্যের হাতে মাথা গলাতে বাওয়া বিড়ম্বনাই
হয়ে ওঠে।

নবম বা দশম শ্রেণীতে সাহিত্য পড়ানোর সময়
সত্যকার সাহিত্যিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে
পড়ানো উপযুক্ত হইবে উন্নত ফল প্রাপ্তি হয় না।
মাইকেলের ‘আত্ম-বিলাপ’ পড়ানোর সময় কবিতার
অন্তর্নিহিত ট্র্যাগিক মূহুর্ত, কবির বার্ষিক জীবনের কলম
পটভূমিকা এবং দেশকালের পরিপ্রেক্ষায় ইহার
তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করলে চলে না। বিভাগীয়
আলোচনা সম্ভব না হলে ছাত্রদের কয়েকটি সংকেত
দেওয়া চলে, যার গুণের তিস্তি করে তারা পাঠ্যগারে
ব্যক্তিগত পড়ানোর সাহায্যে নিজ নিজ জ্ঞানকে
প্রতিষ্ঠা দিতে পারে।

তবে পাঠ্য-সম্প্রদায় বিদ্যমান নয়, পাঠ্য-বহির্ভূত
বিষয়েও পড়ানো করে যাতে ছাত্রেরা সাহিত্যিক
রসবোধ ও রুচি গড়ে তুলতে পারে, তার অন্তর্গত চাই
পাঠ্যগারে পড়ানো। শিক্ষক যখন এই পাঠ পর্ক-
বেশের তার নেবেন। ছাত্রদের বয়স, গ্রহণ ও
ধারণ ক্ষমতা এবং রুচিপ্রকৃতি অনুযায়ী গুণগণসংগত
পুস্তকগুলিকে ভাগ করে প্রত্যেক শ্রেণীতে একটি
করে পাঠ্যগার গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ প্রথম

যাঁটার মাতৃভাষা-শিক্ষকের কাছেই যথেষ্ট পাঠাগারে পাঠ পৰ্যবেক্ষণ, ছাত্রেরা নিজ নিজ নির্বাচিত পুস্তক নিয়ে নীরবে পড়বে। তারপর যেখানে যেখানে অবসরোপযোগী অটলিত্য দেখা দেবে, সেই সেই স্থলে শিক্ষকের সহায়তায় সেই অসুবিধা দূর করবে। প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা থাকবে, ছাত্রদের পড়ার পর শিক্ষক প্রায় সাহায্যে তাদের উপলব্ধি পরিমাপ করবেন। তারপর পঠিত পুস্তক সম্বন্ধে ছাত্রদের ব্যক্তিগত মতামত লিখে জানাতে বলা হবে। এতে ছাত্রদের সমালোচনা শক্তি বাড়ে। অনেক সময় কুল পুস্তক নির্বাচনের ফলে ছাত্রদের সাহিত্যোচ্চারণ ভিন্নিত হয়ে পড়ে, অনেক সময় বা বিপণে চালিত হয়। মাতৃভাষা-শিক্ষকে সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানবিস্তার হতে হবে।

ছাত্রের বিষয়, আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শ্রেণী পাঠাগার বলে কিছু নেই। যেখানে আছে, সেখানেও শিক্ষকের অনাগ্রহের ফলে তার ব্যবহার নেই; বহুক্ষেত্রে শুধু বসন্ত রোগাক্রান্ত ও বোচন সিরিষের আধিক্য চোখে পড়েছে। ছাত্রদের পাঠ পৰ্যবেক্ষণ তো দূরের কথা, এই বইটি 'পড়া উচিত' এ কথাও কারও কাছে থেকে ছাত্ররা শুনতে পাবে না আদিকাল। বাড়ীতে বই নিয়ে বাবার স্নেহের অনেক বিদ্যালয়ে ছিল, কিন্তু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এরা বই হারিয়ে বাবার দরশন তাও বন্ধ হয়ে যায়, পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্যজ্ঞান পরীক্ষা তাই সেখানে নিয়মিত হয়ে ওঠে না। সেখানে পাঠ্য-বহির্ভূত পুস্তকের জ্ঞান

পরিমাপের প্রায় না তোলাই ভাল; ছাত্রদের মধ্যে সিনেমা ইত্যাদি উপসর্গের প্রাধান্য বেড়ে তাঁর দরশন পাঠে বিঘ্নিত অসুবিধা হয়ে পড়েছে। তবে এখনো শতকরা ৪০ জনের মধ্যেও পড়ার অসুযোগ অসুবিধা রয়েছে, সেটা কম আশার কথা নয়।

পারিপার্শ্বিকের এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা কি করতে পারি, সেটাই বিবেচ্য। পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ (ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি) করে ছাত্রদের রুচি, কমনতা ও যত্ন অসুযোগী তাদের তৃপ্ত করতে হবে। নূতন গ্রন্থ বাব হওয়া মাত্রই কিনতে হবে, সময়ের বিভাগের জন্ত একজন শিক্ষা-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রাখতে হবে। তা ছাড়া শ্রেণী শিক্ষক থাকবেন তাঁকে সাহায্য করতে। প্রত্যেক শ্রেণীর পক্ষে এ ব্যবস্থা সম্ভব না হলে অটম থেকে প্রযত্ন করা যেতে পারে। মাতৃভাষা-শিক্ষকের অসুযোগের বস্তু গ্রন্থ কিনতে হবে এবং সময় পাঠ পৰ্যবেক্ষণের হারিয়ে তাঁকে নিতে হবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠের সাথে পাঠাগারের এমন সংযোগ গড়ে তোলা উচিত, যার ফলে ছাত্রদের লক্ষ্যজ্ঞান তারা ইচ্ছামত বাচাই করে নিতে পারে।

সাধারণ পাঠাগারে শিক্ষক তাঁর জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হবেন, আর তাঁর সহায়কুড়িগ্রন্থ বঙ্গালী অন্তরেও সংস্পর্শে ছাত্রদের স্নেহ বসচেতনা নব নব সৃষ্টির মধ্যে সার্থকতা লাভে অসুপ্রাণিত হবে। তবেই সার্থক হবে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন।

শিক্ষাব্রতীর আমেরিকা ভ্রমণ

(২)

[শ্রীদিলীপকুমার বিন্দাল]

আগের চিঠিতে চারণ পথান্ত পৌছান সময়
বিদ্যাহি। তারপর কাইরো। এখানে সকলেই
বিমান বন্দরে (নাম ফারুক) নামিয়া আগামগ্রন্থ
খালে চানিয়া একটু ঘুমেই হোটেলে গেলাম।
অল্প কয়েকজন যিশরীয় চক্রে গড়িল ; সকলেরই
পূর্ব কৰ্মা বলিয়া মনে হইল। কক্ষি পান করিয়া
যিশরীয় সময় যাত্রি দেড়টার সময় ফারুক বিমান
বন্দর ত্যাগ করিলাম। তখন কলিকাতার সময়
পাঁচটা। তারপর এবেঙ্গ-এলিনিকন বিমান বন্দর।
যাত্রি আদ্যবট। কাটাইলাম। যখন পৌছিলাম তখন
যাত্রি ভোর হইয়াছে ; সূর্যের উঠি উঠি করিতেছেন
আর কি। কলিকাতার সময় সাড়ে নয়টার এবেঙ্গ
ত্যাগ করিলাম। বেশটা পাহাড়ে ছড়ান বলিয়া
মনে হইল।

রোম শহরের নিয়ামনিম্নে বিমান বন্দরে সকল
বেলায় পৌছিলাম। প্রত্যেক বিমান বন্দরে সেই
দেশের ভাল জিনিষ কিনিতে পারা যায়। আবার
যে ভ্রমণ (Traveller's Chequo) ছিল তাহা
খরচ করিতে ইচ্ছা না করিয়া একশটাকার ইটালীয়
টাকা কিনিলাম। আমাদের ১২-১০০ লীরা।
দুইবীন ধরনের তৈয়ারী প্রান্তিক ও কাচের খেলনা
ঐ ১০০ লীরা দিয়া কিনিলাম। মনে হয়,
আমাদের যেনেব মুদ্রাক্ষীতি ইউরোপের গাণে
নগণ্য। আর বটাবানেক কাটাইয়া কলিকাতার
সময় দুপুর বেড়টার রোম ত্যাগ করিলাম।

বিদ্যানে খানা পিনার ব্যবস্থা বড়ই সুন্দর।
বড় চাও তত খাও। খোখাই হইতে ৩৫ জন
ভারতীয় ছাত্রছাত্রী উঠিয়াছেন। তাহার মধ্যে
একজন বালক আছেন। তবে আই, কম্ পাণ
করিয়া কলিকাতালাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে B.A. ৩৩

Administrationএ এম, এ, পড়িতে বাইতেছেন।
কোডারমা এবং গোখাইয়ে অস্ত্রের ব্যবসা আছে ;
যাযা খা বাচিয়া আছেন। তিনি নিয়ামিষ
আহারী। একমাত্র তিনিই আমার সাথে
নিউইয়র্কে বাইতেছেন। তবে আমি তাঁহার
অভিষ্ঠাবক।

ইটালীয় ক্লব দিয়া উড়িলাম। নেপোলিয়নের
১০০ দিনের রাজ্য এলবা দ্বীপ দূর হইতে দেখিলাম।
পিসা ও মিলান ছাড়াইয়া আরম্ভ পর্বতের উপর
আসিলাম। ইটালী আক্রমণের সময়ে নেপোলিয়নকে
অনেকেই নিবেশ করিয়াছিলেন—তাগী কামান, বন্দ
ও মালপত্র দিয়া যেতকালে চুপিচুপি বাওয়া অসম্ভব।
নেপোলিয়ন শুধু উত্তর করিয়াছিলেন যে আরম্ভ
পর্বতের কোন বাপাই থাকিবে না। জর্জরেল
জর্জরেল অগ্নিগান সব সেনাপতি যখন শিহনে
আঘাত পাইলেন তখন সকলে হতবুদ্ধি। আধুনিক
যুদ্ধের কলা কোণগ তিনিই প্রথম শিখাইয়াছেন।

নেপোলিয়নের ২০০০ বৎসর আগে আর
একজন য়র প্রকোপনে এই আরম্ভ অতিক্রম
করেন। আমরা অনেকেই তাঁহাকে জানি না,
তাঁহার বেশও তাঁহাকে ভুলিয়াছিল, তাঁহাকে
অবশেষে নজর হাতে ভুলিয়া দিতে বড়ভয়
করিয়াছিল। প্রথম কাধের যুদ্ধে অনেক বীর
বেখাইয়াও ছামিলকার বার্ক পলায়নের হাত
এড়াইতে পারিলেন না। ছানিবাগ তখন শিত।
তখন হইতেই তিনি রোম আক্রমণের স্বপ্ন
বেঁধিতেন। যৌবনে সেই স্বপ্নকে তিনি সার্থক
করিয়াছিলেন। আরম্ভ পাব হইয়া এক ক্লব খরিয়া
তিনি ইটালী ছাড়বার করিয়াছিলেন। অবশেষে
অবশেষে সাহাব্য না পাইয়া এবং রোমান সেনাপতি

কেবিশ্বাসের কোণের সাথে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ইটালী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই কেবিশ্বাসের নীতি ছিল "Wait and See"। এই নীতির থেকে আসিল Fabian Socialism এবং বার্লান্ড ন তাহার অন্ততম স্রষ্টা।

আমরা সপ্তাহের উপর দতই উড়িতে লাগিলাম ততই স্বপ্নের স্বপ্নের দৃশ্য চক্ষে পড়িতে লাগিল। পর্বতের চূড়াগুলি বরষে ঢাকা। পূর্বেও কিরণ ঠিকজাইয়া পড়িয়া চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের বিমান কোন কোন চূড়ার গা ঘেঁসিয়া কোনটার চারিপাশে ঘুরিয়া অবশেষে দুপুরে জেনিভায় পৌঁছিল। বিমান বন্দরে নামিয়া ভিতরে গিয়া ঘড়ির দোকান দেখিলাম। ওয়েগা, লাইমা ও আরও নাম জানা এবং অজানা ঘড়ি দেখিলাম। কলিকাতার চেয়ে দাম কিছু কম বলিয়া মনে হইল। আর ঘটা পরে জেনিভা ত্যাগ করিলাম।

এবার লোভা প্যারিস। বেড় ঘটার মধ্যে গুলি বিমান বন্দরে পৌঁছিলাম। টার্মিন, রোম, ও প্যারিসে আমেরিকার বহু প্রকার প্রকাণ্ড বিমান চক্ষে পড়িল। আমেরিকা যে এতদূর দেশকে যত সাহায্য করিতেছে তাহা বেশ বোঝা যায়।

ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতি বড় কম নয়। দেশের সমুদ্রসীমার কাছে ছই থানা চিঠি ছাড়িলাম; ফ্রান্সে কিনিতে আমার ১২ খরচ হইল। খরচ আমাদের দেশে ৪০ আনা এবং আমেরিকা দূর যাত্রায় ৬/১০ মাত্র খরচ হয়। এখানকার পুলিশ খুব ভয়। আমি কথা বলিবার জন্য নিকটে থাওয়া যাত্রী আমাদের সেলাম দিল।

ইজিরের গোলমালের জন্য এখানে আশ্রয় দূতন আর একটা বিমানে চাপিলাম। ফ্রান্স পার হইলাম, ইংলিশ চ্যানেল পার হইলাম। অবশেষে আয়ারল্যান্ডের শানন বিমান বন্দরে নামিলাম।

শানন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর; এখানে মিনিম কিনিলে যোড়ানদার তাহা যে কোন দেশে পাঠাইবার ভার নেই। কোন প্রকার বস্তানি বা আশ্রয়ানি গুলি দিতে হয় না।

সন্ধ্যা ৭-৪৫ মিনিটের সময় শানন ত্যাগ করিলাম। আমার ঘড়িতে তখন রাত্রি ১২-৪৫ মিনিট। আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িলাম। নীচের কিছুটা দেখা যায় না। অবশেষে কত বুড়ির মধ্যে নিউক্যাসল্যান্ডের গ্যাণ্ডার বিমান বন্দরে পৌঁছিলাম। আবহাওয়ার গোলমালের জন্য আমরা প্রধানকার হোটেলে রাত্রি কাটাইলাম। চমৎকার বাবু। আমাদের কোনও খরচ নাই। সবই টি, ভলু, এ, কোম্পানী দিলে।

পরদিন সকাল সাড়ে নয়টার গ্যাণ্ডার ত্যাগ করিলাম; আমার ঘড়িতে তখন বিকাল সন্ধ্যা পাঁচটা। উত্তর আমেরিকার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে এই সেন্টের বুদবার সকাল প্রায় সাড়ে এগারটার সময় নিউইয়র্কের আইজলুওয়াইও বিমান বন্দরে পৌঁছিলাম। আমার ঘড়িতে তখন রাত্রি ১০টা। বন্দরের সব পরীক্ষা শেষ করিয়া প্রায় আড়াই ঘটা পরে বাহিরে আসিতে পারিলাম। আমার সাবীকে অভ্যর্থনা করিতে তাহার পলিটিক্স লোক আসিয়াছিলেন, তাহাকে নিরা চলিয়া গেলেন। আমিও বাসে চাপিয়া নিউইয়র্ক নগরের লাইস স্টপ পর্যন্ত আসিলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি করিয়া আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসে আসিলাম। রাজ্যের আর একজন আমাদের বড় ফুলফাইট ফলালের দেখা পাইলাম। দুইজনে রেলের টিকেট কিনিয়া নিকটে এক হোটেলে সেলাম। ট্যাক্সি হোটেলে, ২০ ডলার বাড়ী, প্রায় ৭০০০ কামরা। প্রতি ২৫ ঘণ্টার তাড়াই তুইজনের ৬ ডলার; তার উপর আমার ট্যাক্স ৩০ সেন্ট। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বড়ই পরিভ্রান্ত ছিলাম। নিকটের রেলস্টেশনের থাওয়া দাওয়া পারিলাম।

সেভাটি Self-service ; বাথরুম খালাসাকান আছে ; সুনিয়া লও আর নগর বাস দেও ।

পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া বাতরা লাওয়া দাখিয়া ছইকনে ১০২ স্তল উঁচু Empire State Building বেধিতে বাহির হইলান । মাটির স্তলার বে খেল লাইন আছে স্তাহাকে এখানে Bob nny বলে । বড় বাতরা পাশে মাটির স্তলার যেন ট্রেনে বাইবার বাতা আছে । আরও সিরা ১০ সেন্ট সিরা টিকিট কিনিলাম । সেখানে বাত, বতবার গাড়ী বদলাও, এই বন সেন্ট মাত্র মাখা পিছু পরচ । আলোর ব্যবস্থা খুব সুন্দর, গাড়ীও খুব জোরে চলে । অনেক সুখিয়া Empire State Buildingএ পৌছিলাম ।

উপরে মেঝামত হইতেছে বলিয়া আতকান ৮৮ স্তল পর্যন্ত লিক্ট চলে ; কিন্তু লিক্টে চড়িবার দক্ষিণা নওয়া এক স্তলার, প্রায় ৬ টাকা । কিন্তু পুখিখীর সব চেয়ে উঁচু বাতীতে চড়িবার তর মাত্র টিকেট কিনিতে লাইন সিরা দাড়ায় ।

৮৮ স্তলার পৌছিতে ছই মিনিটও লাগিল না । সেখানে বনোহারী জিনিস বিক্রি করিবার এক মোকান আছে, প্রত্যেক জিনিসের উপর Empire State Building কথাটি লেখা থাকে । অদি কয়েকটা জিনিস কিনিলাম ।

মানহাটান দীপের উপর অবস্থিত এই বিরাট বাতীর উপর দাঁড়াইয়া গোটা নিউ ইয়র্ক নগর দেখা যায় । এক দিকে অমান দীপের বড় বড় বাতী ; আর এক দিকে সহস্রের বন্দর—বড় বড় জাহাজ সব নোদর কুশিয়া আছে । নীচের বাতর ও গাড়ীগুলিকে খেলনার পুতুল বলিয়া মনে হইল । ছই করিয়া বাতাসি বহিতেছে । বাতাসের ননু ননু নদ, সুখের উজ্জল জিবন আর পারিশার্খিক গাড়ীর মাত্রকে তাকু বানায় । আর খটা কাটাটরা হোটেলেরে কিনিলাম ।

বাতাবাতের পরচ Institute of Inter-

national Education দিরাচেব । সেখানে সিরা তাঁহাদের মচিত কথা বলিলাম । সকলেই বেশ অমারিক এবং মিতক । সেখানে হইতে কিনিয়া হোটেল হইতে বিদায় লইলাম ।

নিউইয়র্ক নগরের বাতাবাতি অনেকটা আদান-লোন নগরের বাতাব নত ; অনেক চড়াই উঁচুই আছে—অন্যত তত উঁচু নীচু নয় । নগরে ৭০৮০ স্তল বাতী বেশ অনেক আছে । আর ২০২৪ স্তল তো বলিতে গেলে প্রত্যেক বাতী । পরীবেত টাই নাই, তবে বলিতে গেলে প্রত্যেকেই বড়লোক । আহাদের বেণের মগাবিত্তের চাটতে সেখানকার চাকর বাকর কুনোমদুর তাল খাচ ভাল পথে তাল থাকে । কথাই কথাই একশ্রী—ট্যান্ডী বল, কুনী বল, হোটেল বল, বকশ্রী দিতে আদান । ইহাই প্রচলিত কথা এবং আটনসমত ; বকশ্রীর উপরও আবকর আছে ।

৬ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টার আহাব গাড়ী ছাড়িল ; মাত্রাতো ততলোকেও গাড়ী আর এক খটা পরে । মাগা বাতী গাড়ীর আদনে বলিয়া কাটাইলাম । নকল বেলায় দিকাগে পৌছিলাম । গাড়ী বদল করিয়া এখানে আদিবার অন্ত গাড়ীতে চানিলাম । সোলমালে কুনীকে সুখিয়া পাইলাম না । গাড়ীতে "Passengers' Representative"কে জানাইতে তিনি বলিলেন "You will get it back within 48 hours." এই সেপ্টেম্বর রাতে আহাব স্ট্রেকেন কার্বনভেল-ট্রেনে পৌছিল ।

এখানকার এক বৃদ্ধা অব্যানিকার মাখে গাড়ীতে পরিচয় হইল । সুখ প্রায় সাত্বে বাতাবাত, পৌছিলাম । বৃদ্ধা বত লইয়া কলেজের অফিসে কোন করিয়া আহাব বাতীর ঠিকানা দিয়া ট্যান্ডির জাইভারকেও বাতীর নদর দিলেন । জাইভার আহাকে পৌছাইয়া দিল । বিদেশী ছাত্রদের পরামর্শ-বাতাব অফিসে খবর পাইয়া বোখাইয়ের এক তর

লোক দেখা করিতে আসিলেন। তিনি সেন্টে লুই হইতে উইয়েটে গাইয়াছেন; এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রিসার্চ করেন। পত্নী শিকা বিষয়ে এ কলম এম. এ. ডিগ্রী পাইয়াছেন। আমাকে বাড়ীতে নিয়া খুব দয় করিলেন।

আমার বাড়ীর সূহ-কর্ডার বয়স প্রায় ৬৮; তিনি হেল কোম্পানীতে কেবালিগিরি করেন। স্ত্রীর বয়স ৫২; কলেজের ক্যান্টীনে হাঙ্গা করেন। তিন ছেলে ও এক মেয়ে। সকলেই বিবাহ হইয়াছে এবং তাঁহারা পৃথক বাড়ীতে বাস করেন। কতী এবং গিটী বড়ই ভাল মানুষ; খাটি খুটান।

এ বাড়ীতে আরও ৫ জন বিদেশী ছাত্র থাকেন—দুইজন দক্ষিণ আমেরিকার টেক্সাসের, একজন ইংল্যান্ড, একজন জার্মানী এবং অল্প কয়েকজন হাওয়াই বোন হইতে আসিয়াছেন।

আমেরিকার পৌছিবাব কাহিনী সমাপ্ত হইল। কলকাতার সময় আসিতে হইলে ছুটি মাসেরও বেশি সময় লাগিত; আর এখন দুই দিনেও আসা যায়। পৃথিবীর অচলারতন ভাবিয়া পড়িতেছে, আমাদের সমাজও অব্যাহতি পাইবে না—যে বস্তুই চাপিয়া রাখুক না কেন।

বরিদা খাদি গুরুকুল

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র]

[বরিদা মেদিনীপুর জেলার এক গ্রাম। এখানে কৃষি ও খাদির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।]

জুলাই ১৯৪০ হইতে জুন ১৯৪১ পর্যন্ত বার্ষিক কার্যবিবরণী।

উদ্দেশ্য ও পরিবেশ : বরিদা খাদি গুরুকুল এক নূতন ধরনের আনন্দিক বিদ্যালয়। অধিল ভারত চরকা দ্বারা ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি জায়গায় খাদি গুরুকুল চালাচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য হল মহাত্মাজীও অহিংস ও শোষণ-খাসনহীন সমাজের উপযোগী যোগ্য ও চরিত্রবান নাগরিক তৈরি করা। এই উদ্দেশ্য পূর্তির তিষ্ঠি হিসাবে খাদ, বস্ত্র ও আচারে স্বাধীনতা ও আনন্দিক জ্ঞানে ম্যাট্রিক মান পর্যন্ত করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য সময় ৪ বছর।

স্বাভাবিকভাবে কেবলমাত্র এই বরিদাতেই খাদি গুরুকুলের প্রবেশ চলছে। গত ১৯৪০ সালের মে

মাসে গুরুকুল আরম্ভ হয়। মেনের প্রায় সকল লোক প্রচলিত শিক্ষা ও জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট। এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে উপরোক্ত পরিচালনা এই সকলের সঙ্গে নূতন জিনিস। ছাত্ররা এসে একত্র হতেই জুলাই মাস এসে যায় এবং আসলে এই সময় থেকেই কাজ আরম্ভ হয়। যথা ইংরেজি বা সমমান পর্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রদের নেওয়া হয়।

ছাত্র : বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ১৭। কিন্তু ৭ জন ছাত্রের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। বাকী ১০ জন ছাত্র ৩ মাস হল ভর্তি হয়েছে। বছরের গড় ছাত্র সংখ্যা ১১।

কৃষি : খাদ স্বাধীনতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কৃষিকাজ করি। আমরা খাদ্যের জন্য চাষ, ভাল, তেল, এবং ছাত্র ছাড়া প্রায় কিছুই খরিদ করি না। চাল ভাল ভেদে আনন্দিক নিবেদন করেছি।

এ বছর কৃষির সব প্রথম কাজে মোট ৮,৭৫০ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। এতে শাক-বাকি ২৩০/

মণ, ধান ১২৫০ মণ, তিল ৬৬ সের, পাট ১৪ সের ও জাল ১/৩ সের উৎপাদন করা হয়। এই সব জায়গার বাজার মূল্য ১৪৩২ টাকা। দাব, বীজ পরিষ্কার ও প্রস্তুত ২৬৭ টাকা খরচ হয়। প্রকৃত আয় ১১৬৫ টাকা। পারিবারিক মূল্য বর্টার দু' আনা দিচ্ছি পথসী। বস্ত্রখান বাগানে সব বকম তৈরি-সরকারি আছে। গত অক্টোবর ১২৫০ এর মধ্যে প্রায় ৪০০০ কুচি কাজ নেই হয়ে গেছে। গ্রামের লোকদের প্রায় ১,০০০ কলাচারা ও পাট, মন, তিল আদি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

গ্রামের কৃষকদের সংগে সরসোপ ও সবুজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাদের সংগে প্রস্তুতি নিয়ম করা হয়। ২৮ খানা লাগনের পদ্ধতিতে ৫৬ দিন তাদের মাঠে বান চাষের বিভিন্ন কাজ করে দেওয়া হয়।

সার তৈরি : বিভিন্ন বকম কম্পোষ্ট সার তৈরি করা দেখানো হয়েছে। ছাত্রেরা পাঠখানা ও গ্রামের দাব ব্যবহার করতে শিখেছে। হাড়-দাব তৈরি করার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দাব তৈরি পুরাতন ব্যবস্থা পদ্ধতি বকম সরকার থেকে ২২৫০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে।

বাড়ি কাজ : বিভিন্ন নতুন হওয়ার এবং বাড়ি আবলম্বনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য বাড়ির আবহাওয়া পড়ে তুলতে অনেক সময় চলে যায়। তাই আশাহতন বাড়ি কাজের প্রগতি হয় নাই। প্রথম ধলেশ ৭ জন ছাত্র ২৭০ গতি হতা কেটেছে। ওদের কাছাই গতি এক বর্টার চরখাতে ৩২০ তার এবং তকলিতে ১২০ তার। একজন ছাত্র সকলেই যথাস্থি পিছনে তুলে বোনা শিখেছে। প্রত্যেক বীনের চরখা তৈরি করতে শিখেছে। নিজেদের চরখা ছাত্র ১০টা বীনের চরখা তৈরি করে বিক্রি করেছে।

বিভিন্ন ধলেশ ১০ জন ছাত্র ৩ মাসে ৬৮ গতি হতা কেটেছে। প্রথম তকলিতে বর্টার গতি ১০০

তার। চরখার হতা কাটা আনন্দ ২৫৫৫। তুলেই ছুরি, বহুক ইত্যাদি তৈরি করতে শিখেছে এবং পাঠ করার নতুন পদ্ধতি ২৫ তুলেই, ছুরি তুলেই, বহুক তুলেই ইত্যাদি শিখেছে।

আবলম্বী জীবন : শোষণশীল সমাজের বোনা নাগরিক তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে বহুক সমস্ত আবলম্বী করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। ছাত্রদের এ বছর পড়ে মাসিক খরচ ২০০ টাকা পাড়িয়েছে। এই খরচের মধ্যে ৪৮% ছাত্রেরা কুচি ও বাড়ি থেকে আয় করেছে। আবলম্বনের দৃষ্টি নিয়ে ওরা 'গুরুত্বপূর্ণ সমাজ' নামে একটি সংগঠন করেছে। এই সংগঠনের বিধান অনুযায়ী বাজা, সাকাই, কুচি, পড়াশুনা, শিল্পাদি সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে কোন চাকর বা বেখর নাই। সব কাজ নিজেরাই করে হয়।

নিজেদের চোটখাট ভিনিস ও বাস্তব নিজেদের করে নিতে পারে অথবা কমপক্ষে স্বদেশী ভিনিস ব্যবহার করা হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ছেলেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কালি নিজেরাই তৈরি করে নেয়।

গ্রাম সাকাই : প্রতি শুক্রবার গ্রাম সাকাই দিবস। ঐ দিন গ্রামের বাস্তব ৭৫ পুত্রদের সাক করা হয়।

উৎসব : কয়েকটি আত্মীয় উৎসব, কনু ও সামাজিক উৎসব উদ্ভাবিত হয়। মাসী অবসী উপলক্ষে ৮২ দিন ব্যাপী প্রস্তাব মাসী জীবনী আলোচনা ও সূত্রবদ্ধ হয়। এই উপলক্ষে একটি গ্রামে এক মাসের ধরে গ্রামোন্নয়ন মূলক কাজ করা হয়। কাজের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ :—

গ্রামের ২৫৪ ফুটের সার বাস্তব ৫ থেকে ১০ ফুট চওড়া করা হয়। ৩২৪ বর্গমণ্ডল আয়গার অংশে সাক করা হয়। ৩,৫৩৭ বর্গফুট বাড়ির কাজ করা হয়। ৪,২৬০ বর্গমণ্ডল আয়গার মনতল করা হয়

৪৬ উন্নত বস্ত্র ব্যবস্থার শিক্ষা দেওয়া হয়।
যুব-সংগঠন, পকারেড গঠন ও নারী উন্নয়নের কিছু
কাজ হয়।

আকস্মিক জ্ঞান : এখানে অনেকটা নই
জালিম পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই এক
বছরে ছাত্রেরা আকস্মিক জ্ঞান যা পেয়েছে তা
স্বাভাবিক উচ্চ ইংরেজি বিভাগের এক বৎসরের
কোর্সের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ছাত্রগণকে
বাণেশ্বরী আদর্শে গড়ে তুলবার চিন্তে বিশেষ নজর
দেওয়া হয়। আদর্শের এই শিক্ষাধারা বোধ
মৈত্রিক ও আস্থিক শিক্ষার বিশেষ স্থান আছে।
বাংলা সাহিত্য, হিন্দী, গণিত, ইতিহাস, কৃষিবিজ্ঞান,
বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, বাগিচা বিজ্ঞান, রাজনীতি,
অর্থনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া
হয়।

শিক্ষা ভ্রমণ : বৎসরে একবার শিক্ষা ভ্রমণ
করা হয়। এ বৎসর দু'টি জাতীয় সংস্থার কাছ-
, দ্বারা আয়োজন করা এবং সমুদ্র দেখা হয়।

আনন্দ খেলা : আনন্দ খেলা এই শিক্ষার
একটা অঙ্গ। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় আনন্দ খেলার
আসরে গান, আবৃত্তি, অভিনয়, নাচ, কবিতা,
ম্যাজিক, ইত্যাদির দ্বারা গ্রামবাসীদের মনোহরণ
করা হয়।

সংগীত ও খেলা-ধুলা : কতু অল্পবয়সী মানা
সকল খেলা-ধুলা, ডিল, প্যারেড, বস্ত্রচাষী নৃত্য,
গঠনমূলক নৃত্যাদি শিখান হয়। সমবেত আর্থনা,
জাতীয় ও কর্ম সংগীত শিখান হয়।

অবসর : আদর্শের যে মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ
হয়েছিল। এ বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বর্ষ
আরম্ভ করা হবে দিবে হয়েছে। শুাক টিকিট দিয়ে
নিচের ঠিকানায় লিখলে এই বিভাগের নির্দোষনী
পাঠান হয়।

বহিরা বাগি ওকনুল

সোঃ গড়হরিপুর, মেদিনীপুর,

২৮-১১-৪১

অতুলচন্দ্র বিজ

অধ্যক্ষ

শিশু ও তার স্মৃতিকথা

[শ্রীমদভগবদ্গীতায়াং]

শিশুর স্বয়ংপ্রকাশ, তার চৈতন্য, শিকাকমতা প্রতিনিয়ত বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। মনের সম্বন্ধে, মনেই বস্তুর চরম বিকাশ। মানুষের মনের এই যে কক্ষতা, তা ইন্দিয়াতীত নয়। স্মৃতিশক্তির উন্মেষ বা প্রেরণা কোন সময়ে হয় তা বলা শক্ত। শিশুর নৈশব জগতের প্রথম পরিবেশ গৃহ। এই গৃহ পরিবেশ গ্রাম্য পরিবেশের আকর্ষণ নিয়ে আসে শিশুর মনের মণিকোঠায়। এই জন্ম-পরিবর্তিত পরিবেশের আকর্ষণ বহির্বিবেশ সঙ্গে পরিচয়ের সোগমুখ গড়ে তোলে। এই বহির্বিবেশ সঙ্গে পরিচয়ের সোগমুখ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিকাশ পুষ্ট হয়। 'কামা', 'হাসি', 'অস্তিমান'—এগুলো তখন শিশুমনের বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি। অম। পরিচয় ও অপরিচয়ের মধ্যে এই ভাবের অভিব্যক্তিও প্রকট। তাই স্নেহমধুর মাতার স্পর্শে শিশুর সম্মলনমন প্রসন্ন পায়। কারণ সে মায়ের স্নেহনিবিড় স্পর্শ পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

শিশুর খেলাধুলা, কাজ, সব কিছু যা বাবা-কে উপলব্ধ করে। তাই উত্তরকালে একটি সুগঠিত পূর্ণাঙ্গ শিশুর আকার বা প্রকার কতকটা মাতা বা শিশুর আকার বা প্রকারের হয়। শিশুর সর্বাঙ্গীন সূক্ষ্ম মাতাপিতার বা পরিচালক শ্রেণীর সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গীপত কল। 'অনুসন্ধিৎসা' ও 'কল্পনাকাজিতা' শিশুর সর্বাঙ্গীন সূক্ষ্মের সহায়কের দুইটি প্রধান দিক। পরিচালকশ্রেণী এই দুইটি বিশেষ দিকের উপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু গড়ে তুলে। শিশুর অস্বকরণশ্রির মনে প্রতিটি দৃষ্টান্ত এক বিচিত্র অস্তিত্ব আনে। তাই নৈশবের প্রথম স্তরে বা পরবর্তীভাবে বা, বাবা,

ছোট ভাই, তাদের হানতাব, চালচলন, বেশকথা, ও প্রতিটি কথার নিয়ে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। সে এই কঠিবোধে একটি বিশেষ শ্রেণীর কঠিবিশিষ্ট শিশু হয়ে ওঠে। এই কঠি নিয়ে তার বাস্তব জীবন গঠনের প্রথম স্তর আদৃত হয়। তাই শিশুর জীবন গঠনের পরে মাতাপিতা ও এই শ্রেণীর পরিচালকবৃন্দই বিশেষভাবে দায়ী। সর্বাঙ্গীন বিকাশের অপর একটি বড় দিক—'চিন্তার বিকাশ' ও 'স্মৃতির বিকাশ', এককথায় মানসিক বিকাশ। মানসিক বিকাশের প্রধান অঙ্গুল কেন্দ্র প্রস্তুত করে দৈহিক সার্বভৌমতা। দৈহিক বিকাশের পর সার্বভৌম করে শিশুর প্রকোভমূলক বিকাশ। কাজেই শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে এই তিনটি দিক সর্বাঙ্গী লক্ষ্যীয়।

এখানে প্রদানভাবে শিশুর স্বয়ংপ্রকাশের দিক সম্বন্ধে আলোচনাই বিশেষ বিষয়। ছেলেদের নৈশবে প্রতিকূলতা না থাকে, সেটাই পরিচালক শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। তাই স্মৃতিশক্তি বিকাশের সহায়ক শিশুর অনুসন্ধিৎসাকে চরিতার্থ করে, বাস্তবিকতার মধ্যে আস্বপ্ৰকাশের সুযোগ দিয়ে সার্বভৌমভাবে জীবন গঠনে সহায়তার সুযোগ দেয়। শিশুর স্বয়ংপ্রকাশের উন্মেষ নির্ভর করে তার সার্বভৌম আস্বপ্ৰকাশের প্রতির উপরে। জন্মের পরে শিশুর মন পাতা-না-দগা স্রব ককির মত। প্রতিকূলতার স্রব ককির মচ্‌কানো অবস্থায় মতই শিশুর মন। বাতাস-ধোলা নদীস্রব পতোষির তার শিশুচিত্র মুহূর্তধনো পতন্তরকের দ্বারা প্রশস্ত। কাজেই শিশুমনকে সহস্ররূপে বিচিত্র হবার সুযোগ দিতে হবে। প্রতিকূলতার শিশুর মন মচকে গেলে শিশুর স্বয়ংপ্রকাশের পর সূক্ষ্মরূপে

পঠিত হতে পারে না। শিশুদের স্বয়ংসিদ্ধি স্বত্বকাল হারায়। তাই ২০ মাসের শিশুও এক গণ্ডীতে তার মাকে না দেখলে কুলে যায়।

আধুনিককালেও যেনো বৈজ্ঞানিকগণ শিশুর স্বয়ংসিদ্ধি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন :—

১৫ হতে ২০ মাসের শিশুরা কোনও ঘটনা বা বস্তু কল্পা ৮-১০ মিনিট কাল মনে রাখতে পারে। আবার ২০ হতে ২৪ মাসের শিশুরা ১৭-১৮ মিনিট যাত্র মনে রাখতে পারে। ১০-১১ মাসের শিশুরা অল্পস্মরণতাবে ২-১ মিনিট যাত্র মনে রাখতে পারে। বাল্যাবস্থায় শিশুর মন বা স্বভাবকে একেবারে পরিবর্তিত করে এমন কিছু কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়।

ভাঃ শিশুর পূর্বক বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে স্বয়ংসিদ্ধির ক্রমিক ক্ষমতার ত্রিভাব নিম্নোক্তরূপতাবে দেওয়া আছে।

বয়স	শব্দ সংখ্যা	স্বয়ংসিদ্ধি
৮ মাস		
১০ মাস		
১২ মাস	৩	১১
১৫ মাস	১০	৩০
১৮ মাস	২২	২৮
২১ মাস	১১৮	১৫৪
২৪ মাস	২৭২	৬২৪
৩৬ মাস	৮২১	৬৪৪
৪৮ মাস	১৫৪০	৫৩২
৬০ মাস	২০৭২	৪২০

১৫-১৮ মাসের শিশুদের হাঁটা শিকার দিকে ঝোঁক প্রবল থাকে। কাজেই শব্দশিকার দিকে মনের গতি তখন কতকটা ব্যাহত হয়। একই সঙ্গে হাঁটা ও শব্দশিকার উভয়ধর্মী ব্যাপারে যোগদান শিশুদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

বয়স ও স্বয়ংসিদ্ধির ক্রম-অনুসারে শিশুর শব্দ-আহতীকরণ ক্ষমতা তাই বিভিন্ন। স্বত্বশিক্ষার এই বিষয়ে দুইটি দিক প্রধান প্রণয়নযোগ্য।

(ক) অতি অল্প সময়ে মনে রাখা ও অতি অল্প সময়ে কুলে যাওয়া।

(খ) বীরে বীরে মনে রাখা ও না কুলে যাওয়া।

২ বৎসরের শিশু ৩.৪টি শব্দ আহতীকরণের দ্বারা একটি বাক্য গঠন করে বলতে পারে। তিন বৎসরের শিশুও অল্পস্মরণতাবে ৭.৮টি শব্দ একত্র করে এবং ৪ বৎসরে ১৪.১৪টি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য গঠন করে বলতে পারে।

শিশুর স্বত্বশিক্ষার উদ্দেশ্য সময়ে শিশুকে অত্যধিক চাপ বা তার মনের প্রতিবন্ধ কোনও কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। এতে মৌলিক চিন্তা বা স্বত্বশিক্ষার উদ্দেশ্য হয় না। তাই শিশুর স্বত্বশিক্ষাকে স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত।

শিশুদের মনে স্বাভাবিকভাবে কুনিয়ম বেধী প্রেরণা পাত করে। সেজন্য পিতামাতার শাসন বা শব্দ শিশুচিন্তার প্রণয়িতার পথ বন্ধ করে দেয়। তাই যে শিশুর কুলে গতিকালে স্বত্ব শীল থাকে, পরবর্তী কুল জীবনে তার স্বত্বশিক্ষার হ্রাস দেখা যায় কেন? তার কারণ আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অল্প সময়ে বেশী চাপের ব্যবস্থা। তাই, প্রথমে কুলে যাওয়ার ক্ষমতা উৎসাহ্য এবং থাকলেও শিশু ২৪ মাস পরে কুলে যেতে চায় না। কারণ সে ভালবাসে না তার পরিবেশকে, তার উপরে জোর করে চাপানো অনিয়মগুলোকে। বিলাতে এই কারণে ছেলেদের আহ্বায় প্রদোষ ও শাসন বাধনার মধ্য দিয়ে শিকারীকে সহজ করে শিশু মনে সহজরূপে বিদিত করার চেষ্টা রয়েছে। শিশুর উপযোগী নানারকমের ব্যবস্থা হয়েছে শিক্ষা দেবার।

নাচ গান দ্বারা মধ্য দিয়ে তারা শিখছে লাহিতা। হেওয়াগে বড় বড়দের চাট দ্বারা শব্দ দেখার ও দেখার সুবিধা করে 'শব্দশিক্ষা' দেওয়া হয়।

মৌখিক শব্দগঠন ও মৌখিক ভাষা—যদি গঠনের সহায়ক। ইতিহাসের কাহিনীকে গল্পাকারে বুদ্ধির দ্বারা কল্পনাকল্পিত উদ্ভাবন সাধন অত্যন্ত সহজ। তাতে কেবলমাত্র হবে, ইতিহাসের মধ্যে স্থানের নাম, ব্যক্তির নাম ও পরিচয়, মন, ভাবের ভাষা এড়িয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের বৃত্তিশক্তিকে উন্নত করতে হলে তাদের সমস্ত পরিবেশ, বিচরণক্ষেত্র যাতে এক-মুখে শিক্ষা ও নাট্যশালা হয়ে ওঠে তার দিকে নজর দিতে হবে। এতে শিশুর স্বয়ংশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কল্পনাশ্রবণভার ও অনুকরণশীলতার বৃদ্ধির উদ্ভাবন হবে।

গৃহের আবহাওয়া এমন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যেখানে ছেলেবা নতুন শব্দনগণীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে জানের সিঁদুর পূরণের সুযোগ পায় ও অবলম্বিত আশ্চর্য্যবাস লাভ করে। বিজ্ঞানসাধন শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—তাই, সে যাকে প্রবৃত্তি বলে বিপর্য্যয় করে। এজন্য যা ও তৎস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বৈরাগ্যশীল হবেন।

তাই এ সময়ে অল্পবয়স্ক বন নিজে যে সাধারণ জ্ঞান শিশু দক্ষ করে, তা বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ। তাই এ সময়ে শিশুর সাধারণ জ্ঞান বরফ লোকের চেয়ে অনেক বেশী। বস্তু পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। আপাতদৃষ্টিতে শিশুর প্রত্যেক অবস্থায় বলে অনেক স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুর এর বা বিজ্ঞানসাধন তার শিক্ষারূপের পথের প্রধান প্রতীক। শিশুর মনের অনিগলি সোজা কটে, তবে কণে কণে আবার কল্পনার বিচিত্রতার অনেক জায়গা এঁকে বেঁকে যায়। সে তার নিজের বস্তু ও বিষ পরিচয় অল্পবয়সী নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা নিজে থেকেই খুঁজে পায়। তাই শিশুর বৃত্তিপথের গঠন-ব্যাপারে পরিচালক প্রবৃত্তি চলে দূরে থাকলে শিশুর বৃত্তি, তথা মানসিক দিকের বিকাশসাধনের পথ নিকট থাকে না।

— — —

পুস্তক পরিচয়

[শ্রীমতী চন্দ্র দত্ত]

শিক্ষা (শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী শ্রীমতীচন্দ্র দত্ত লেনকপ্ত এম্. এ. বি. টি প্রণীত। পৃষ্ঠা ১০ + ৩৬০। মূল্য ৪। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা। সংশোধিত ও পরিমিত দ্বিতীয় সংস্করণ।)

আলোচ্য পুস্তকখানি নর্থাল ও জি. টি. ফুলের নতুন পাঠ্যপুঁঠি অনুবাদী রচিত। বাংলায় এই সুপাঠ্য প্রণয়নের অন্ত লেখক আশাশুকের বস্তুবাদের পাত্র। ইংরেজি পুস্তকের দ্বারা অধলবনে

রচিত হয় বলিয়া শিক্ষা বিজ্ঞানে বিবরণ অধিকাংশ পুস্তকের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ব ও কষ্টকল্পিত হয়। সম্বোধনীয় গ্রন্থের ভাষা কিন্তু সহজ ও সাবলীল। শিক্ষাদানার্থী ছাত্রছাত্রীরা এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। এই পুস্তকে শিক্ষামনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান পরিচালনা ও শ্রেণী পাঠনা, তিনটি বিষয়ে গভীর আলোচিত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আশা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

— — —

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক (নিম্ন বিনিয়োগ) বিভাগের প্রথম শ্রেণীর
পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত (বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি. ২০:১১৫০ প্রভৃতি)

কিডিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন স্তম্ভ প্রণীত

কথা-শেখা

মেগা বাব বর্ণাঙ্কমিত পদ্ধতিতে শিশুর, শিক্ষা দিতে যথেষ্ট সময় অপব্যয় হয়। অথচ
বাক্যাঙ্কমিত পদ্ধতি অসুসারে ছবি ও বস্তু দ্বারা অতি অল্প সময়েই বর্ণগরিচ ও বাক্যগঠন প্রণালী
শিখানো হইতে পারে।

‘কথা-শেখা’ বইখানিতে তিনটুকু আছে। দ্বিতীয় দ্বিতীয় দ্বিতীয় বর্ণগরিচ ও বাক্য গঠনের অল্প অল্পের
পঞ্চম ও সাদৃশ্যে ভিত্তি করিয়া মূলতঃ চার বর্ণবোজন্য করা চাইয়াছে। ফলে অতি অল্প সময়ের
যোগেই শিশুরা অল্প চিনিয়া সহজ বই পড়িতে পারিবে। গন্তাগতিক ভাবে যেখানে ছয় মাসের
শিশুর কিছু শিখানো যায় না সেখানে দুই মাসের শিশু নিজে নিজে সহজ বই পড়িতে পারিবে।

যুক্তাক্ষর বর্ণিত মতাবলম্বী, মন জোলাই হতা ও পাতার পাতার বর্ণিত ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য।
যান বাস্তব চৈতন্য আন।

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

অশ্বান

ভেজকর ও বলবর্ধক

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন



অশ্বানের মিশ্রমিত দেবনে

যৈমল্লিম কল্প পূর্ণ হইয়া

গেহ ও মন ভেজোদৃগু হয়

বেঙ্গল কেমিক্যালস

কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শিক্ষা

এ হি কল্যাণকর কলিত্ব দুর্গতিং ভাঙ গচ্ছতি

১০ম বর্ষ

চৈত্র ১৩৫৮

৫ম সংখ্যা

আলোচনা

সর্বোদয় সম্মেলন

সম্রাতি কানী হইতে ২০ মাইল দূরে সেগাপুরী গ্রামে সর্বোদয়ের বার্ষিক সম্মেলন হয়। ভারতের সকল গ্রামে হইতে গঠনমূলক কর্মীরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। আচার্য বিনোবা ভাওর কৃষিদান দত্ত এই সম্মেলনের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। আচার্য বিনোবাজী গান্ধীজির সঙ্গে বহুবার কাটাইয়াছেন, গান্ধীজির গঠনমূলক কর্মসূচায় তিনি একান্ত বিশ্বাসী। কিন্তু আজ যে পরিস্থিতি নিচে তিনি ভারতের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ দূরে দেশান্তরে ঘুরিয়া ক্রিয়াক্ষেত্রে সেই পরিস্থিতিটি বুঝাটুকরি ও বিশ্বকর ব্যাপার। সম্পূর্ণ অহিংস পন্থায় ভারতের জুনি সমস্ত সমাধানের এই চেষ্টা মানবের ইতিহাসে নূতন। ইহাও সাফল্য যে মহান বিপ্লব সৃষ্টি করিবে তাহার দিকে সমগ্র দেশ বিশ্বাসে চাওয়া আছে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া আচার্য কৃপালানী বলেন যে, সর্বোদয় কর্মীকে জনসাধারণের সকলের সঙ্গে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। খাতি, বস্ত্র, আশ্রয়ের অভাব

হইতে দেশবাসীকে কি ভাবে মুক্ত করিতে পারা যায়, শিক্ষার আলোক ঘরে ঘরে কি ভাবে বিস্তার করা যায় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে সর্বোদয় কর্মীকে। তিনি বলেন, গান্ধীজির উপর প্রতিষ্ঠিত এই অহিংস ও শ্রেণীহীন সমাজ ক্যাপিটালিজম, কমিউনিজমের অভিমান হইতে দেশকে মুক্ত করিবে।

সর্বোদয়ের কর্মসূচী

সর্বোদয়ের কাজে নবী দ্বিতীয় উত্তরের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বোধ প্রাণত করিয়া ক্রমশ উচ্চতর করিয়া তুলিতে হয়। জনসাধারণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ মানের জীবন গাত্রার বিষয়তা ও নিয়ন্ত্রণতা বনোদের হৃদয়ঙ্গম করা চাই এবং কঠিন জম ও সমাজের প্রতি কঠোর সম্পাদন ব্যক্তিকে প্রচুর লাভ অন্নাৎ, এতদ্বা সর্বোদয়েই বুঝিয়া চলা চাই। বেচ্ছাও ত্যাগস্বীকার, ব্যয়িত্র ও সর্বজন জীবন ধাপনকে ত্রুত বস্ত্র প্রদান করিতে হইবে। সর্বোদয় নীতির সঙ্গে যোগবিনের আনন্দি দিল্ লার্ট (নিয়ন্ত্রণের প্রতি দ্বার বিচার) নীতি তুলনীয়।

এই নীতি বিলম্ব করিলে আমরা দেখিব যে, সর্বোত্তমের কর্মপটীর সঙ্গে শিক্ষার কথা ওস্তাদে ভাবে জড়িত। দেশবাসী যদি এই নীতিতে আস্থামান হয় তবে ইহার কাজ তো আরম্ভ করিতে হইবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে। বাল্য ও কৈশোরে মাতৃবৎ যেমন শিক্ষা পাইবে তাহার চরিত্র ও জীবনদর্শন তেমনই ভাবে সজ্জা উঠিবে। শিক্ষার মধ্যেই সেই বীজ বপন করিতে হইবে যাহা ক্রমে অঙ্কুর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শোভন সমাজপেহ রচনা করিবে।

ভারতে কারিগরী শিক্ষা সম্প্রদায়ের আবশ্যিকতা

সং ১০ই এপ্রিল কলিকাতার নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা পরিষদের পূর্ব আকলিক কমিটির এক অধিবেশন হইল। দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র শিল্প বিস্তারের কথা ইহাতে আলোচনা হয়। ইহার অন্তর্গত কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা। এই পরিষদ আলোচনায় যে বিশেষজ্ঞদের উপস্থানের সাহায্যে কারিগরী কার্যের অন্তর্গত প্রচেষ্টার শিক্ষাগত উদ্ভাবিত হইবে। প্রযুক্তিগত শিক্ষা দিবার এক পরিকল্পনাও এই সম্মেলনে আলোচিত হয়। প্রযুক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা আবশ্যিক। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ বাহ্যতে বেকার না থাকে, তাহাদের যোগ্য কাজ পাইয়া লব্ধ জ্ঞানের সমাবহার করিতে পারে তাহার বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধবোধের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে আছে, সেই প্রতিষ্ঠার বিকাশ ও দেশের কল্যাণকর প্রচেষ্টায় তাহার নিয়োগ এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন দরকার।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

বিগত ১১ই, ১২ই এপ্রিল শিলিগুড়িতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন উদ্‌ঘাটিত হয়। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক

সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন দাখিলিঃ এর ডেপুটি কমিশনার শ্রীকৃষ্ণাকান্ত সেন। অডার্বার সন্থিত নতুন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকান্তোদয় গুহ প্রতিিনিধিদের বক্তৃতিতে বাগত সভাপন জানান। শিক্ষা সংস্কৃতি সাধারণ সভাপনত্ব করেন অধ্যাপক প্রিয়ব্রজ সেন। প্রায় চার পাঁচ শত প্রতিিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিক্ষার প্রতি গুরুত্ববোধের উদ্‌ঘাটন, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত বৃত্তির দাবী, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রভৃতি বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু বলেন যে পৃথিবীর সমস্ত বাসীনে দেশই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে, আমরাও যদি ঐ ব্যবস্থা না করি তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভাষার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগ্রিত হয়, আর ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সজাগের কার্যে শিক্ষকের দায়িত্ব কম নয়। দেশকে যত করিতে হইলে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রগঠন শিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। শিক্ষা ব্যর্থ হইবে যদি শিক্ষক এই ভারি বহন না করেন।

আমরা অধ্যাপক গুহ মহাশয়ের অতিভাষণটি শিক্ষার এই সংখ্যায় মুদ্রিত করিতেছি। এই ধরনের শিক্ষক সম্মেলনগুলির উপস্থাপিতা সময়ে কাহারও সংশয় নাই। পরস্পরের চিন্তা, কথন ও ভাবধারার আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষকের মধ্যে একটি যোগ সূত্র রচিত হয়। আগকের দিনে শিক্ষাদানের কালে এক ছাত্র ব্যাপারে ঝগড়াইয়াছে। অনেক ঘটনা সমস্তা শিক্ষার জীবনকে প্রতি পদে বিকৃত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফুলিতেছে। পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ফলে পথের নিদান পরিষ্কার হয়, কাজে প্রেরণা জাগে। নিজেদের অভাবগুলিকে যেমন

স্বল্পে তাহা বাক্য করা সম্ভব হয় যেমনই আবার অত্যন্ত অভিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে সাধনার ক্ষেত্রে তাহার দিকে সম্মিলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়। যশের মিলিত দ্বারা বেশীদিন উপেক্ষিত থাকিতে পারে না, আমরা আশা করি এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি অমূল্য ভবিষ্যতে কার্যে পরিণত হইবে। শিক্ষাধারার মূতন প্রাণ সকার হটক, শিক্ষকের ত্রুত শুদ্ধ হটক, যশের সুবৃত্তি প্রকৃত শিক্ষার উৎস হইয়া সমাজের কল্যাণ করক, তবেই এই সব শিক্ষক সম্মেলনের সার্থকতা।

জাতীয় মহিলার কৃতিত্ব

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী কুমারী কল্যাণী বাসবন আমেরিকার ব্রিন ম্যে (Bryn Mawr) কলেজের ১৯৪২-৪৩ সনের দেয় ১,৭০০ জনারের বৃত্তিটি পাঠ্যকালে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এই মহিলা কলেজটি বিশিষ্ট বিনোদী ছাত্রীদের তত্ত্ব বৎসরে একটি বা দুইটি এইরূপ বৃত্তি দেন। এই বৎসর এই বিশেষ সম্মান আমাদের জাত্যভ্যেই একটি মেয়ে পাওয়ায় আমরা গৌরব বোধ করিতেছি।

কুমারী কল্যাণী গিনিফর কেমব্রিজ পরীক্ষার সমগ্র স্বাধ্যয়নের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পর গত বৎসর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষার ইকনমিকসের তত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত সূবর্ণ ও রৌপ্যপদক পান। ইনি বিতর্কমূলক প্রতিযোগিতায়ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার পান।

বাঙালী মেয়ের কৃতিত্ব

যেখান কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা কুমারী রমা নিয়োগী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ডক্টরেট ডিগ্রী

লাভ করিয়াছেন। ইহার পবেষণা পত্রের পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ বি, দি, সেন ও ডাঃ আর, এস ত্রিগাঠী। কুমারী রমা নিয়োগী এই কৃতিত্বে আমরা পৌরব বোধ করিতেছি।

অম্বনগর বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ

সম্প্রতি অম্বনগরে বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অত্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ের মত ইহাওও অনুষ্ঠানটি বেশ সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের সম্পাদকের অভিভাবধানে ছুই একটি কথা বেশ ভাল লাগিয়াছে। সম্পাদক মহোদয়ের মেয়েদের কাছে জাতীয়তা বোধ সবচেয়ে উপদেশ দেন। পশ্চিমের অগ্রকণ্ঠে আমরা অনেক কিছু এককালে করিয়াছি, তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান যোগ পবে পদে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমাদের আচার আচরণ এখন কি ন্যায়বোধের আদিবাছিল অল্প অগ্রকণ্ঠের চেয়ে। বাঙালী মেয়েদের নামে “মিস অম্বক” লেখার রীতির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খ্যাত এই ভাব করিয়া আশিতেছে, আমরা নিজেদের ‘শুভিমা’ পাইতেছি, কিন্তু এখনও সমাজে এষ্ট পশ্চিমের অগ্রকণ্ঠ দেখিয়া হঃস হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘মিস ইতিহা’ নির্বাচন নামক রূপপ্রদর্শনীর উল্লেখ করেন।

এই সব বাৎসরী প্রতিযোগিতা আমাদের বর্জন করা উচিত। ভারতের রমণী অল্প পরিবেশে শোভা পাইলেই মানায়। বাল্য কণ্ঠের চেয়ে অল্পের সৌন্দর্য আমাদের চোখে অধিক মূল্যবান। আর যদি আত্মজাতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অঙ্গই বাহিতে হয় তবে এমন মেয়ে বাছাই করা উচিত যিনি নতাই ভারতের আদর্শকে বিশ্বের সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার যোগ্য, জাতীয় জীবনে বাহার সত্যই কিছু অবদান আছে।

বঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার

[ডাঃ কল্যাণী মল্লিক]

আজ বাংলার মহাশক্তির প্রতিপত্তি শিক্ষিতা নারীর সমাবেশে। কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও যে নিরক্ষরতার নিদর্শন দেখা যায়, একসময়ের সমগ্র বাংলাদেশের নারীদের সম্মুখেও তাহাই ছিল মতা। ঘেরেঘের লেখাপড়া লিখাইলে তাহারা বিধবা হইবে এক কুমন্ত্রনা দিবে, এই বিশ্বাসে তখনকার সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন অমিহীর নিজ কস্তাকে তাহার উদ্ভিষ্ট অমিহীরে সেবিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাল গোপনেই নিতেন; সমাজেও শিক্ষিতা নারী যেরূপ পণ্য হওয়াতে এ বিবর গোপনেই থাকিত। একমাত্র সমাজের নিয়ন্তরে পণ্য বৈকল্য ও নষ্টকীরের লেখাপড়া দেখায় অধিকার ছিল। ইহাই ছিল প্রাচীন স্ত্রী-শিক্ষার রূপ। উন্নতিশীল মতাবলীর প্রধানেও স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। তবে কোন কোন মহিলা আত্মগোষ্ঠে যে 'সামান্য' 'মহাভারত' পাঠ করিয়া প্রতিবেশিনীদের সুনামেই পারিতেন না বা বাংলার নিধিতে ও লংসারের হিমার রাধিতে পারিতেন না এমন নহে। কেহ কেহ নিজের অধিদায়ী কামকর্ম বেশ ভালরকমই বুঝিতেন। বাংলার রাণী তবানী, হাতী বিভাগভার, কামদুন্দুগী দ্বান্দুগী দর্শন, জায় ও ব্যাকরণ নামের বৃত্তপতির কথা কে না জানে? তথানি বাংলার স্ত্রী-জাতির অধিকাংশই নিরক্ষর ছিলেন, একথা বলিলে ভুল কলা হইবে না। ইহা সম্বন্ধে বাংলাদেশের নারীদের শিক্ষার দেকালে বাংলার গৌরবের বিষয় ছিল। কান্দুরী আমিরারের জায় হুম্বর হুম্বর নমুনার কাপাটেরি, বিচিত্র বকমের বস্ত্র ও আচার তৈরি, নকশ দিয়া গুণারি হইতে ছোট ছোট

বেলনা তৈরি, কুমড়া প্রভৃতি আনাও হইতে নকশের সাহায্যে টালাকুল প্রভৃতি হুম্বর হুম্বর কুল তৈরি, দাজি সাজানো, মাখন দিয়া মাছ, প্রভাপতি প্রভৃতি গড়া, বস্ত্র সূতা দিয়া নানাবকম হুম্বর কুলপাতার নক্সা তোলা প্রভৃতি কাজে তাহারা নিচুহস্ত ছিলেন। সূতাকাটা, পৈতা তৈরি, যেতের চূপড়ি বোনা, চূলের গুহি তৈরি সেতালের গৃহিনীদের নিত্যকর্মের মধ্যে পণ্য ছিল। প্রাচ্যনে হুম্বর আলপনা দিয়া গৃহদেবতাও পূজা, সম্রাট প্রদীপ হতে বহুদেব মূলেপিত ভুলনী তলায় প্রণাম, বাংলার নারীর বর্ষ ও নৌদর্শনজানকেই তাহাদের কথা বিশ্বাস সম্মুখে বহুদেব করিয়া তুলিয়াছিল।

দেকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কোন কোন প্রভাঙ্গ বিজ্ঞান্য মেধেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হইলেও সম্রাট পরিণামের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার অকুশলন সম্ভবশীলতার নিদর্শন ছিল। কলে জোড়ানাকো ও পাণ্ডুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে, শোভাযাজারের রাজপরিবারে, শোভার রাজা বৈকনাথ যাজের পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয়। শিক্ষিত্রী ছিলেন সেই সমাজের নিয়ন্তরে পণ্য 'বৈকব ঠাকুরাণী'। মর্বি বেবেস্ত নাম ঠাকুরের এক কস্তা বিদ্বানী বর্ষহুম্বারী দেবী বহু বৈকব-ঠাকুরাণীকে দেখেন নাই, কিন্তু কাকীমাদের নিকট তাহাও অকুশ কবকতা কবতা, মেধদেবীর বর্নন প্রভৃতি শুনিয়াছিলেন। অকুশুয়ে লেখাপড়া সম্বন্ধে বর্ষ-কুম্বারী দেবী লিখিয়াছেন, "আমাদের অকুশুয়ে দেকালেও লেখাপড়া মেধেদের মধ্যে একটি নিত্য-নিয়মিত ক্রিয়াক্রটান ছিল। প্রতিদিন প্রাতে গয়লানী যেমন হুঙ গইরা আদিত, মালিনী কুল

যোগাইড, বৈকুণ্ঠাক্ষর পাণ্ডি-পুঁথি হতে বৈদিক তত্ত্বসমূহ বর্ণিত আদিত্যম, তেমনি প্রানবিশুদ্ধা তত্ত্বলনা গৌরী বৈকুণ্ঠ ঠাকুরাষ্ট্র বিজ্ঞানলোক বিস্তরণার্থে অস্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিত্যম্ সাত্ত্বিক বিজ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। সাত্ত্বিক ভাষায় ইহার বর্ণনায় বৃৎপতি ছিল, অতএব বাংলা ভাষায় জানিতেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণ ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপ্তি না থাকিলেও, এইভাবে বিশেষ বিশেষ পরিধায়ে শিক্ষার ব্যাপ্তি ছিল। বর্ণহুমায়ী নিম্নের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “পঞ্চবর্তীকালে আশ্রয়ী ভাষায় (মহাবীর) শিশুশিক্ষণ বাংলা শিক্ষার সহিত সংকৃত ও শিক্ষা পাইতাম, অনিচ্ছা পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করিতে শিখাটেন। ভাষায় বিদ্যাহিত্য কল্প ও পুস্তকবৃদ্ধিগকে ভালরূপে বাংলা ও সংকৃত শিক্ষাপ্রাপ্তের জন্য তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজী শিক্ষার জন্য বৈদ্য নিযুক্ত ছিলেন।” বর্ণহুমায়ী আরও লিখিয়াছেন, “বেধুন স্কুল স্থাপিত হইলে তিনিই সর্বপ্রথম ভাষায় দুইজন ছাত্র-শ্রী ও কোষ্ঠাক্ষর পুস্তকীয়া শ্রীমতী সোণামিনী দেবীকে স্কুলে প্রেরণ করেন।”

স্ত্রী-শিক্ষার সহিত শিল্প ও শোভনভাষক পরিজ্ঞানে নারীদের শোভিত করিতে মহাবীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। যোগাই হইতে ভাষায় যেহ পুস্তকবৃদ্ধি করিয়া মহাবীর অগ্রকরণে অনুপ্রাণিত পরিজ্ঞানে যেনে কবিতা, বেশ সম্বন্ধে মহাবীর কোষ বিস্তারিত, তিনি পুস্তকবৃদ্ধি দুইটি বহুল্য অলঙ্কারদ্বারা সম্বন্ধ করিলেন।

সেকালের অস্তঃপুরস্থানিনীদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিল্য, বলা বাহুল্য প্রকৃত্তে নৃত্যশীল কল্প বহুদেশে নারীদের নিবিষ্ট ছিল। কিছু ভাষান্তরে অস্ত্র বিবাহ উৎসবে বা মন্দিরে পূজা উপলক্ষে মহিলাদের যথো নৃত্যশীল প্রচলিত ছিল।

ক্রমশঃ বর্ণীয় সমাধেয় ও স্ত্রী-শিক্ষার কিয়দংশ পরিবর্তন ঘটিল তাহাই বলিব।

বহুতপস্কে বেধুন স্কুল স্থাপিত বহুপূর্বেই এদেশে কতকগুলি ঐষ্টানদের বালিকাশিক্ষালয় হয়। ১৭৩১ সনে প্রথম Charity School। তারপরে ১৭৪৮ সনে এক স্কটল্যান্ডদেশীয় অর্থে ভাষায় পাত্রী দ্বারা অনাথা মেয়েদের জন্য এক স্কুল খোলেন। মির্জাপুর, ক্লাইট স্ট্রীট প্রকৃতিতেও মেয়েদের স্কুল ও বোর্ডিং ছিল, ভাটগড়ে লিখনপটন, পণ্ডিত ও পুণ্ডিত শিক্ষা দেওয়া হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন কোন অবসরপ্রাপ্ত পুরুষেরা ভাটগড়ে স্ত্রীদের সহযোগিতায় বেশী ঐষ্টান ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকটি স্কুল খোলেন। এইখানে বাইবেল পাঠ, অভিধান মুদ্রণ, পণ্ডিত শিক্ষা ও লিখন, শিক্ষার অঙ্গ ছিল। একদিনে এইরূপ নয় স্কুল, অনাদিকে শ্রীমামপুর মিশনের দ্বারা ১৮১৭ সনের মধ্যে কয়েকটি স্কুল খোলায় ইতিহাস পাওয়া যায়। শ্রীমামপুরের হিন্দু ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন; এবং বালিকাশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠাও মিশনারীদের বিশেষ সাহায্য করেন। ‘সমাচার বর্ণন’ ১৮২৪ সনে শ্রীমামপুরের ছাত্রদের পরীক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২৮ সনের মধ্যে ২৫-টি ছাত্রীকে শ্রীমামপুরের ১৩টি স্কুলে ভর্তি হইতে দেখা যায়।

কলিকাতায় ১৮১২ সনে মিশন কর্তৃক ‘কিমেল-স্কটল্যান্ড স্কুল’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রীদের মধ্যে অভিভাবকের কোনো লক্ষণ ছিলনা, ভাষা, কাছ, বৈকুণ্ঠ ও বাগদী সব একত্রই পড়িত। এই স্কুল বিভাগে ব্যতীত কলিকাতায় বিভিন্ন অকলে আরও বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়, যথা লিটারপুল স্কুল, বামিহোম স্কুল ইত্যাদি, এবং যেমন গোবিন্দ স্কুল, সেন্টরন স্কুল ইত্যাদি।

এইসময় বাংলা প্রামোহন বাণ, বালা বালাকান্ত দেব প্রকৃতি স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করা কর্তব্য বোধ করিলেন। সংকৃত সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যাদি

হইতে নারী-শিক্ষার আবেগকৃত্য পুষ্টোক্ত উৎসব
করিয়া পণ্ডিত সৌরেন্দ্রনাথ বিদ্যালয় দ্বারা
'শ্রী-শিক্ষা বিধাৎক' প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাও বহু
প্রচার হয় এবং মিশনারী স্কুলে পাঠ্যক্রমেও ইহা
পড়ানো হয়। এই পুস্তকে শোভাবাহারের রাজ-
পরিবারের উল্লেখ আছে। শোভাবাহারের দ্বারা
স্বাধীকৃত হইয়া রাজবাটীতেই মিশন স্কুলের ছাত্র
ও ছাত্রীরা একত্রে পড়িত, ক্রমশঃ ছাত্রীদিগের
সংখ্যা দ্রুত বাবদ্য হইল। ১৮২৩ সনে ১০০ টি ছাত্র
ও মূলমাত্র ছাত্রী ছিল। ইহাও নৈতিকতা,
কুসঙ্গ, বানান শিক্ষা প্রভৃতি বাৎসরিকই পড়িত,
তখনও স্কুল সুলভে ইংরেজীও চলন হয় নাই।
পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে বাইবেল পাঠও নির্ধারিত ছিল;
তৎসহ স্কুলোপস্থিত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে
বাংলায় মাধ্যমে উন্নয়ন পড়াখোর প্রবন্ধে ছাত্রীদিগের
অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইল। ক্রমশঃ কলিকাতায়
বিভিন্ন স্কোলাইটি দ্বারা অস্তিত্ব বালিকা বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮২০ সনের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা
পঞ্চাশটিতে পৌঁছাইল। মোট ছাত্রীসংখ্যা তখন
৬০০ ছিল, পড়ীকায় উত্তীর্ণ হইলে তাহারা শিকি,
আধুনি ও গাড়ী পাইত।

এইসময়ে পোস্তর রাজা বৈষ্ণনাথ রায় "সেন্ট্রাল
স্কিমেল স্কুল" গৃহ নির্মাণের জন্য কুড়িহাজার টাকা
দান করেন, গৃহটি অষ্টাদশ হেক্টরও অধিক পূর্ব কোণে
বর্তমান। রাজা বৈষ্ণনাথের দ্বারাও শ্রী-শিক্ষার
পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি নিজে যেমত ব্যক্তি ইংরেজী
শিক্ষা করেন, এবং উক্ত স্কুল ১৮২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত
হইলে সেইখানে দাতব্যও করিতেন। ক্রমশঃ
বর্ধমান, কালনা, কান্দি, পাটনা, এলাহাবাদ
প্রভৃতিতে বালিকাবিদ্যালয়ের বিস্তার হইতে
লাগিল। তথাপি স্বেচ্ছা পয়সাভারের কল্যাণ

তখনও প্রকৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে বঞ্চিত
ছিলেন। মিশন স্কুলগুলিতে ছাত্রীদিগের আকর্ষণ
করিবার জন্য, ছাত্রীদিগের অর্থ বিবাহও ব্যবস্থা ছিল।
মিশন স্কুলে অস্তিত্ব বিদ্যের সহিত ক্রীড়াও পাঠ প্রথাটি
বিশেষ অঙ্গ ছিল, তাহার পরীক্ষাও লওয়া হইত।
এখানে মিশনারীরা দেশীয় ক্রীড়ান বালিকাভারের অঙ্গ
স্কুল গুলিতেও, তাহাদের বিদ্যালয় ছিল ক্রীড়াও বহুস্কুল
করার কলে হিম্মতজোয়া। নিজ নিজ গৃহে তাহার
প্রচার করিত। কিন্তু কলিকাতা দেখা গেল পাঠ-
লম্পানান্তে হিম্মতজোয়া প্রচারকার্য করিতেছে না,
তখন মিশনারীরা ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হইলেন, হিম্মতও
তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া বিরক্ত হইয়া
উঠিলেন। ফলে মিশনের কার্য মনুচিত হইয়া
আগিল। অতঃপর মিশনারীরা স্বেচ্ছা পয়সাভারের
মধ্যে যেতানমহিলাদের দ্বারা শিক্ষাদান ও তৎসহ
ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও তৎপর হইলেন, ইহাতেও আশঙ্ক-
রূপ ফল ফলিল না। তথাপি শ্রী-শিক্ষার প্রচার ও
তৎসহ বাংলাভাষার কিকি উন্নতি হিলাবে বিভিন্ন
মিশনের কার্য প্রবর্তন। উন্নয়ন পড়াখোর
প্রবন্ধের এইখানেই একপ্রকার সীমাবদ্ধতা।

অতঃপর দেখা যায় বঙ্গমহাভারের নব সেক্ষত্রিক
বহুবিধার নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও ধর্ম-
নিরপেক্ষ শ্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছেন।
ইহাওদের মধ্যে প্যাথীটিক মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-
পাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়, শিবচন্দ্র দেব, মহর্ষি-
বেংকটনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।
বাংলাভাষায় শ্রী-পাঠ্য পুস্তকেও একশও এইসময়ে
আময় হয়। বেংকটনাথের দ্বারা হিম্মতের আদ্য
অদ্যাত্মিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইহাতে ধর্ম-
প্রচারের উদ্দেশ্য না থাকায়, ইহা একটী নৃতন
অধ্যায়ের সূচনা করিল।

ক্রমশঃ

অভিভাষণ

(অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণাধীচরণ গুহ)

যে দেশায় শিক্ষক-দণ্ডীরা আস্যানে আপনারা এখানে উপস্থিত সেটা বর্তমান পশ্চিম বাংলার একটি ক্ষুদ্র জেলা; ইহার আয়তন ১৯২২ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা ৩,৭৬,৫০০। এটি বালিকা বিভাগের সহ ২১টি উচ্চ ইংরেজী বিভাগের উপর এই প্রায় ৪ লক্ষ লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে। মিলিগুড়ি এই জেলায়ই একটি মহকুমা সহর। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর হইতে ইহার লোক সংখ্যা বাড়িয়া একটি জনবহুল সহরে পরিণত হইতেছে। সহরে ৩টি ও মহঃসঙ্গে ৩টি উচ্চ ইংরেজী বিভাগের এই মহকুমায় মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাই নির্দেশ করিতেছে। তবে এক্ষণে জাংসাথ এই সশেলনের ব্যাপারে জনগণের স্বতঃ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করা যায়।

মিলিগুড়ি তথা তরাই অঞ্চলের আশ বিপ্লব দিন। প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এ অঞ্চলে ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থকরী বিস্তার প্রয়োজন কোন কালেই ছিল না, অ'জ স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্রই প্রাণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; সবাই তা'র যোগে আপ'ইয়া যাইতে হইবে এবং সেটা যে শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, জাতির সে চেতনাও জাগিয়াছে। তাই আপনাদের এখানে মিলন এত অর্থপূর্ণ।

ইতিহাস যেদিন স্মৃতি হয় নাই সে দিন হইতেই বাস্তব দেখিয়াছে সম্মুখ হইয়া কাজ করিলেই সমষ্টির উন্নতি। জ্ঞান, সাহিত্য, কলা বাহ্যে কিছু ক্ষুদ্র ও আনন্দপ্রদ, মাজুবেদ সমাজ সৃষ্টির পর হইতেই হইয়াছে। কিন্তু এই সকল যখন প্রাণ-শক্তির অর্থাৎ হয় তখনই সেই সম্মু ও সঙ্গে সঙ্গে

সমাজ দুর্গতির মধ্যে যায়। আমাদের দেশেই ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে, ইহার অন্য ভিত্তিদেশের ইতিহাসের পাতা খুঁজিয়াও প্রয়োজন নাই। আপনারা আর এক মহামনোনিকে অধিনায়কত্বের পাইয়াছেন; ইহাতে আশা হয় তাহার স্বতঃ উৎসাহিত প্রাণশক্তি আপনাদের এ প্রতিষ্ঠানকে পুষ্ট ও প্রাণবন্ত করিবে। আপনাদের কাধকে দায়িত্ব দান করিবে।

এ সম্মেলনে শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিতে লক্ষ্যে হয় তাহার কারণ দু'পক্ষে; তদুপ আনাদের বর্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে আপনাদের ঐচ্ছানুভূতি হইবে না আশা করি।

আপনাদের দেশের শিক্ষা সমস্যা যেমনই বিরাট ভেদনট কটিল। দুই শত বৎসর ইংরেজ রাজত্বের পর দেশের দুইভিন্নের লোক লিখনপঠনক্ষম; প্রকৃত শিক্ষিত যে তদ্বকন তাহার সংখ্যা নির্দেশ কে করিবে? জনসংসারণ অস্বাভাবিক যোগে আজকাল তাই দেশ অকাল-মৃত্যু, ব্যাধি, দারিদ্র্য ও তাহার সহচরদের লীলাভূমি। জনসংসারণকে জ্ঞানের আলো দেখাইয়া জাতিকে পশ্চিমালী আপনাদেরই করিতে হইবে।

সার্কেট কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় সমগ্র ভারতে ৩১২ কোটি টাকা ৪০।৫০ বৎসর ঘাসী খরচ করিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্ভবপর। তবে কি জাতি আগামী ৪০ বৎসর এ শিক্ষা বিস্তারের আশায় বসিয়া থাকিবে?

অপরদিকে দেশ উন্নয়নকালে যে সকল প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাদের কাধকরী করিতে হইলে বিদেশী ঋণের প্রয়োজন। এ'রা যে সিদ্ধান্তের স্বতঃ

আমাদের সঙ্গে কতকাল চাপিয়া থাকিবেন তাহাই
যা কে জানে? ইহা হইল এক বিকের সমতা।

পান্ডিত্য যেন বুঝিয়াছে চারু ও বিকলের
সবল্যের সাদৃশ্য যত বেশী হয় নিকাও তত স্পূর্ণ
হয়, যদিও পূর্বে আমাদের যেনে যে ব্যবস্থা ছিল
বর্তমানে তাহা নাই বলিলেও চলে। যেনে কয়েকটি
আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে সত্য, কিন্তু
তাহাও উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে এবং সেখানেও সঙ্গ
ছাত্রই শিক্ষকদের সঙ্গে বসিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ
পায় না।

পান্ডিত্য যেনে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ
করিয়া শিক্ষার সমস্ত স্তরেই চারুদের কাঙ্ক্ষণী শক্তি
যাচাতে উৎসাহ দেই তাহাদের ব্যবস্থা করা চাইবে।
আমি আমাদের দেশে ভাল চারু মানেই অকর্মণ্য
জীব। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িল।
আমাদের ছাত্রাবস্থায় একদিন নৌকার বেড়াইতে
বাইবার সময় দূরী তন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন
কৃতীছাত্র। বাঙ্গাল দেশের লোক আমরা, দাঁড়
টানার অভ্যাস অপ্রবৃত্ত আমাদের সবাই আঁচ।
বন্ধুদের ইচ্ছা হইল তিনটি দাঁড় টানেন কিন্তু দাঁড়
হাতে নিয়া কেবল ব্যাংগাটো অর্ধেক চাইতেও
জটিল। কিছুকণ চেষ্টার পর যখন তাঁহাকে দাঁড়
ধরিয়া হাতটাকে বুজাভানের যত দুগাঠিতে বলা
হইল তখন তিনি দাঁড়টাকে খানিকটা আরম্ভে
আনিতে পারিলেন। শিক্ষার অর্থ যে বাহ্যিক
ছাত্রশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সংস্কৃতি ও ইচ্ছা-
শক্তিকে নষ্টকারী করিয়া আমাদের উন্নতি করে
একটু বাহ্যিক শক্তিই তোলা তাহা যেন আমরা
জুনিয়া মিরাছি, আমরা জুনিয়া মিরাছি আমাদের
সংস্কৃতির গোড়ার কথা।

পান্ডিত্য অগতের মণ্ডনাক্রম ও ভোগের
অনুভব আরোজন আমাদের চক্ষু বদলাইয়া দিয়াছে,
ভোগৈকমর্ষক পান্ডিত্য আদর্শবাহু আতিতে

আতিতে বিবেক ও অবিবাসের সৃষ্টি করিয়া সারা
পৃথিবীর যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে সেখানে
শান্তি আনিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষাই
আমাদের দিতে হইবে। বড়ই পরিভ্রমের
বিষয়, কর্ম-শিক্ষা বা নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই
আমাদের নাই। আমাদের দেশ, উন্নতিবাহু, শ্রীতা
ভাগবৎ বাহু দিয়াও বামবাহু মণ্ডনাক্রম পাঠের
ব্যবস্থাও কোন শিক্ষায়তনে করা হয় না। অথচ
এ সব প্রায় যে জাতীয় জীবনে প্রাথমিক সফল
করিতে পারে মুখে বীকার করিয়াও কার্যত তাহা
আমরা উপেক্ষা করি। পান্ডিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান
স্বয়ং সুবিধার যে ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাও যেমন
লইতে হইবে অসম্ভবিক যে তাৎপর্য আমাদের
জাতীয় জীবনে প্রবাহিত হইতেছে তাহা ভাগ
করিলেও চলিবে না। যুগে যুগে বহিঃশক্তির
আক্রমণ প্রকৃতি নানা বিপদেও সমাজ গঠনের
মূলনীতি আমাদের পূর্ব পুরুষের জুনিয়া বান নাই
এবং সাময়িক প্রয়োজনে সমাজ-অর্থ যে পরিবর্তন
বাহিনীর তাহা বর্তনও করিয়াছেন। বহুকাল
আমরা সে কথা জুনিয়া মিরাছি, তাই আজ সমাজ-
শক্তির সৃষ্টিসম্ভব। একদল এই সবকেই আঁকড়াইয়া
ধরিয়া নিম্ন বলিয়া প্রচাৰ করিতে চান, অস্ত্রমল
ইহাকে বিলম্বিত দিয়া পান্ডিত্য ভাবে সমাজগঠন
করিতে চান। আমাদের এমন শিক্ষা প্রবর্তিত
করিতে হইবে যাহা জাতীয় তাৎপর্যবাহু পুই।

যুগকে হুটাইয়া জুনিতে যেমন আলো, বাতাস
ও অস্ত্রমল পরিপ্রভ দরকার, হুমুসাহমতি নিত্যের
সং-প্রকৃতি ভাগাইয়া জুনিতেও সেইরূপ পরিবেশ ও
বস্তুর প্রয়োজন। আজ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি
নাই। বেশীর ভাগ শিক্ষায়তনেই অগতের
আমরাই অববাহিনীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে ছাত্রদের
শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। “বাঁদী জুনিতেই যদি সব
সীম বরচ হয় তবে গাড়ী চলিবে কিসের জোরে?”

আমাদের বেশির ভাগ শিকারতনে ইমামের গড়িতেই সব টাকা খরচ হইয়া যায়, তার পর লাইব্রেরী, ম্যাগ, চার্ট ইত্যাদি শিকার অন্ত্যস্ত অপরিহার্য অর্থাৎ আর পুষ্টি লাভ করিতে পারে না; এ তিনটি অভিজ্ঞতা আমাদের শিকার মণ্ডলীর আছে। তবুও তাঁহারা যে এই প্রতিফুল অবস্থায়ও ছাত্রদের শিক্ষা দেন তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব ও অসীম বৈশেষ্য পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি আকাজিকত পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতেন তাহা হইলে শিকার ক্ষমতা উন্নতি হইত ইহা অনস্বীকার্য বল্য বোধিতে পারে।

কল্যাণলেন কৌলিঙ্গ প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন—জাতীয় ও জাতীয়ের মান জিবার ক্ষমতা, আর ইংরেজ রাজ শিকারতনে কৌলিঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন আমাদের ভিতর ভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের পার্থক্য সংরক্ষণের ক্ষমতা। আজ যদিও ইংরেজ নাই কিন্তু সহকারী ও বেসহকারী শুলের যে বিভেদ তাহা এখনও আছে। ঐহাঙ্গা ভাগা দোবে বেসহকারী শিকারতনে শিক্ষা দেন, তাঁহারা কি জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক এদেশের ছাত্রদেরই শিক্ষা দেন না? তবে তাঁহাদের অন্তরে এত বিভ্রম কেন? কত শক বলিবেন, শিকার ক্ষমতা তাঁহারা যথেষ্ট ব্যয় করিতেছেন—আর করা সম্ভবপর নহ। পেটা চরত ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীর বেতন—প্রাথমিক বিভাগের বাবাই দিল্লী—যথা ইংরেজী বিভাগের নিম্নতম শিক্ষকদের বেতনের ৫০/৬০ ভাগ। এতটা পার্থক্য অল্প কোন দেশে আছে কি না জানি না, তবে এটা নিশ্চয়ই দৃষ্টিকটু। আমাদের রাজ্যপাল তাঁহার বেতনের অনেকটাই বেছায় ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এ আদর্শ অস্ত্রের পক্ষে অস্বীকার করা কি একান্তই অসম্ভব? আমাদের আর কম, সে ক্ষমতা শিকার খাতে বেশী ব্যয় করা সম্ভব নহ, তাহার ক্ষমতা কি শুধু শিক্ষকদেরই ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে? অথচ

বাহার কিছুই নাই সে ত্যাগই বা করিবে কি? আর সে ত্যাগের মূল্যই বা কতটুকু? আর একটি লক্ষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে উপাধিবাহী শিক্ষকের বেতন সহকারী অফিসের চাপরাসীর বেতনের সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় যদি এ অসম্মতি মানিয়া লয় তবে অস্ত্রের চক্ষে সে উপাধির মূল্য কতটুকু হইবে তাহা নঃস্বার্থেই অনুমেয়। শিক্ষকদের ক্ষমতা দুর্বল এতই সম্ভব যে তাঁদের অবস্থা চিন্তা করিলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অশ্রদ্ধা অস্বাভাব্য। আপনারা অনেকেরই কৃতজ্ঞতাশ্রী অতএব এ কথা বাড়াইয়া লান নাই। দেশবাসী প্রত্যেকেই যদি এ অবস্থিত অবস্থা দূর করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন তবেই জাতির কল্যাণ সম্ভব।

ছাত্রদের মধ্যে কাজকাল যে উচ্চ, অসম্মত দেখা দিয়াছে তাহাতে শিক্ষাজগত সশঙ্কিত। কারণ ইহার কারণ বাড়াই হউক, ইহা প্রতিবাদ করিতেই হইবে। ইহার জন্য প্রচেষ্টা ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর লাহুত। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকেরই এমন অবস্থা যে ছেলে যেখানে যখন কৈশোরে উপস্থিত হয় তখন তাহদের মন যে খোঁজা ও আনন্দ চায় তাহাদের গৃহের পরিবেশে তাহা পায় না, ফলে বাহিরের লোকের মধ্যে তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়; এবং ইহা উদ্বেগজনক হওয়াতেই আজ্ঞা দেওয়ার প্রকৃতি দেখা দেয়। ইহাতেই তাহাদের দূর্বলতার বীজ রোপিত হয় এবং কিছুদিন পরে তাহাদিগকে উচ্চ, অসম্মত করিয়া তোলে। আমরা যদি প্রত্যেক গৃহের পরিবেশে ছেলেদের মনের খোঁজা ও আনন্দ দানের ব্যবস্থা করিতে পারি তবেই ইহা মূল্যেই নষ্ট হইবে। এদিকে আমাদের প্রত্যেকেই সচেতন হওয়া উচিত।

আমি বাহা বলিলাম তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন আমাদের দেশে শিকার কোন ব্যবস্থাই নাই। আমার বক্তব্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক অংশ আছে তাহা দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

এবিধে যে দেশের চিত্তাশীল লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার সাক্ষ্য শুক্লদল, বিশ্বভারতী ও এই জাতীয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উন্নত ধরনের শিক্ষা বাহ্যতে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই পহুঁছে পৌঁছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। শিক্ষা ক্রমেই ব্যয়শীল হইতেছে। আমাদের আর্থিক দুর্গতি ও শিক্ষার ব্যয় যে হাতে বাড়িতেছে তাহাতে তার দ্বা, সমাজের দুইমেধ লোকের অন্তর্গত শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। বিজ্ঞানের কল্যাণে হস্ত অব্যবহৃতভাবে টেলিভিশন সেট আরও উন্নত ও স্থলভ হইবে; তখন এই সেট কিনিয়া ঘরে বসিয়াই শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা সম্ভব হইবে এবং বাগান এই সেট কিনিবার মত সৌভাগ্যশালী হইবেন তাঁহাবাই শুধু শিক্ষা লাভ করিবেন। পাকিস্তান দেশে শিক্ষার ব্যয় আমাদের চাইতে ঢের বেশী কিন্তু সেট মেশিন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করিতেছে।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেডলে যখন শিক্ষার বাহন ইংরেজী হইয়া গিয়া কয়েক তখন হইতেই এ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইয়াছে, হুঃখের বিষয় আজও পর্যন্ত তাহার কোন স্থানান্তর ঘটিয়াছে না। লর্ড মেডলের মনে এসেছে সংস্কৃতিগত আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা ছিল কি না জানা নাই; তবে সে দিনেও তাঁর এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—উইলিয়ম অ্যাডাম। তাঁহার একুশের রিপোর্ট পড়িলে তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও এদেশের লোকের শিক্ষার অন্তরঙ্গ বোকা দায়। তিনি ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া প্রথমে পাঠশালার এবং পরে টেক্সের শিক্ষা সম্বন্ধে এক বিশদ রিপোর্ট দেন। শিক্ষকের উপযুক্ত বেতন না হিলে যে তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না তাহাও তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যবস্থাও রাখিয়াছিলেন। তাঁহার

রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয় যে বহুদূর কাছ হইলে দেশের হস্ত এ অবস্থা হইত না।

মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনরূপে কিছু দিন হইতেই চলিতেছে কিন্তু সব দেশেরা তদ্রূপ মনে হয় তাহারা এখবস্থা করিয়াছেন তাহাদের মনে যেন ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পণ্ডিত ও অন্যান্য কিয়ৎবাংলার লেখান করেবৎসর হইতেই হইতেছে কিন্তু প্রয়ত্ত হয় ইংরেজীতে। ইহার গুণ কারণ তাহারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁহাবাই জানেন—আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বহুদিন ধাব্য তদ্বিবেচনা পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া যে তাহাতে হাজারের জ্ঞানের পরিচাপ হয় না। বর্তমানে নব প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা পণ্ড কি সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? মনে ত হয় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। শিক্ষানীতি শিক্ষাবিদদের হাতে ছাড়িয়া না দিয়া রাষ্ট্রের হাতে রাখা যে ভাবনা কম তাহা পাকিস্তান জনগণে দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক মানব জাতির কল্যাণ ও আনন্দভিষ্ট অস্ত যে জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকেন, সেই জ্ঞানের শক্তি আর বাণক হত্যার অস্ত নিবৃত্ত। ইহার অনেকা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বর্ণ-বিষেব ইহা কি শাসনভয়েরই কল নয়? অবচ তাহারা এ শাসন তত্ত্ব চালাইতেছেন তাহারা যে শিক্ত নর সে কথা বলা চলে না। শাসনভয় যখন শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে তখন এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের দেশে শিক্ষার এক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও যে এদেশে মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, যাদব, মহামতি গোখলে, অন্নানন্দ কেশবচন্দ্র, চিত্তবন্দন, আচার্য বগবীন্দ্র, আচার্য প্রহ্লাদচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ ও অন্যান্য বহু মনীষি ও কর্মী

অভিযাচ্ছেন তাহাতেই যোক্ত্য বাব জাতির প্রাণ-প্তি এখনও নষ্ট হয় নাই। প্রকৃত শিক্ষা যখন জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে তখন এই ভাবভূমিই যে আবার বিশ্ববেশ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমান নেতিবাচক শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া, কর্মকুশল, আত্মনির্ভরশীল, চরিত্রবান জাতি, বারিষজ্ঞান সম্পন্ন ছাত্র সমাজ বাহ্যতে আত্মা পড়িয়া তুলিতে পারি, আমাদের প্রত্যেকেরই বখালাখ্য মে চেষ্টা করা উচিত। ওয়ারী পটিকল্পনা অল্পমানে কোন কোন সময়সীমা কাজ সাধন হইয়াছে সত্য এবং ইহার ফলে ছাত্রদের গুণগত শিক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের কার্যক্ষেত্র বেষ্টন ব্যাপক তাহাতে এভাবে শিক্ষার ব্যয় করা যিগেও সমস্ত জাতিকে শিক্ষিত করিতে বহু সময় লাগিবে। পাশ্চাত্য দেশে যেমন বাধ্যতামূলক সাময়িক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, সিটার নিবেদিতা সেইরূপ 'শিক্ষা কোয়' পড়িবার কল্পনা করিয়া ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত প্রত্যেককেই কিছুকাল শিক্ষাদান কার্বে বাধ্য করিলে এ সমস্যার আন্ত সমাধান সম্ভব। আচার্য অজেন্দ্রনাথও অল্পকাল প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান সমাজের আর্থিক অবস্থার ইহা কতখানি সম্ভবপদ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বিব্র করিবেন। এবিষয়ে আমরা প্রত্যেককেই অন্ততাবে কিছুটা কাজ করিতে পারি—বিশেষ বাহায়া নবীন শিক্ষাত্রী। পরমের দুটি বা ঐ জাতীয় অবস্থা সময় আপনারা ছাত্রদিগকে লইয়া শরীর চর্চা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ রচনা, বেশ বিশেষের শিক্ষার ব্যবস্থার আলোচনা, বিশ্বনাহিত্যের প্রেষ্ঠ রচনা পাঠ, হাতে কলমে জিনিষ পড়া (যেমন চিত্র বা মডেল) ইত্যাদি বিষয়ে এমন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারেন তাহাতে ছাত্রদের মস্তিষ্কের পরিচালনায় সহিত হাতে কলমে কাজ দেখা হয়। এই সমস্তকেই বাহাতে ছাত্রদের ইচ্ছাশক্তি ও

জ্ঞানশক্তির আশ্রয় বাড়ে দেখিতে লক্ষ্য রাখা উচিত। ছাত্র হইলে পুস্তকাদি বিতরণের মানবীও করিতে পারেন। ইংলণ্ড ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ব্যয়ভুক্ত প্রয়োজন নাই। যে বহু পরিমাণ অর্পণ প্রয়োজন, কাজ কলগ্রন্থ হইলে সেজন্য মানবীল বিজ্ঞানশাস্ত্রী বাস্তব অভ্যাস হইবে না। সংশোধিতার যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ হইবারও কারণ নাই বহু আশ্রয়বাহক যখন অবস্থা কম তখন আর সংশোধিতার চাইলে কাজ কর্তৃক তাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। মেধাধারীও এভাবে শিক্ষা দায়িত্বা যিভে পারেন। আপাত দৃষ্টিতে যেন হয় ইহার ফল কতটুকুই না হইবে। কিন্তু বৃহৎ এক জন শিক্ষকও যদি এভাবে কাজ করেন তবে ১০ বৎসর পর তাহার ফল দেখিয়া তাহা হইবে বিস্মিত হইবেন। ইহার নতির আশ্রয়বাহক মেধাধারী আছে। একজনকে মনে পরিচয়ের সৌভাগ্য মানা হইয়াছে এবং তাহার চেষ্টার ফল দেখিয়াই একথা বলিতে সাহস করি। আর এক জনকে আপনারা লকলেই জানেন। তিনি শ্রীমদ্ভক্তকনেরের গৃহী তত্ত্ব শ্রী, বাহায়া লিখিত বান্ধু কথামূলক লকলেই পড়িয়াছেন। তিনি নিজে শিক্ষক ছিলেন—ছাত্রদের যেন জানেন স্পৃহা বাড়াইয়া দেখা ও চরিত্র গঠন কবাই ছিল তাহার জীবনের ত্রুট। তাহার কত ছাত্র যে তাহার সংস্পর্শে আনিয়া উন্নত জীবন বাপনের সুযোগ পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করা যায় না। আমার বিশ্বাস বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীতেও এমন অনেকই আছেন বাহায়া আশ্রয়বাহক দৃষ্টির বাহিরে কাজ করিতেছেন এবং তাহাদের এ চেষ্টার ফল যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে গুহু, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের কাজের ফল দেখা যিবে। এরূপ আশ্রয়শাস্ত্রী, চরিত্রবান, জ্ঞাননিষ্ঠ, বালসংখ্যক শিক্ষকই জাতি গঠনের তিষ্ঠি স্থাপন করিবেন।

সহকর্মী নবীনদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ আছে। আপনারা আর আবেদন নিবেদন

‘আবুত্তি সব’শাস্ত্রানাং’

(ঐশ্বর্যবান্ধব মুখোপাধ্যায়)

কাব্যের আবেশম তার তাবের সাত্ত্বীর্ষে নর, যসের অনিষ্টতা, তাই যে মানুষ সহজাত রস-সংবেদনার স্বকিউ, তুর্ভাগ্য তার, সে কোনদিন পেল না যসের অস্বপ্নে প্রবেশের স্বক্ৰম অধিকার। সহজাত কাব্যপ্রীতি মনের কোরে আনে রস আর আনন্দ-স্বপ্নার আবেশ-উজ্জলতা, সে রসে মনের মাটিতে পোনা-ফলানো উর্বরতার স্তায়ল প্রভাব জাগে, অনির্বচনীয় মাধুর্যের যন্ত্রাচল নামে মনের উপকূলে। কাব্যের রস-মাধুর্যে আছে ‘লক্ষ্য-লক্ষ্য-সংবাদী’ ভাব বার ছোঁচোটে পাঠক আর কবির মনে হয় কোলাহুলি। এ অনির্বচনীয় রস-ধারার অতিবেক সত্ত্ব হযেছে বার জীবনে, সে ভাগ্যবান। রস-রসেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি নর, সে অভিব্যক্তির সার্থকতা অনেকখানিই নিউর করে ধনি মাধুর্য আর রীতি-প্রকৃতির উপর। তাই, কাব্যকে শুধু ‘বনাস্থকং বাক্যং’ বলেই চলে না, তাকে ধনিবাস্থক বা রীতিবাস্থক হতে হয়, তার গুণর আছে ছন্দ ও অলংকার। কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে এই সংকিষ্ট কুমিকাটুই নামনে বেবে পা কেলনে অস্তত পদে পদে ছোঁচটে বাওবার সস্তাবনা আর থাকবে না। কুখের কথা আমাদের বিদ্যালয়ে রস-সাধনার খুব স্পষ্ট কোনও উদ্দেশ্য না থাকার পদে পদে ছোঁচটে খেতে হয়, আর তাতে মনের অনেক খানি রসই বার উপচে পড়ে। তাই আমাদের ছেলেরা কাব্য পড়েও কবি হতে পারে না, রস-নির্ব্বোধ কাছে গিয়েও তুফা মেটাতে পারে না। তাই মানুষের অন্তরতম সত্ত্বার যে রসিক বিকটি, তা কোনদিনই আনন্দবহু বাস্তবায় আপনাকে প্রকাশ করতে পার না। অপ্রকাশের বেদনা, অনন্তরতমের নিফল আকৃতি মাথা কুটে

মরে তার মনের বাবে, বিশ্বের রস-বজ্রের নিয়ন্ত্রণে তাই আমাদের কটি নেই, শিল্পের মধ্যে শিল্পিতের সন্ধান আমরা পাট না। এমনি করে, কাব্য বা সাহিত্যের হাতে উজ্জ্বল কুড়িয়েই আমাদের কাটবে, না, অন্য কোনও সার্থকতা আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছে তা জানা প্রয়োজন। কাব্য পাঠের উদ্দেশ্য সত্ত্ব আমাদের রসিকতার সংস্কার আর সম্পূর্ণ ছাড়তে পারে বঃ কি না, বেধা থাক।

কাব্যের বহিঃক এং অন্তঃক পরিচয় ইতি পূর্বে সংক্ষেপে আনোচিত হযেছে, কাব্যের মূলে দৌন্দর্য আছে, এইটেই বড়ো কথা নয় তা জানি, তব, এইটেই যে তার কাব্যগুণের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিদ্যালয়ে কাব্য পাঠে এই এসপেকটিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি তো সত্ত্ব হযই না, তার উপর আবার শিক্ষাপত মূল্যের জিন্মদারিতে কাব্যের প্রাণ-রস বার নিঃশেষ হয়ে। কাব্য-পাঠে নৈতিক দিকটোকেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। কাজেই বেধা পের কাব্য পাঠের মধ্যে ‘educative, aesthetic and ethical value’ সব সময়ই নিহিত হযেছে—আমাদের বিদ্যালয়ে কাব্য পাঠের ক্ষেত্রে যে মূল্য সব সময় পূর্ণ সমর্থন পায় না।

কাব্য পাঠনার ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয়ের কাব্য-গত মূল্য উপলব্ধি অনেক সবচেয়ে সত্ত্ব। হযনা শুধু পাঠনা-গত শৈখিলোম জগুই। কাব্য পাঠের মূল লক্ষ্য সত্ত্ব হয ধারনা না থাকার সে লক্ষ্য পৌছবার পথটাও আজও একেবারে অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় নি। কল হযেছে এই যে, ছেলেরা পড়ে, পড়োকাও পাণ করে, কিন্তু তাদের মনের মাঝের রসিক মানুষটি উপহাসীই থেকে যায়। কাব্যের কংকালখানা নিয়েই তাদের

কারবার, রক্তমাংসের খোঁজ তামা পাবে কেমন করে? কিন্তু যশস্বত্বটির ক্ষেত্রে এই যে দর্শনিক স্বার্থতা এর জন্য দায়ী কি আমাদের অব্যাপন। পদ্ধতি নয়? সত্যিকার পাঠ সম্ভব না হলে যশস্বত্বটি বা উপলব্ধি কোনটাই সার্থক হবে উঠতে পারেনা। তাই সত্য আশে প্রয়োজন কাব্য পাঠের সার্থক রীতি সম্বন্ধে সচেতনতা, তবেই আসবে পাঠে অহুত্ব।

Good reading is half understanding
এ কথাটি শিক্ষা-মহলে খুবই পরিচিত, সম্বোধ নেই। সার্থক কবিতা পাঠে কল্পনা সহজ হয়, বোধের পরিধি পায় প্রসার, কচি পায় বার্জনা। আর অহুত্বের হয় উদ্বোধন। শিশুর মনের লহরিতে সৌন্দর্য লিঙ্গা সার্থক কাব্য পাঠে খুঁতে পায় আপন সিঁড়ির পথ। কাব্যের রাজকন্যা যখন ছন্দের নৃপুত্র পারে, সর্বাঙ্গে অলংকারের তোলুপ লাগিয়ে, রূপ-রসের লহরী তুলে শিশুর অন্তরতম মাহুটটিকে নাড়ানোর, তখন সে তার হাতে নিজেকে নিঃসর্ত হয়েই দেয় বিলিয়ে। সে রাজকন্যার মন-কেন্দ্র-করা হাতছানিতে উলানী শিশুর ডাবুক মন তখন কল্পনার নাগরমোলায় স্থানকর কোলানো পালংকে গা-এলিয়ে ঘিরে উখাও হয়ে যায় উদ্বেগহীন অচিন পুণ্ডরীক সন্ধান—তখন তার 'নিমন্তন লোকে লোকে, নব-নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে'। এট সর্বচেতনা মুক্ত আবেশময়তা যদি না আসে, এই সব-ধোধানো নেশা যদি না পেয়ে বসে, তবে কাব্য পাঠের সার্থকতা কোথায়? তবে, একথা ঠিক, এ রূপ-চেতনার উদ্বোধন একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য চাই নৈশব থেকে যৌনে পর্যন্ত একটানা সাধনা আর সে সাধন-ক্ষেত্র, সে এসুখটিক পরিবেশ সৃষ্টিতেই তো। দ্ব্যর্থ সাহিত্য শিক্ষকের সার্থকতা।

শিক্ষক এ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, এ রূপ সংবেদনা জাগানোর জন্য প্রথমেই পয়শ নেবেন স-যব পাঠ

বা আবৃত্তির। আবৃত্তি যে 'পর্বদাত্তানায় যোধ্যা যপি সযৌগী, তাতো বহুপ্রচলিত প্রবাহবাক্যে পরিণত হয়েছে। 'আ-বৃত্ত+স্তি'—এভাবে বিশ্লেষণ করলে, এর অর্থ দাঁড়ায় 'অভ্যাসের নিমিত্ত বারবার পাঠ'। এককালে ঋতি আর বৃত্তিই ছিল শিক্ষা যানের সেরা উপায়, তখন থেকেই অপরূপ আবৃত্তি অংশ বৃত্তিতে বাহন করে যাবার জন্য সাধনা শুরু হয়েছিল শিষ্য মহলে। আজও ছেলেরা পাঠ করে, কিন্তু তাকে ঠিক আবৃত্তির পর্যায়ে কেনা যায়না, তাতে না থাকে ছন্দ-বক্তব্য, না থাকে স্বরের আয়োজ্য অব্যোহ না থাকে মাদুর। কলে তাদের পাঠ অর্থহীন পুনরাবৃত্তিতেই পরিণত হয়—একটা একঘেরে সুরের (Sing Song) অহুত্বভিত্তে স্রোতার মনে বিঘটিকা বহির্বে দেয়। আজকের বিদ্যালয়ে কবিতা পাঠ শুধু একটা দায় সাধা কাজে পরিণত হওয়ার আবৃত্তির আর চিহ্ন দাঁড় খোঁচা যায় না। কেন এমন হলো আর কি করলে স্বকল পাওয়া যাবে, সেটাই চিন্তার বিষয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের শৈথিল্য এই অব্যপত্তনের জন্য দায়ী। আন্তরিকতাহীন নীরপ সাহিত্য পাঠনার যিনের পর দিন ছাত্রদের রসের উৎস আসে শুকিয়ে, উপরওয়ালার কাছে ভালোয় অল্প তাগিদ না পাওয়ার ভাল করার প্রেরণা টুটুও ছাত্ররা হাবিবে ফেলে। শিক্ষকে এর জন্য মাসুলও কম দিতে হয় না, এই সেদিনও একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শ্রীবীরেন কবির মশাই ছাত্রদের ঋতিপূর্ণ উচ্চারণ ইত্যাদির জন্য শিক্ষকেরই ঘোষারোপ করলেন। এ-চূর্ণাম কাটাতে মেলে প্রথমে আমাদের শুধু পাঠাংগের মঠ, পাঠের প্রতি অবহিত হতে হবে। পাঠ উচ্চারণ, ছন্দ, তার ইত্যাদির বাজনা, স্বরের উত্থান পতন, ব্যতিক্রম বিধির প্রতি সচেতন বৃত্তি—এগুলির উপর ভোর দিতে হবে। শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পর ছাত্রগণ সমন্বয়ে আবৃত্তি করবে—শিক্ষক ভাল ঠিক যাবার

অন্ত সচেতন হইবে। হয় তবে পড়া কোন অবস্থাতেই চলবে না।

ভার্যপন পাঠ্যভিত্তিক বিষয়ে নজর দিতে হবে। অনেক সময়েই বিষয় নির্বাচনের সময় পাঠকের বয়স বা কটির দিকে দেখা হয় না, ফলে শিশুদের অন্ত নির্বাচিত হয় কবিতার 'সুতীক্ষ্ণ' ও 'প্রম' আর বয়সের তত 'বীরপুত্র' ও সত্যেন মতের 'সুখ'। পাঠ্য বিষয়ের কাব্যিক সমৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দিতেই হবে। এ সম্বন্ধে Matthew Arnold-এর আলোচ্য মন্তব্যটুকু অধিব্যাহাঙ্গা, "That the poetry chosen should have real beauties of expression and feeling, that those beauties should be such as the children's hearts and minds can lay hold of." ছাত্রদের ধারণা ও উপলব্ধির কমতা সহজকৃতি সহকারে বিবেচিত হওয়া চাই। কি পড়া হবে, তা ঠিক হলে তবেই কেমন করে পড়া হবে, তা ঠিক করা সম্ভব।

আবৃত্তি কালে ভাবের প্রকাশ কোন সময়েই আদিক হবে না, বাচিক হওয়া চাই। অকৃতকীর সকালন অর্থাৎ নাটুকেপনা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বড় দোষ। খুব বীরভাবে ছেদ, বস্তু ঠিক রেখে, ছন্দ-মাদুর্বে প্রাতি অবহিত হয়ে নির্দিষ্ট অংশ নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করতে হবে। স্বরের ওঠা-নাচা এবং বাচন-কীর বৈশিষ্ট্য আবৃত্তিকারের বড় 'qualification.' আবেগ থাকবে, তবে নেই।

সেইটেই দর্শন হয়ে উঠলে বিপদ। শুধু খুবই দল্য আর আবৃত্তি করাত এক নয়, 'Recitation should be indistinguishable from impromptu oratory.' পাঠের প্রাকলতা, দর্শন, ছন্দ-মাদুর্বে, এগুলি বখাষক অনুসরণ করলে আবৃত্তি সার্থক হতে পারে। বিদ্যালয়ে পাঠনার সময় যদি এদিকে মনেই অবহিত হবার অবস্থিতি থাকে, তা হলে একটি 'পাঠ-চক্র' বা বন্দ-চক্রের প্রবর্তন করে প্রাতি পনিবার মেখানে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অনেক সময়েই ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি উচ্চারণ-গত বিকৃতি দেখা যায়, যা শিক্ষকের সামান্য সচেতনতার সহ পূর্বেই সংশোধিত হতে পারে। 'ক' কে 'ব' বা 'ব' কে 'ক' উচ্চারণ—'এ' ফলা উচ্চারণে বিভ্রাট, 'সমান' কে 'সমনান' 'বাকি' কে 'বাকি', আবৃত্তি কে 'আবৃত্তি'—এইসব দোষ সহজেই পোষানো যায়। ভার্যপন ছন্দ-জ্ঞানের অভাবও মর্মান্তিক।

'আবৃত্তি' শুধু পড়াই নয় না, অনেক দল আছে যার মধ্যে কাব্যিক উপাদান থাকে। বীরজনাথের 'লিলিকা' বাবাবরের 'পুষ্টিপাত', অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' পদ্যসম্মেলন 'শ্রীকান্ত' বা বক্তিরের 'কমলাকান্ত' এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে চললে হুঁ আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ছাত্রের সত্যকারের মাহুদ হবার সুযোগ পাবে, সন্দেহ

পুস্তক পরিচয়

[ত্রিভুজবিন্দু বসু]

Activity methods for children under Eight with a Foreword by Lillian do Lessa. Pp. 280. Evans Brothers Limited.

বাংলায় চিত্রচিত্রিত প্রথা পুর্বিগত বিজ্ঞান মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা পরিচালনে অগ্রগত, তাহারা Activity methods নামে শিশু শিক্ষার যে নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইতেছে তাহার কাৎক্ষাত্তিতা সম্বন্ধে বঙ্গাবতঃই সম্ভেদ প্রকাশ করেন। শিশু চকল চিত্র চার কাগজ করিতে। মূল ধর্মের বহু হাওরার তাহার মন হাঁপাইবা উঠে। শিশু চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিশু মনো-বিজ্ঞানের পুর্বি পড়িবার প্রয়োজন হয় না। শিশু-বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিত্রৌরাও শিশুর বিকাশের চিন্তায় এই চকল পতি লক্ষ্য না করিয়া পাতেন না। তবু যে তাঁহারা শিশু-শিক্ষার নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে চাথেন না তাহার একমাত্র কারণ অজানা, অচেনা পথে চলিবার স্বাভাবিক সংশয়। বিচার-বুদ্ধি বিরা তাঁহারা activity principles এর মত্যাভ্য উপলব্ধি করিতে পারেন কিন্তু অনুরিচয়ের দৃকণ ইহার প্রয়োগবিধি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন না। আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকার সহিত পাঠ করিলে ইহারে সম্বন্ধের নিঃসন্দেহ হইবে। বাংলায় কাজের মাধ্যমে হাতে বলমে শিশুদের শিক্ষা দিয়াছেন এবং বিজ্ঞানসম্মত

প্রণালীতে নিয়মিত কলাকলের বিচার করিয়াছেন এমনই কৃতিত্বের শিক্ষিত্রিনি পুস্তকখানির বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি সম্বলন করিয়াছেন 'child education' নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকার সম্পাদিকা।

প্রাথমিক শিক্ষাবিধি—শ্রীমনোমোহন মজুমদার ও শ্রীমিতাঃমোহন মজুমদার প্রণীত। পৃষ্ঠা ৮০ + ২৪০। মূল্য ৩ টাকা। প্রাতিস্থান—ভাঙ্গ-ভাণ্ডার, শিলচর।

আলোচ্য পুস্তকখানি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষাহতনগুলিতে Teachers Manual বা শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হিসাবে আশাশ্রয় শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক অকুমোদিত। এই স্বল্প পরিমিত গ্রন্থখানির মধ্যে বহু বিষয়ের সমাবেশ আছে এবং আলোচনা সংকল্প হইলেও কোথাও কুখোখা হইয়া উঠে নাই। বস্তান্তেন এই একখানি পুস্তক পড়িলেই শিক্ষাত্রয়ের প্রথম শিক্ষার্থীরা শিশুমনবদ্য, শিক্ষা-মনো-বিজ্ঞান, সাধারণ শিক্ষা-পদ্ধতি ও বিভাগের সংগঠন বিষয়ে স্বাধাভিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। একাড়া গ্রন্থখানিতে প্রাথমিক মূল পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ পাঠ্যদান প্রণালী সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। পুস্তকখানির কাব্য সাবলীল ও রচনাকৌশল মনোভ কিত্ত ইহাতে বহু মুক্তকর প্রমাণ করিয়া গিয়াছে। পুস্তকখানির নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে এবং আশা করি এই নূতন সংস্করণ এইরূপ প্রমাণ বলিত হইবে।

শিক্ষা

স হি কল্যাণকর कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति

১০ম বর্ষ

বৈশাখ ১৩৫৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

পরলোকে ডাঃ মন্ডেসরি ও জন ডিউই

গত ৬ই মে ৮১ বৎসর বয়সে ডাঃ মন্ডেসরি পরলোক গমন করেন। অতিনব শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহ্যিক যুগান্তর আনিয়াছেন ডাঃ মন্ডেসরি তাঁহাদের একজন। ইতালিতে বহুদিনব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, এই বিদূষী মহিলা তাহাবই মধ্যে শিক্ষা লাভ করেন। কৈশোরে তিনি ইতালিতে নারী অগ্রতি আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মহিলাদের মধ্যে প্রথম রোম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনঃসমীক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী চিকিৎসক হিসাবে তিনি জড়বুদ্ধি শিশুদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহাদের মধ্যে কাজ করিতে করিতে তাঁহার মনে হয় যে এই হৃতভাগ্য শিশুদের চিকিৎসা অপেক্ষা শিক্ষার প্রয়োজন বেশী। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে

তিনি জড়বুদ্ধি শিশুদের একটি শিক্ষায়তনের ভার গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার উদ্ভাবিত অতিনব শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এই শিশুদের চিত্তবৃত্তির এতখানি উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিল। পরীক্ষার কল দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলে ডাঃ মন্ডেসরি লিখিলেন, লোকে যখন পরীক্ষায় জড়বুদ্ধি শিশুদের কৃতিত্বের তারিফ করিতেছিল, তখন আমি অল্পসঙ্কান করিতেছিলাম, কি কারণে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূত্র ও প্রতিভাদীপ্ত শিশুদের চিত্তবৃত্তির বিকাশ এতখানি কৃত হয় যে জড়বুদ্ধিও বুদ্ধির পরীক্ষায় তাহাদের সমকক্ষ হয়। ডাঃ মন্ডেসরি প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি এই অল্পসঙ্কানেরই কল। এই পদ্ধতি আজ সারা বিশ্বে 'মন্ডেসরি শিক্ষা পদ্ধতি' নামে পরিচিত। মন্ডেসরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সম্পূর্ণ দাবির শিশুর উপরই অর্পিত হয়। সেখানে অবাধ স্বাধীনতা ও খেলার আনন্দের মধ্যে শিশু শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই ডাঃ মন্ডেসরি প্রবর্তিত পদ্ধতি অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর অন্য শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারই প্রভাবে তদু নিতনিকার ক্ষেত্রে নহে, সাধারণিক অংশে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ডাঃ মন্ডেসরি ভারতবর্ষের সহিত বিশেষভাবে দৃষ্টি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর Theosophical Societyর প্রধান কেরা Adyar-এ বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞানবাহনে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অস্বাভাবিক শিক্ষা কেন্দ্রে বহু শিক্ষক-শিক্ষার্থী মন্ডেসরি শিক্ষা পদ্ধতিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। নিতনিকার ক্ষেত্রে এই বিদ্যুতী মহিলায় পান চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এসিদ্ধ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ জন ডিউই সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে চিন্তার জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্বেশ সঞ্চারিত হইয়াছে। যন্ত্রণা: বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ ও মনীষীদের মধ্যে ডিউই দিকপাল মণ্ডল ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বৎসরের প্রথম কালে তাঁহার চিন্তার দ্বারা সর্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সমগ্রভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ১৮২৬ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিকাগোতে ইটনিড্যানিটী স্কুল নামক একটি বিজ্ঞানময় পরিচালনা করেন। এই বিজ্ঞানময় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির সম্পর্কে তিনি যে সকল পরীক্ষা করেন, তাঁহার নিকানীতি সেই সকল পরীক্ষার অন্তিম ফল হইতে প্রসূত। ডিউইর মতে জ্ঞানার্জনই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নয়। যে জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায় না, সে জ্ঞান নিরর্থক। মূলপাঠ্য বিষয়ভিত্তিক তথ্যগুলি যাহার তাহার সাধারণিক প্রয়োজনে আবিষ্কার করিয়াছিল। অল্পকাল প্রয়োজনের জাগ্রদে সেইগুলির পুনরাবিষ্কারের চেষ্টাতেই চিন্তাশ্রমের বিকাশ হয়। ডিউইর অস্বাভাবিক

শিক্ষা-ব্যবস্থার শিক্ষক বক্তা ও ছাত্র শ্রোতা নয়, শিক্ষকের নির্দেশে ছাত্র তাহার বিজ্ঞানবীজনের করে না। ডিউই বলেন :

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি হইতে এ কথা বলা যায় যে, ঠিক কি কহিতে হইবে, কেন কহিতে হইবে— ইহার প্রকট জ্ঞান নিতর না থাকার, নিতর শিক্ষা পরিচয়নার শিক্ষকে অস্বাভাবিক উপর নির্ভর করিতে হয়। শিক্ষকের অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বিজ্ঞান-বীজনের ফলে অস্বাভাবিক বিষয়ে নিতর আবিষ্কার জন্মায় না, সে চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে।

মহাশ্রাব্য-প্রবর্তিত ব্রিটিশী শিক্ষার মূল নীতির সন্ধান ডিউইর এই উক্তিভুক্ত পাওয়া যাইবে।

পরীক্ষার কলাকল

এই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল শতকরা ৩২/৩০ জন পরীক্ষার কৃতকার্য হইয়াছে। যাকি ৯৮ জন পাস করিতে পারেন নাই। ইহারা সকলেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার পর কম পক্ষে দুই বৎসর কলেজে পড়াশোনা করিয়াছে। অনেককেই কলেজের কর্তৃপক্ষ নির্বাচনী পরীক্ষার সময় পাস করিবার উপযুক্ত জাবিয়াছিলেন। তবু ইহারা পাস করিতে পারিল না। তবে কি নির্বাচনী পরীক্ষার পর হইতে আসল পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ইহারা বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়াছিল, উপরন্তু দুই বৎসর কলেজে যাহা শিখিয়াছিল তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে? কিছু ছেলেমেয়ে অবশ্যই অকৃতকার্য হইবে, কেহ কেহ পরীক্ষার হলে যাবজ্জীবন যাব, আবার কেহ কেহ অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে আর কেহ কেহ এমন বাহিয়া পড়ে যে সেই মূহুর্ত অংশের বাহিরে আর আসিলেই আর তাহাদের দস্তখুট হয় না।

কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত? কত হওয়া উচিত? কর্তৃপক্ষের তাহা জাবিয়া দেখা সরকার।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর দেখিয়া অনেকেরই ভাবিয়া পান না, এই ছাত্র কি করিয়া প্রবেশিকার সিংহাসন অতিক্রম করিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, উপরে লিখিত আকস্মিক কার্যগুলি ছাড়াও এই ব্যর্থতার অন্য কারণ আছে। মনে হয়, আমাদের গোড়ারই গলদ, গোড়ার যে কাঁচা থাকিয়া যায়, তাহার আর সংশোধন হয় না। এই গোড়ার কাঁচার মূল অঙ্গুলস্থান করিলে দেখিতে পাউ, আমাদের ইচ্ছাগুলিতে ছেলেমেয়েরা বিষয় বিশেষের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলে, নিজের সর্বাঙ্গীন একটি ছক তাদ্বারা সামনে থাকে না। সেজন্য যে এক বিষয়ে কিছু কমজোর তাহার অন্য বিষয়গুলিতেও ভাল করিবার সম্ভাবনা কী। ইংরেজিতে যে কাঁচা হইল তাহার আর ভাল ছেলের দলে ঢোকায় পথ নাই, ইংরেজির পিছনে তাহার সমগ্র চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াও সে হয় তো ইংরেজিতে ভাল করিতে পারে না। বয়ঃ অগ্রদিকে সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ থাকে না বলিয়া অন্য বিষয়ে তাহার যে সম্ভাবনা ছিল তাহাও অঙ্গুবেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইগারা যদি ইংরেজির বাধ্যবাধকতার না পড়িত, তবে হয়তো অন্য বিষয়গুলিতে আশাহুত্রে ভাল ফল করিতে পারিত। আমাদেরও মনে হইত না যে এতগুলি বৎসরের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কি, অন্য বিষয়ে নিজেকে স্বাধীন ভাবে প্রস্তুত করিতে পারিলে বালক বালিকারা যে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস লাভ করিবে তাহার ফলে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করাও আর এত কঠিন হইবে না। অবশ্য সেজন্য চাই ভাল শিক্ষক। কারণ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে ইংরেজির ভাল ছেলেমেয়ে কাছে কখনও ও ভীতিকর হয় না।

আমরা একটি যাত্রা করণের উল্লেখ করিলাম। বিভাগলয়ে ও বিভাগলয়ের পরবর্তী স্তর কলেজগুলিতে অধ্যয়ন অধ্যাপনার মধ্যে আরও অনেক কিছু বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আরও প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। জাতির জীবনে এতখানি শক্তির অপচয় এতখানি ব্যর্থতা তো উপেক্ষার বিষয় নয়। সকলকেই এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, প্রতিকারের পথ কি এতই কঠিন।

গান্ধীজীর ‘বালপোখী’

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

১

গান্ধীজীর একটি অপ্রকাশিতপূর্ব রচনা সন্ধানিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা, নাম ‘বালপোখী’, বাহায়া সবে লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের উপযোগী। একে তো গান্ধীজীর লেখা, তাহা ছাড়া বইটির আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। অতএব তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

অনেকের ধারণা, নিজের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রথম পদার্পণ বৃষ্টি বৃনিয়াদো শিক্ষা লইয়াই। একথা ঠিক নয়। তাহার অনেক আগেই বহুদিন আফ্রিকার টেনস্টার কার্যে তাহাকে প্রথম শিক্ষকতা করিতে হয় এবং তখনই তাহার দৃষ্টি আমাদের নিকালমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ‘বালপোখী’ও বৃনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার অনেক আগেকার রচনা।

মূল বাসপোষী* গুরুগাণ্ডীতে লেখা। সস্ত্রিতি নবজীবন প্রকাশন যন্ত্রিয় ইহাও একটি দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। কান্টনাব গ্রিবেসী মূল বইটির অধ্যয়ন করিয়াছেন। বইটিতে বাথোটি পাঠ ও একটি কৃষিকা আছে। বর্তমান সংস্করণে এগুলি ছাড়া বাসপুখি সম্বন্ধে জেল হইতে লেখা গান্ধীজীর একটি চিঠি, কাকা কালেলকায়ের লেখা একটি মুখবন্ধ ও নবজীবন পয়েন্টের লেখা তাহার উপর মন্তব্য, এবং মহাদেব দেশাইয়ের একটি চিঠি আছে। মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর এই বইটি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য তাহার একটি অভিভাবক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মূল পুখি বাথোটি পাঠের সমষ্টি। পাঠগুলির নাম যথাক্রমে স্বকালবেলা, দাঁতন, ভ্রমের আয়োজন, ভজন, ব্যায়াম, চটকা, চরকা কাটার আনন্দ, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যাদি, কেসবামার, যাবত কাজ ও প্রভুর মহিমা। পাঠগুলির ভাষা সহজ ও সরল, কঠিন শব্দ নাই বলিলেই চলে। রচনার ভঙ্গী যাতাপূত্রের কথোপকথন। প্রথম দৃষ্টিতে পাঠগুলির বিশেষ চোখে পড়ে না। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ই সাধারণ পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পায়, যথা ব্যায়াম, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। ইহাদের মহিমাসূচক ভঙ্গ ও নুতন নহে। কিন্তু একটু ওলাইয়া দেখিলে বিষয়নির্ধারণের বিশেষ বোঝা যায়। পাঠগুলি একে অপরের সহিত যুক্ত, একটি পূর্ণ ভাবধারা দেগুলিকে বিবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভাবধারা গান্ধীজীর জীবনমর্শনের মূল পুত্র, এবং পাঠগুলি যেন গান্ধীজীর জীবন বোনের প্রকারে জড়িত।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, গান্ধীজী পরবর্তী কালে যে নবী তালিম ও বিনিময়ী শিক্ষায় কথা

* বর্তমান প্রকল্পে আমি এই নামের পরিবর্তে 'বাসপুখি' নামট ব্যবহার করিয়াছি, কারণ বাঙালী পাঠক 'পুখি' কথাটারই সহিত বেশী পরিচিত।

বলিয়াছিলেন, তাহাদের বীজ এই বাসপুখিতেই পাওয়া যায়। এই নামান্তরটি পাঠের মতোও গান্ধীজীর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বড় অবদান, সামূহিক শিক্ষার পরিকল্পনা—তাহার পরিচয় রাখিয়াছে। বর্ষ কর্ম আচার ব্যবহার সামাজিকতা সকলই এই শিক্ষার ক্ষেত্র, ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই বাধ দেওয়া চলে না, যিলে শিক্ষার অঙ্গহানি হয়।

এই তো গেল মূল পুখির কথা। ইহা ছাড়াও বইটিতে আর যে যে ভিনিসগুলি আছে সেগুলি নানা কারণে মূল্যবান, সেগুলিতে গান্ধীজীর চরিত্রের একটা দিকের চমৎকার একটি পরিচয় পাওয়া যায়; সে পরিচয় শিক্ষক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক গান্ধীজীর, যিনি দ্বিরাট একটা স্বাভাবিক আন্দোলন পরিচালনা করিতে করিতে, তাহার ক্ষেত্রে থাকিয়াও শতক কর্মের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় কথা ভাবিতেছেন, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতেছেন। এ পরিচয় অনন্ত, হৃদয় বাসপুখির কৃষিকার কাকা কালেলকায়ের মুখবন্ধ ও অন্ত্যে যে লেখাগুলি আছে, সেগুলি অধ্যয়ন করিয়া দিলাম।

২

কাকা সাহেবের মুখবন্ধটির নাম বাসপুখির বিনিময়।

"কেহ যখন ভীর্ষে বা দুর্বলতায় বাইবার জন্ত রওনা হয় তখন আত্মীয়বন্ধু তাহাকে প্রেরণ করে, 'আমাদের জন্ত সেখান হইতে কি আনিবে?' অথবা বলে, 'আমাদের জন্ত এই এই ভিনিসগুলি আনিও।' যখন গান্ধীজী জেল বাইতেন তখন আমাদের ভিতর কেহ কেহ তাহাকে এইভাবে অপ্রয়োজন করিতাম, 'এবার জেলবাজার আমাদের জন্ত এই এই বই লিখিয়া দিবেন।' এইভাবে আমি একবার গান্ধীজীকে সত্যগ্রহ আন্দোলনের ইতিহাস লিখিয়া দিতে অপ্রয়োজন করিয়াছিলাম। সেই বইটির কৃষিকার আমি এই কথার উল্লেখ করিয়াছি।

এই বালপুত্রিও বেলাতেও ঠিক সেইরকম হইয়াছিল।

সত্যাক্ষর আশ্রমের সঙ্গে একটি কাঠের বিভাগস্থ ছিল। সেখানে বর্ষনিকা দিবার জন্য কিছু পাঠ্য প্রয়োজন যোগ হইতেছিল। ইহার জন্য আমরা একটি বিকৃত পাঠ্যসূচীও তৈয়ারি করিতেছিলাম। এই অবস্থায় যখন গাঙ্গীকী ভারতবর্ষে প্রথমবার জেলে বাইতে উত্তর হইলেন তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, “জেল আপনায় অবশ্য যিনি; সেখানে আমাদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি বালোপযোগী বই লিখিয়া দিবেন।” ইহার উত্তরে তিনি এইটুকুই বলিলেন, “সম্ভব হইলে লিখি।”

• হিন্দুধর্ম নিকা দিবার জন্য বালপুত্রি তিনি লিখিতে পারিলেন না, তাহার বদলে দিলেন একটি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথম পড়ার বই, তাও মাত্র বাঁচোটি পাঠ সংবলিত। তাহার সঙ্গে লেখা কৃষিকাটি তখন আমার হাতে পড়ে নাই।

যখন গাঙ্গীকীও সঙ্গে চোপা হইল তিনি বইটি সহজে আমার মতামত বিচার করিলেন। আমি এই বলিয়া শুরু করিলাম যে আমি যে বই চাহিয়াছিলাম এটা সেট নয়। তাহার পর বলিলাম, “আপনায় বালপুত্রিতে গল্প সহজে একটি পাঠও নাই, এটা আমার কেমন লাগিতেছে।” আর একটি পাঠ সহজে বলিলাম, “দাঁতন সহজে আমার মত অন্য রকমের। নিম্নের দাঁতনে কুঁচী ভাল হয় না। দাঁতন বাবলারই ভাল। তাহার কথাই বল মাফির পক্ষে উপকারী, সেই জন্য আমি বাবলার দাঁতন বেশী পছন্দ করি।” আমি জানি যে ছেলেদের কটু জিনিষ ভাল লাগে না, এবং সেটা বাদিতে ভাল লাগে তাহার জন্য চোটা করা উচিত। কিন্তু তাহার জন্য যে পাঠ চাই সেটা অন্যভাবে লিখিতে হইবে।”

• দাঁতন সহজে এই মত লেখক পয়ে বদল করেন।

(অ. দ. ব.)

গাঙ্গীকী বলিলেন, “এটা তো মতামতের কথা। এই বালপুত্রি লেখার আমার যে মূল্য উদ্দেশ্য ছিল সেটা বুঝিতে পারিলাম কি? সে সহজে তোমায় কি মত?”

যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সহজে আমার কোন ব্যবধাই নাই, তখন তিনি বলিলেন, “এই বালপুত্রি লেখার এই উদ্দেশ্যই ছিল যে যদি এই বই চলে তাহা হইলে আজকাল প্রচলিত অন্য কোন বইই না চলা উচিত হইবে।”

তিনি আশি আশ্বাস হইলাম, বলিলাম, “নেটা কেমন ব্রিটিশ সন্তান? আর সব বই কেন বন্ধ হইবে?”

তখন গাঙ্গীকী বিস্ময়িত ভাবে আমাকে বাপাওটা বুঝাইয়া বলিলেন, “আজকালকার বালপুত্রিগুলি দাহিত্যের দৃষ্টি লইয়া রচিত হয়। সেগুলিকে এমন করিয়া সাজানো হয় যে ছেলেরা শিককের সাহায্য বিনাই সেগুলি পড়িতে পারে। আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না। মত কথা বলিতে গেলে আমার বালপুত্রি শুধু শিককের জন্যই লেখা হইয়াছে। আমি এটা চাহি না যে বইটা ছাপা হইয়া ছেলেদের হাতে পৌঁছবে। শিককের উচিত, তাহাও ছেলেদের দিয়া বস্ত করিয়া পরিকার অন্যের বইটা লিখাইয়া লন। তাহা হইলে ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের হাতে সুন্দর অন্যের লেখা এই বালপুত্রি গর্ব করিয়া রাখিবে। শিকক পড়াইবার সময় তাহার কলাই-পুণা প্রবেশ করিয়া সেটাকে আরও সুন্দর করিবেন এবং তিনি যতবার বইটি পড়াইবেন ততবারই ইহার নূতন নূতন সংস্করণ হইয়া যাইবে।

ইহাতে শুধু এইটুকু বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে এই ধরনের বালপুত্রিতে কি কি বিষয় যুক্ত হইবে ও ছেলেদের কি কি বিষয়ে লিখাইতে হইবে।”

সব কথা এইরূপ বিস্ময়িতভাবে শোনার পর আমি গাঙ্গীকীর পরিকল্পনাটি বুঝিতে পারিলাম।

সেটা খানিকটা ভালও লাগিল। কিন্তু আমার এ বিশ্বাস হইল না যে আজকার দিনে এই মত চলিবে। সুতরাং কথাটা এইখানেই বন্ধিত থাকিল।

গান্ধীজী তাঁহার বালপুত্রের প্রতিিনি আদর্শ করেছিলেন কাছে পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা মহাত্মাই যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা পবে দেওয়া হইয়াছে। গান্ধীজীর পরিকল্পনা ও তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মত কাহারও ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য বালপুত্র অপ্রকানিতই রাখিয়া গেল।

গান্ধীজীর লেখা এই বালপুত্রটিকে আমি ছেলেদের শিক্ষা দিবার উপযোগী বইয়ের ককাল বলিচাই মনে করি। এই ককালকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষক প্রতিবার নূতন নূতন মনঃখ্য বালপুত্র রচনা করিয়া আপনাদের প্রতিভা দেখাইবেন।

আমাদের দেশে এ মতের বলা নূতন নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যাপক ও আচার্যগণ যখন সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যাপন করিতে বসিতেন তখন তাঁহাদের হাতে থাকিত মন্ত্রগ্রন্থ। তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহারা বিষয়গুলি পল্লবিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহাদের এই ভাবগত পদ্ধতীকালে ভাষার রূপ গ্রহণ করিত।

আমাদের দেশে এই বিদ্যাটির উপর জোর দেওয়া হইত যে, শিক্ষা (৩। ভৌতিকই হউক বা আধ্যাত্মিকই হউক) যিনি দিবেন তিনি যেন অল্পকৃতি-সম্পন্ন শিক্ষক হন। কেবল শব্দবিলাপের সাহায্যে কাজ চালাইয়া লওয়া তখনকার দিনে কেহই বিশেষ পছন্দ করিত না। আচার্য তাঁহাকেই বলা হইত, যিনি অবিদিত বিদ্যা আচরণে রূপায়িত করিয়াছেন। গান্ধীজীও এই বিদ্যাটির উপর জোর ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার লিখাগুলি তিনি 'নবী তালিম', 'বুনিয়াদী তালিম' বা 'জীবন-শিক্ষা' নামে পরিচিত তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিতে স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন।

তাঁহার লিখাগুলির মূল কথা এই যে "শাদিভ্যায় সাহায্যে শিক্ষা না দিয়া ব্যবহারমূলক অল্পকৃতির সাহায্যে দেওয়া উচিত। জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ এই শিক্ষার লক্ষ্য—শিবর।"

গান্ধীজীর মূল কথাগুলির এই একটি লক্ষ্য ছিল যে সাধারণ মানুষ, যে মানুষ অবনত মনিত, যে প্রায়ে থাকিয়া যেমন তেমন করিয়া জীবন যাপন করে, সে কেমন করিয়া উন্নতি করিতে পারিবে, কেমন করিয়া সে আপন মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে পারিবে। / তাঁহার এই চিন্তাধারা এই ছোট বালপুত্রের মূলেও বহির্দৃষ্টি, কেমন করিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্ব ভিতর দিয়া এবং কত কত খরচে শিক্ষার বহুলভম প্রচাৰ হইতে পারে।

আজকার অনেক পণ্ডিতই যাকে যাকে বলেন যে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান বড় বয়সেই তবু দেওয়া যায়। এবিধে গান্ধীজীর মত একেবারেই অগ্রসরকর্মের ছিল। তিনি মনে করিতেন যে ছোট ছেলেদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা খুব শীঘ্রই দেওয়া যাইতে পারে, এবং সেটা দেওয়া উচিত। এই ভিত্তির উপরেই জীবনের সমস্ত উন্নতি করা সম্ভব। তাঁহার এই মত মত বালপুত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

৩

কাকা সাহেবের উপরোক্ত মনুষ্যত্বের সঙ্গে নবহরি পদেখ আর দু-একটি কথা লিখিয়াছেন :

"বালপুত্রে গুরু মনঃক কোন পাঠ নাই দেখিয়া কাকাসাহেবের মনে যেমন খটকা লাগিয়াছিল, তেমনই যখন আমি গান্ধীজীকে বালপুত্রটি পড়িয়া পোনাই তাঁহার সঙ্গে একটি খটকা লাগিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের ছেলেদের লেখা বইয়ে হিমালয় ও পাহাড় কোন উল্লেখ না থাকা বইটির ক্রটি বলিয়া গণ্য হইবে।

বালপুত্রের প্রতিিনি গুরুগাটের করেকজন

শিক্ষকে পাঠানোতে নানাবকন মত পাওয়া গেল।
খর্দীর গিছুড়াই * এমন পর্যন্ত বলিলেন যে যদি খলা
না হইত যে বইটি গাছীজীর লেখা, তাহা হইলে
আমি এইটা পড়িয়া বামে কাগজের খুঁড়িতে ফেলিয়া
দিতাম। কিন্তু মত কত প্রতিকূল ছিল, তাহাই
উদাহরণরূপে এই মতবাটি উদ্ধৃত হইল। বাহা
হউক, শেষ পর্যন্ত সকলে একমত না হইতে পারায়
বালপুখি আর ছাপা হইল না, পাণ্ডুলিপিও আকারেই
রহিয়া গেল।

১৯৩৭ সালে যখন গাছীজী ব্রিহাদী শিক্ষার
কথা বলিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলাম
“এইবার বালপুখি ছাপাই?” তিনি প্রশ্ন করিলেন,
“সেটা কোথায় আছে?” আমার কাছে তখন মূল
বায়োটি পাঠাই ছিল, তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি
বলিলেন, “শিক্ষকের অন্ত ইহার কৃমিকাক্ষেপে আমি
যেটা লিখিয়াছিলাম সেটা কোথায়? তাহাতে
আমি কি লিখিয়াছিলাম সেটা এখন আর আমার
পুস্তোপুখি মনে নাই, কিন্তু সেটা ছাড়া এই বায়োটি
পাঠ ছাপানোর কোন অর্থ হইবে না।”

তখন সেই কৃমিকা কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম
না। মৃতদ্যং ছাপানোর প্রস্তাব এইখানেই স্থগিত
রাখিতে হইল। সস্ত্রুতি গাছী সংগ্রহের কাইলে
এই কৃমিকা ও মহামেশ-ভাইয়ের লেখা চিঠিটি
পাওয়া গিয়াছে। তাই বালপুখি অনলাভবৎ
সম্মুখে উপস্থিত করা সম্ভব হইল।

তখনকার দিনে গুরুবাক্তের শিক্ষকের মধ্যে
বালপুখি সম্বন্ধে যে মতভেদ দেখা গিয়াছিল তাহার
কারণ শিক্ষকগণ বালপুখিকে সাহিত্য-শিক্ষার প্রথম
পুস্তক হিসাবে দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, আর
গাছীজী বিচার করিয়াছিলেন নূতন ধরণের জীবন
নির্ধারণের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া। এটা শুধু ছেলেরা
পড়িবার জন্যই নহে। ইহাতে পিতামাতা ও

শিক্ষকগণ কিভাবে কোন পথে ছেলেরা
জীবন পড়িয়া কুলিবেন সে কথাও কল্য হইয়াছে।
এ কাল-তবু যুগের কথায় বা বই হইতে পড়িয়া
তনাইলে হয় না। ইহা শুধু তখনই সম্ভব যখন
পিতামাতা ও শিক্ষকগণ যেমন উপদেশ দিবে
সেইমত নিজেদের কাছ করিবেন এবং নিজেদের
জীবনকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিবেন।

বাপুখী পাঠগুলির সঙ্গে ছবি দিতে ব্রিহাদ-
ছিলেন। তাহা সবেও আনবা ছবি দিলাম না।
ছবি দিবার এই উদ্দেশ্য খলা হয় যে তাহাতে পার্থক্য
বিষয় স্পষ্টতর হয় ও পাঠকগণের ব্রিহাদ
হয়। কিন্তু এখানে আমাদের মনে হয় নাই যে
ছবি দিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।”

৪

যাহবেলা রেল হইতে আস্রয়ের শিক্ষকগণের
কাছে লেখা গাছীজীর বালপুখি সম্বন্ধে চিঠিটি
ইহার পর ছাপা হইয়াছে। ইহার এক কায়গার
গাছীজী লিখিতেছেন, “আমার লেখা, মৃতদ্যং এটা
ছাপিতেই হইবে একথা যেন স্পষ্টতর ভাবা না হয়।
আমার পত্রিকায় কথা ভাবিও না, কারণ এটা
লিখিয়া আমি আনন্দই পাইয়াছি।

যেমনভাবে আমি টলটল কার্যে ছেলেরা
নিবাহিতাম। ঠিক সেইভাবেই বইটা লিখিয়াছি।
লেখানে আমি তাহাদের ‘মা’ হইয়াছিলাম।

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম ত্রিণটি পাঠ লিখিব;
কিন্তু আর একটু চিন্তা করিতেই মনে হইল, পুখি
ছোট হওয়াই ভাল। ছাত্র ইচ্ছা করিলে বৎসরে
দুই ত্রিণটো বই পড়িতে পারে।” এই চিঠিতেই
পুস্তক করিয়া গাছীজী লিখিতেছেন, “আমার মনে
হয়, লেখক হিসাবে আমার নাম প্রকাশ না করাই
ঠিক হইবে।” তাই ইহার পরে গাছীজী মূল
বইয়ের যে ‘মৃতদ্যং’ বা কৃমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে
লেখক হিসাবে তাঁহার নামের পরিবর্তে ‘কর্তা’ এই
চন্দ্রনাম পাওয়া যায়। কৃমিকাটি এইরূপ :

* গিছুড়াই শিকারবীর কমে’ গাছীজীর আদেশ লইয়া
সাহায্যকারী কাটায়া দিয়াছেন।

“এই বালপুথিতে দ্বিবিঃ লগ্না হইয়াছে যে বিভাসীর এক বন্ধু বা তাহার চেয়ে কিছু কম সময় বৃদ্ধা কাটিতে, অল্প পরিচয় করিতে (অর্থাৎ নিমিত্তে ও পড়িতে) এবং সাধারণ অল্প নিমিত্তে কাটিয়াছে।

‘লক্ষ্যকা’ ও ‘অপমান’ এই শব্দ দুইটি দ্বারা হইয়া বালপুথিতে স্থান দিতে হইল। ছেলেদা ‘অপমান’ বসলে ‘লক্ষ্যকা’র মত সুন্দর শব্দটি ব্যবহার করিলে ভাল হয় এই মনে করিয়াই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। ‘অপমান’-এর চেয়ে সহজতর কোন শব্দ না পাওয়ায় দোটাও রাখিতে হইল। দ্বাদশ পাঠে যে অল্প বক্তব্যগুলি কঠিন শব্দ আনিয়াছে সেগুলিকে ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যদিও লিখিবার সময় এই উদ্দেশ্যই মনে ছিল যে ছেলেদা দাদা কিছু নিমিত্তে তাহাই জীবনে প্রয়োগ করিবে। এমন কোন বিষয় হইতে বেগুনা হয় নাই দাদার অভিজ্ঞতা তাহাদের প্রতিদিন হয় না।

যদিও মা ও ছেলেদা কথোপকথনের আকারে লিখিত হইয়াছে। টোকা মধ্যে কল্পিততা অবশ্যই আছে, কারণ আজ আর তাৎপর্য্যে বেঙ্গির ভাল মা-ই ছেলেদের শিক্ষা দিগা আপনাদের স্বর্গপালন করেন না, বা তাহার অল্প প্রস্তুত হন না। অল্প ভবিষ্যতে কয়েকজন মা-ও স্বপ্নানের প্রতি তাঁহাদের স্বর্গ পালন করিবেন, এই আশাতেই আদর্শজন এইটুকু কল্পিততার স্থান এখানে দেওয়া হইয়াছে।

অপমান করা হইয়াছে যে বইটি শেষ করিতে ভিন্ন হইতে হয় ভাল সময় লাগিবে। শিক্ষক ছাত্রকে দিয়া একতাকটি পাঠ সুন্দর অক্ষরে লিখাইয়া লইবেন। পাঠগুলি এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে শিক্ষক যেন নিজের উৎসাহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে যথাক্রমে সাজাইয়া লইতে পারেন।”

৫

গাঙ্গীজীর এই কৃমিকার পর মহাশয়ের দেশাইয়ের চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। বইটি এখন প্রথম দেখা হয়, তখন বিভিন্ন লোকের মতামত জানিবার জন্য যে চিঠিটি তিনি লিখিয়াছিলেন এটি সেই চিঠি। ইহার প্রয়োজনীয় অংশের অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

“গাঙ্গীজীর নিজের বিবাস ছিল যে আজ-কালকার বালপুথিগুলি ব্যবহারের দ্বারা অল্প হইয়া যায়, আর সেগুলি অত্যন্ত দামী হয়, পরিচয় হইতে পরিচয় ছেলেদের কথা মনে রাখিয়া সেগুলি রচিত হয় নাই। অতএব বালপুথি এই বন্ধু হওয়া উচিত যাতে এই শব্দ দিক দিগা কোন ক্রটি না থাকে। এইভাবে বিচার করিয়াই তিনি এই বালপুথিটি রচনা করেন। যদি গাঙ্গীজীর এই বালপুথিকে প্রয়োগের দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই পুথি আর শব্দ বালপুথির স্থান অধিকার করিয়া লইবে এবং ইহার ফলে আধুনিক শিক্ষার দ্বারাও বদলাইতে হইবে। সুতরাং আপনাদা সেখানের কথা মনে রাখিয়াই নির্বিশেষে এই বালপুথির দোষজন বিচার করিবেন, ও যদি কোন মন্তব্য করা দরকার মনে করেন তাহা স্বাক্ষর করিবেন। একটা কথা কলা দরকার, এই বালপুথি প্রথমেই ব্যবহারের জন্য নহে। গাঙ্গীজী মনে করেন যে প্রথমে কোন বইই দ্বারা উচিত নহে। শিক্ষক পাঠের সাহায্যে ছেলেদের মূল অক্ষরগুলির সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন, এবং অক্ষরজ্ঞান পূর্ণ হইলে তবেই তাহাদের হাতে এই বালপুথিটি দিবেন। গাঙ্গীজীর কল্পনা এই যে, বইটি পরিচয় হইতেও পরিচয় ছেলেদের পক্ষে সুসঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।”

৬

ইহার পর মূল বালপুথি শুরু হইয়াছে।

১৯২০ সালে আহমদাবাদে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাপরিষদে

গাড়ীজী যে বক্তৃতা দেন তাহাতে এই বালপুত্রের উল্লেখ আছে। তাহার বক্তৃতার সেই অংশটুকুর অঙ্কবাহ দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করি। এই অংশটি বালপুত্রের বর্তমান সংস্করণের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমি তো কোন পুস্তক লোকসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আগে হাজারবার তাবিয়া দেখি। আমি একটি ছোট বই লিখিয়াছি। তাহার নাম বালপুত্র। সেটা পড়িতে পাঁচ মিনিট লাগিবে, একটু দীর্ঘে পড়িলে ঘণ মিনিটে শেষ হইয়া যাইবে। এই বইটি সমস্তে যে সকল সম্ভব্য কথা হইয়াছে সেগুলি আমি পড়ি নাই। আমি জানি, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই পড়িয়া ঘুণী হইব না। আমার শিক্ষা প্রশংসার শেষ নাই। এইজন্যই তাহাদের কোনটাই আমাকে প্রচাৰিত করে না। তাহা সম্বন্ধে বলি, এই বইটির শিখনে যে বিচার বা সিদ্ধান্ত আছে তাহা সত্যই মহত্বপূর্ণ। সে সিদ্ধান্ত এই যে, পুস্তক ও পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা

যেন না দেওয়া হয়, শিক্ষক মুখে যুগেই শিক্ষা দিবে। যে দেশে শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রাচুর্য হয়, সে দেশের ছেলেদের মাথা কিলে ভরা থাকে আমি জানি না, বোধ করি কুন্তেই হইবে। সেখানে ছেলেদের বিচাৰশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অসংখ্য বালকের অস্তিত্ব হইতে, এবং তাহাদের শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কালে, আহার এই বিষয় নিশ্চিত হইয়াছে।

আমি ছেলেদের হাতে কোন পাঠ্যপুস্তক দিতে চাই না। যদি শিক্ষকের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হয়, তো তাহারা পড়ুন। শিক্ষকের জন্য আবশ্যিক যত খুশী লিখি। কিন্তু ছেলেদেরদের জন্য লিখিলে শিক্ষকে বাস্তবিক করিয়া তুলিব। তাহার কালে শিক্ষকের স্বতন্ত্রতা ও পোষাইবার কমতা নষ্ট হইয়া যাইবে।"

গাড়ীজীর এই কথাগুলি দেশের শিক্ষাবিশেষণ বিচার করিয়া দেখুন।

বঙ্ক জী-শিক্ষার প্রসার

শ্রীকল্যাণী দেবী

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বেথুনগাহেব ছিলেন চিত্রকুমার, কবি ও বিলাতের প্রখ্যাত ঔকিল। এদেশে তিনি নানান পরিষদের আইন সচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। এদেশীয় শিক্ষা সমাজের (Council of Education) তিনি সভাপতি ছিলেন। কথিত আছে, এইমুখে তিনি বারানতের একটি বালিকা-বিদ্যালয় দর্শনে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহার ফলে ভারতীয় নারীজাতির হুনিবিত্তা করিবার তাহার ইচ্ছা হয়। ১৮৪২ সনে শিক্ষাসমাজের সমস্ত

স্বাধীনগোপাল ঘোষ ও ব্রহ্মদেব দত্তের প্ররোচিতায় তাহার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়। সুখোপাধ্যায় মহাশয় বিনা ভাড়ায় তাঁহার অধিকাংশ স্ট্রিটের বৈঠকখানা ছাড়িয়া দেন, সেইখানে প্রথম দিন এই যে ১৮৪২ সনে ছাত্রীসংখ্যা হয় একশটি। তদনন্তর পণ্ডিত যদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা সুবনমালা ও কুম্ভমালায় নাম জানা যায়। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজেও পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিয়া বেথুন স্কুলের

ছাত্রীদের পড়াইতেন। পত্রিকাও সংগ্রহেও তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ব্যেটে প্রয়াস করেন। উল্লেখ্য বক্তৃতা মতামতের 'সামান্যবিনী পত্রিকা' এই মূলে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায় হয়।

বেধুন স্কুলের প্রথম নাম হয় "ক্যালকাটা ক্রিস্টিয়ান স্কুল"। ইহার সমগ্র ব্যবসায় বেধুনসাহেব স্বয়ং বহন করিতেন। বিদ্যালয়ের দেখাভূনা, পরীক্ষাদিও তিনি গ্রহণ করেন, স্কুলের ভক্ত যেতন তো লওয়া হইতই না, উপরন্তু পুস্তকাদি বিনামূল্যে দেওয়া হইত। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীরা সেনার স্কুল-কুমকো পাইয়াছেন, একথা সেকালের এক ছাত্রী কস্তার (আমার শাতড়ীর মা ও মাসীমা) পেরেছিলেন। এই কস্তা আমার শাতড়ী) মুখেই আমি শুনিয়াছি। এই কস্তাও বেধুন স্কুলের ছাত্রী, তাঁহার সময়ে ১৮৯০ সনে স্কুলের সামান্য বেতন দিতে হইত, এবং পুস্তকরূপে তাঁহারা বই ও খেলনা পাইতেন। বেধুনের স্কুল খ্রীষ্টাব্দ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর কস্তাদের অন্তর্গত কেবল এই স্কুল খোলায়, কলিকাতার সমগ্র পরিবারের কস্তাদের প্রকৃত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া পেরায় আর কোন বাধা ছিল না। পণ্ডিত দেবচন্দ্র বিদ্যালয় এই স্কুলের প্রধান অধৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া স্কুলের অনেক উন্নতি সাধন করেন। মেয়েদের আনিবার জন্য তিনি বানবাটনের ব্যবস্থা করেন। তাহাদের জন্য উপযুক্ত পুস্তকরচনা তাঁহার কীতিব অন্ততম।

বেধুনসাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-সাহিত্যের প্রতীকরূপে একটি অশোক বৃক্ষ রোপন করান, সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষেও একটি অশোকবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। ১৮৫১ সনে বেধুনসাহেব ইহার ভাঙ্গা করেন, তখনও হেডমাস্টার পদেই স্কুলের নতুন বাটী নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই। বেধুন উইল যারা তাঁহার ব্যবসায় সম্পত্তি এই স্কুলকে দান করেন। এইদ্বারা

স্বকিণ্যেই স্কুলোপাধায় ও উত্তরপাড়ার অমিয়ায় অল্পকাল মুখোপাধ্যায় মতামতের দানও উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৭ সনে ডাক্তার নামে এক মিশনারী সাহেব যাত্রা স্বাক্ষরমান যারের সহযোগিতায় বেধুনের অন্তর্গত বেধুন খোলে, তাহা এক্ষণে 'কটিং স্কুল' নামে পরিচিত। শিকড়িছাত্রীদের জন্য বিশেষ স্কুল খোলার উদ্দেশ্যেই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, সনে ১৮৫৭ সনেই "Normal School for the Training of Christian Female Teachers" খোলা হয়। ইহার ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দু-বিধবা ও দ্বারী পরিভাষ্যারাও ছিলেন। এই সময়ে ঢাকা, বীরভূম, চট্টগ্রাম, এমন কি সুরা আকিরাবেও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসার হইতে লাগিল। ঢাকার ইন্ডেন স্কুলে ১৮৮৩ সনে, ১৫৭টি ছাত্রী ছিল। বেধুনের স্কুলের পর লর্ড ডালহাউসীর চেটার ১৮৫৩ সন হইতে পণ্ডিতমেন্ট বেধুন স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। ঢাকার ইন্ডেন স্কুলটিও সরকারী স্কুল। ১৮৫৩ সনের পূর্বে পণ্ডিতমেন্ট সাক্ষাৎভাবে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কিছু করেন নাই। কলিকাতা শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিতে অনিস্কৃত হওয়ায় ১৮৮৬ সন হইতে বেধুন স্কুলে মাসিক ১২ টাকা প্রতি ছাত্রীকে বেতন হিসাবে বার্ষিক করা হয়। বিদ্যালয়ের মতামতের অন্তর্গত পণ্ডিতমেন্ট ফলেই বেধুন স্কুলের উন্নতি হয়, এবং যক্ষণেও আদর্শ বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণসাহেবের অন্ততম নেতা কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৫ সনে তাঁহার "ভারত-আশ্রম" স্থাপন করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন, পরবর্তীকালে ইহার "ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন" নামে খ্যাত হয়, বেধুন স্কুল ও কটিং স্কুলের ভার ইহাও অঙ্গানি বর্তমান।

সে মূলে এইরূপে মিশনারী, হিন্দু ও ব্রাহ্ম-সমাজের চেটার, সরকারী ও বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় খোলাই নারীচিত্তের বিকাশ সাধন হয়।

কিন্তু ১৮৭৮ সনের পূর্বে ছাত্রীদেব উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কাশ্মিনী বহু প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে ১৮৭২ সনে বেপুনে কলেজ বিভাগ খোলা হয়, তাহাতে কাশ্মিনী দরকারী বৃত্তি পাইয়া এক, এ পড়িতে লাগিলেন। অধ্যাপক হইলেন শশিকৃষ্ণ বসু। ক্রমে বি, এ প্রার্থীও খোলা হইল। ১৮৮৩ সনে প্রথম দুইটি বঙ্গ মহিলা কাশ্মিনী বহু (পরে গাঙ্গুলী) ও চন্দ্রমুখী বহু বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। পরে এম, এ উপাধি গ্রহণ করিয়া চন্দ্রমুখী বেপুন কলেজের অধ্যাপকতা করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ভর্তি করা হইত না। এষ্টজন্য অবলা দাস (পরে লেডি অবলা বহু) ও Ellen D'abrod মাস্ত্রাভের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইতে বাধ্য হন। ১৮৮৩ সনে এই বাধা দূর হইলে কাশ্মিনী ছাত্রীরূপে ভর্তি হন। কৃষ্ণের বিষয় ১৮৮৮ সনে তিনি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, কিন্তু বিধুমুখী বহু ও ক্রম্বী মিস্ত্রি এই বৎসর এম, বি উপাধি পান। কাশ্মিনীদেবের মহারানী বর্ণমণী মেয়েদের ভাস্ক্যার শিক্ষার্থে বেড় লক্ষ টাকা দান করেন। ইহা দ্বারা মেয়েদের বৃত্তিমান ও বোড়িংএ থাকিবার ব্যবস্থা হয়। এইরূপে মেয়েদের এম, বি পড়িবার পথ সুগম হয়। মেডিক্যাল কলেজের বর্ণমণী হোষ্টেল খালাস কর্তমান।

১৮৯১-৯২ সনে বেপুন কলেজে ২৩টি, লোহেটো হাউসে ৮টি, ও গা মার্টিনিচের দুইটি ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে দুটি বি, এ ক্লাসের ছাত্রী। সেই বৎসর নির্মলা বাল্য সোম ও মেটিন্ডা কোরেন Mental and Moral Philosophyতে এম, এ উপাধি পান। কিন্তু ১৮৯৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিটাদ-বারটাদ বৃত্তির অধিকারিণী হন মিস ফ্রোয়েল হল্যাও।

উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদেব সংখ্যা নগণ্য হইলেও গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে দেখা যায় বঙ্গ-

মহিলারা এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, ইহা বাঙ্গালার গৌরবের বিষয়। বঙ্গ ও বৃহৎপ্রদেশ নারীদেব শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বোম্বাই ও বর্ধা-প্রদেশে পুরুষের সঙ্গেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে হইত। এখন ভারতের সর্বত্র নারী-অগ্রগতির দৃশ্য, তথাপি প্রবোধ্য শিক্ষিত্রী ও ভাস্ক্যারের অভাব দূর হয় নাই, তাই পুরুষের সহায়তা লইতে হয়। আশা করা যায় শীঘ্রই নারীদেব এ অভাবও দূরিতবে।

ভারতের নারীজাতিতে সুশিক্ষিতা কল্পিতব্য প্রয়োজন আছে ইহা আর সর্বদাঙ্গী সম্মত। একটি বালিকা সুশিক্ষিতা হইলে ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা সমগ্র পরিবারের, তথা জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। সে শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। ছাত্রীরা ছাত্রদের সমান সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবে কি না, দুন্দেই বন্ধন, স্ত্রী শিক্ষা প্রভৃতি শিখিবে কি না, শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে ইত্যাদি নান্য বিষয়ে সুচিন্তার দ্বারা ভবিষ্যৎ শিক্ষা-প্রণালী স্থির করিতে হইবে। শিক্ষার ব্যবস্থার গুরু হইতে গুরুতর হইলে, প্রতি বৎসর পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে মাঠা-শিতাকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইলে, স্ত্রী-শিক্ষার ক্রম প্রচার হওয়া কঠিন হইবে।

কিন্তু কাল পূর্বে যে নারী সুদৃহিনী ছিলেন, ছিন্নবস্ত্রের বা খাটী পুতুল তৈয়ারী করিতে, বন্দ-কার্য করিতে, আত্মপনা দিতে, সস্ত্রা কুলিতে, বন্ধন করিয়া সমগ্র পরিবারের মনস্তত্ত্ব সাধন করিতে পাকা ছিলেন, সেই বঙ্গালী-জননী স্মৃতির এক রূপ ঘেঁষিয়াছি আমরা উন্নয়নে পড়াইতে। সে যুগের নারীগণ সাহিত্যসেবাও, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনার তৎপর হন। ভাস্ক্যার কাশ্মিনী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক চন্দ্রমুখী বহু, লেডি অবলা বহু, কবি কাশ্মিনী দাস, ছিন্নবস্ত্রী দেবী ও তাঁহার ভগিনী দরলা দেবী, জ্যোতির্ষগী গাঙ্গুলী, কুমুদিনী বহু, দরলা মিত্র প্রমুখ বেপুনের ছাত্রীগণের কাণ্ডকলাপে বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। সাহিত্য-সেবার ও

সমাজ সেসব বর্ণবৈষম্যের দ্বারা, অসুস্থতা দেয়, নিরুপায় দেয়, ইত্যাদি দেয়। চৌদুগলীর নামও অজ্ঞাত নহে। একদে ভবিষ্যৎ বংশাবলীর সমুদ্র বিংশ শতাব্দীর নারী-প্রগতির কি আদর্শ আমরা রাখিয়া থাকিব, তাহাই অসুস্থলনের বিষয়। একদা নরীপ্রথা, পুরুষের বহু-বিবাহ, বিবাহ-বিবাহ প্রভৃতি লইয়া বহু আন্দোলন হইয়াছে। এ সকল বিগত যুগের কথা। এ যুগের নব নব আন্দোলন যথা বিবাহিতা নারীর 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' বিল, পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারের সমান অধিকারের বিল পান দ্বারা নারীর স্বাধীনতা কি হইবে তাহা বিচারের দিন আসিয়াছে। ভারতীয় নারী কর্মনীলতা, দাননীলতা, সত্যতা, অতিথিদের প্রভৃতি সে সকল সমুদ্রের স্রষ্টা এখনো পান্চাঙ্গের নমস্ত, সে আদর্শ কুর হইবে কি না তাহাও বিবেচ্য।

বাল্যবিবাহের কথা বলিতেছি না, কিন্তু যে প্রৌঢ়া সৌখ্য মাতৃস্বত্বপিনী নিঃসন্তান বিধবা সেকালের প্রতি সংসারেই দেখা গাইত, যাহাও প্রাণ দিও, সমস্ত শরীরের কর্মতা দিও আর্ন্তের সেবা করিতেন, স্ত্রী বা স্বত্বের পরিবারবর্গকে আগুন করিয়া লইতেন, তাহারা কি কেবল দুঃখ-যন্ত্রনাই ভোগ করিয়াছেন? সংসারে উক্তি শ্রীতি লাভ করিয়া তাহারা কি নিঃশেষ দুঃখ বুলিয়া যান নাই? সেই শুষ্কচাষিষ্ট অন্তঃপুংবাসিনীর কণ বদলাইবার ক্ষমতা উনবিশ শতাব্দীতেও বহু চেষ্টা চলিয়াছে, আম বিংশ শতাব্দীতে তাহার কল আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচারের দ্বারা ই বুঝিতে হইবে।

অপরগকে কস্তার উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাঝে দেখা-

চাষিতা করিবে বিধা, আমরা ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহাও বিবেচ্য।

যে বর্ষডায় বাবালীর মজাগত, বালিকায়া যে সকল ক্রতপালন করিয়া স্ত্রী ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করিত, সে সকল এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্তান-হস্তির বক্টা এখন যত্ন যত্নে রাখিয়া গুঠে না; যত্নাও স্ত্রীসন্তানের মঙ্গলমন্ড বাবাইয়া আশ্রয় করে না। স্কুলে কোন বিশেষ বর্ষশিক্ষা দেওয়া সর্বোচ্চ নহে বলিয়া তাহা দেওয়া হয় না (অবশ্য ক্রীষ্টান-স্কুলগুলির কথা বলিতেছি না)। দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীতেও বর্ষশিক্ষার সহিত বালিকাদের বিশেষ মনো নাহি, ইহার ফল কি হইতেছে তাহাও বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহু বিবাহ ইত্যাদি মন্দ সমাজে আর নাই বলিলেই হয়। অপরগকে উচ্চ-উপাধিবাহী কস্তার বিবাহযোগ্য পাত্র পাওয়াও কঠিন হইয়া পড়িতেছে, বিবাহ হইলেও তাহারা অনেকক্ষেত্রে স্বামী ও তাহার পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিতেছেন না; ইহার অন্তর্গত মঙ্গলমন্ডার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা বাক্য সত্যও, পান্চাঙ্গ্য দেশের ক্তার আশ্রয়ও নারীরা "বিবাহ বিচ্ছেদ" বিল পান করিতে উৎসুক, এই নিমিত্তই পিতার সম্পত্তিতে তাহারা সমান অধিকার পাইয়া নিজের অধিকার স্থাপনে উদ্বুগ। এখন যত্নের তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষিতা নারীর ভাবিবার বিষয় ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত না করিয়া আশ্রয় নিকা প্রণালীর "কঃ পদা ১"০

০ বর্ষের শ্রী শিক্ষা সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত।

উচ্চারণের ক্রটি ও সংশোধন

শ্রীকণা সেনগুপ্ত

প্রচলিত বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে ভাষানিকার ব্যবস্থা কেবলমাত্র লিখন ও শ্রবণে মনোযোগী রাখতে থাকে। তারও প্রয়োগ করা হয় কতকটা ব্যক্তিগত প্রক্রিয়ার মত। যে নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ্যক্রমে নির্বাচিত হয়, উল্লিখিত তাকে গলাবদ্ধ করে রাখা থাকে একমাত্র লক্ষ্য। আবার সেই পুস্তকের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদির প্রশ্ন, উত্তর ও ব্যাখ্যা লিখার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। তদুপরি পাঠ করার জন্য ততটা যত্ন দেওয়া হয় না, তার ফলে শিক্ষার্থীর উচ্চারণের ভুলের ক্রটি থেকে যায় তা সংশোধনের চেষ্টা তেমনভাবে করা হয় না। অথচ ভাষানিকার প্রক্রিয়ায় শ্রবণের বিভিন্ন উচ্চারণের প্রতি বোধে লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা বিভিন্ন উচ্চারণের ওপরই ভাষার বিভিন্নতা নির্ভর করে।

নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এক্ষণে শ্রবণের যৌথিকভাবে কথাবার্তা বলার সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে এবং শ্রবণের ব্যবস্থা তো আছেই। উচ্চারণের বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতে গেলে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জানা দরকার কি কি কারণে সাধারণত উচ্চারণের ক্রটি দেখা যায় এবং কিসে তা সংশোধন করা যেতে পারে।

উচ্চারণ ভুল হবার কারণ কি এ বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গেলে দেখা যায় যে এর একাধিক কারণ বর্তমান। আকস্মিক বৈশিষ্ট্য উচ্চারণের ক্রটির প্রধান কারণ বলে পরিগণিত হতে পারে। যেমন ক এবং ঙ-এর কোন পার্থক্য না রেখে উচ্চারণ করা, 'এ'কার স্থানে 'আ'কার উচ্চারণ করা, 'শ' (Sh) এর

আরগার শ (S), এবং স (S) এর আদ্যকার শ (Sh), ন ও ল-এর অবিভক্ত প্রয়োগ, প্রথম বর্ণস্থানে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই বর্ণ বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণের ক্রটি দেখা যায়। বহু অভ্যাসভিত্তিক খুব তাড়াতাড়ি পাঠের জন্য অথবা খুব টেনে পড়তে গিয়ে কিংবা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে বা টেনে টেনে কথা বলতে গিয়ে উচ্চারণ ভুল হতে পারে। শারীরিক কারণেও উচ্চারণের ক্রটি অনেক সময় দেখা যায়। যেমন জিহ্বা ভাঙা থাকলে উচ্চারণ সঠিক হয় না, দৃষ্টি শক্তির ক্রটি থাকলে অনেক সময় পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থী এক শব্দকে অন্য শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। বাকশক্তি পবিত্র না হবার জন্য অনেক সময় নীচু প্রবীর শ্রবণের উচ্চারণের ক্রটি দেখা যায়। পশ্চাৎ-গম (backward) শ্রবণের প্রায়ই উচ্চারণ ভুল হতে থাকে। এই অসুবিধার কারণ তাৎপর্য সঙ্কট ও ভীতি। "আমার যদি ঠিক না হয়"—এই ভয় থেকেই তারা বেশী ভুল করে থাকে।

উচ্চারণের ক্রটি কিসে দূর করা যায় এ একটা গভীর চিন্তার বিষয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, উচ্চারণের বিভিন্নতার ওপরই ভাষার বিভিন্নতা নির্ভর করে।

আকস্মিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তি যে ক্রটি তার জন্য শিক্ষককে সতর্ক হতে হবে। তার নিজেই যথেষ্ট এক্ষণে ক্রটি দূর করা সম্ভব নয়। তা না হলে শ্রবণের ক্রটি কখনই দূর করা সম্ভব নয়। শারীরিক কারণের জন্য যদি উচ্চারণ ভুল হয় তবে শারীরিক ক্রটি প্রথমে দূর করার প্রয়োজন হবে। ঐকান্ত চিকিৎসকের পরামর্শ হবারও প্রয়োজন হতে

পারে। আমাদের দেশে অবশ্য School Doctor-এর ব্যবস্থা নাই। সুতরাং অতিভাবকেই সহযোগিতাতে এর ব্যবস্থা করা দরকার। ব্যক্তিগত পরিদৃষ্ট না হবার ভয় যদি বিতর্ক উচ্চারণ না হয় তাহলে অবশ্যই খুব চিকিত্সিত হবার কারণ নাই। কারণ যখন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ একটি খুব হবার সম্ভাবনা থাকে।

যে কারণেই উচ্চারণের একটি পরিণতিত হোক না কেন তা দ্রুত কব্ধার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় শিক্ষকের সহায়কুতিপূর্ণ ব্যবহার। যে শিশুর মধ্যে উচ্চারণের একটি পরিণতিত হেবে শিক্ষকের সতর্ক থাকতে হবে যেন শ্রেণীর সকলের মকৌত্বক দৃষ্টি তার উপর না পড়ে। শিক্ষক নিজের যেন উচ্চারণের একটি পরিণতিত না করেন। তাতে সকলের চাইতে সকলের সম্ভাবনাই বেশী। যে শিশুর উচ্চারণের একটি দেখা যায়, সংশোধনের ভয় বার বার তার বিকে দৃষ্টি দেওয়াও ঠিক নয়। তাতে সচেতন ও সজ্ঞতা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। শিশুর ছোট ছোট মনে বিতর্ক করে পড়তে দিলে এবং দলগতভাবে উচ্চারণ সংশোধন করে দিলে অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। শ্রেণীর কাজের বাইরে নির্দিষ্ট শিশুকে কাছে তেকে এনে কথাবার্তার ছলে উচ্চারণ সংশোধন করে নেবার সুযোগ দেওয়া যায়। এই অন্ত্যাস জনিত

যে একটি তার ভয় ব্যক্তিগত সংশোধন খুব বেশী প্রয়োজন। যাদের মধ্যে ডাড়াডাড়া কথা বলা, টেনে টেনে কথা বলা ইত্যাদি দোষগুলো দেখা যায়, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের কথাবার্তা বলতে হবে এবং সহায়কুতিপূর্ণ সাহায্যের দ্বারা একটি সংশোধনে সচেতন হতে হবে। লক্ষ্যবোধ থেকে অনেক সময় শিশুর মধ্যে তেমনলাগি দেখা যায় যার ফলে উচ্চারণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এইভাবে শিশুদের লক্ষ্যবোধকে দূর করে আত্মবিশ্বাস বোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। পশ্চাত্তম শতকের শিশুদের তির্যক্য করে আত্মহীনমত্ততার (self-abasement) তার আশিষে তুলবার সঙ্গার না হয়ে তাদের আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

মোট কথা, যে শিশুর মধ্যে উচ্চারণের একটি দেখা দাবে তাকে এড়িয়ে চললে অথবা বেশী যত্নের তির্যক্য করলে কোনোদিনই তার সংশোধনের পথ থাকবে না। অতিরিক্ত তির্যক্য হলে শিশুর ভীততা বেড়ে যাবে এবং সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। একান্ত সর্বদা সহায়কুতিপূর্ণভাবে একটি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন এবং উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষকের নিখুঁত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তবেই শিক্ষক দলগতভাবে সঙ্গে উচ্চারণ সংশোধন করতে সমর্থ হবেন।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গ শিকার উদ্দেশ্যে

ঐআর্থমায়কম্

আমাদের একখানি নূতন বই মূদ্রনের মত সম্মতি ছাপা-খানায় প্রস্তুত। এবং বইয়ের মধ্যে এই বইখানির নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আর বিচারযোগ্যও বইখানি মৌলিক। কৃষিকার শ্রিকিনোবতাই মঙ্গলময় নিখিলেছেন :

“বইখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু নূতন দৃষ্টি ও নূতন পদ্ধতির ইহা আকর। আমাদের সমাজ জীবনকে বাহ্যিক উন্নত করিতে অভিলষী, গঠনকর্মের কোন বিশেষ দিকে যোগ্য কাজ করিতে আগ্রহী, তাহাদের সকলেরই পক্ষে এই বইখানি শিক্ষাগ্রন হইবে।

“গাছাশস্য লোকের ব্যবসা এই যে গাছাশস্য কার্জের পতি গ্রামে, আর গ্রামবাসীদের জীবনেই যাক তাহা নিবদ্ধ। অনেক মনে করেন যে বর্তমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও উন্নত গ্রামে না পৌঁছিতে, ততদিনই কেবল এই সবে উপযোগিতা। গঠনকর্মীরা পঞ্চ সময় সময় বলিয়া কেলেন যে পথের প্রতি তাহাদের কোনই আস্থা নাই।

“আমি আনাপোড়াই অল্প মত পোষণ করিয়া আসিয়াছি। এই ক্ষুদ্রাতন বইখানিতে আমার মত বহুলাংশে সমর্থিত হইতে দেখিয়া আমি সন্তোষ অকৃত করিতেছি। নদী তালীম বিশেষত শ্রোত শিকার কেন্দ্রে, গ্রামবাসীদের পক্ষে বড়টা আবশ্যক, পথবাসীদের পক্ষেও ততটাই প্রয়োজন। আধুনিক উপকরণে পূর্ণ বিশাল যোগ্যই, নদী দিল্লী, কলিকাতা ইত্যাদি নদ নোংরা বাড়ী, ও অপরিষ্কার পল্লী ও নবনাগীতে শুধি। বহিষ্কৃত ও খেঁকাবের অল্প

নাই। দেখা যায় যে উচ্চ শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকেরা পঞ্চ নিজেদের নিত্য ব্যবহার জীবনিক ব্যবহার, পঞ্চকন ও বিনিমূরক অপসারণের (জিন্সাআল) বিষয়ে অবিকৃত বলিয়া পরিস্ফুট কনকদের অনেক অধিক অজান। শিল্পকারদের কাছে পঞ্চ এই ক্ষুদ্রপূর্ণ অত্যন্ত পরিস্ফুট। পথের বিউনিশিগালিটিগুলি প্রতি ২৭নয় লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়া থাকে, তবুও অপসারণের কাজ ঠিকমত করিয়া উঠিতে অক্ষম ; তার কারণ কোন ক্ষেত্রেই বিউনিশিগালিটি এ সব দিকে মনতায় সহযোগ পায় না। আর মনতায় সহযোগ যে পায় না তাহার হেতু হইতেছে শিকার অভাব, জানের অভাব। সব কাজ পছন্দ দিয়া, মনতায় সহযোগ ব্যক্তিরকে করায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আমরা একটা কথা বলিয়া লইয়াছি, আর তাহা এই যে বান্ধা, বাধ্যবিশান, শিকার ইত্যাদি অনহিতকর বিভাগ এবং এমন কি শিল্প-শিকার বিভাগ পঞ্চ, এসবই রাষ্ট্রের ‘খাতা’ (যাহা খার বা বাহার অল্প খরচ করিতে হয়) বিভাগ, একটিও ‘খাতা’ (দেওয়ার বা আয়দানী বিভাগ নয়) নহে। আর আন্তর্গের ব্যাপার এই যে সবকারী দৃষ্টিতে যেগুলি আয়ের বিভাগ যেমন নদ, মকদমা, দিনেমা, রেল, জুয়া তাহার সবগুলিই মনতায় অনহিতকারী। এই একাবে আমাদের কাম-কাজ কখনও সফল হইবার নহে। গাছাশস্য নদী তালিমের যে শিকার বিকাশ করিয়াছেন, তাহা অনহিতকর যে কোন ‘খাতাকে’ ‘নাতার’ কনাস্থিত করিবার আর কতি-কারক খাতেকে বন্ধ করায় নিমিত্তই করিয়াছেন।

“পণ্ডিত বঙালীরা সত্যি এক আদর্শ
 দেশবাসীকে সম্পদ সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু
 পুণ্য গাভীকী যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা
 ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধি অসম্ভব। আর সম্পদ বাড়ান,
 আর আমাদের অন্তঃস্থ হৃৎ, সন্তোষ, ও সংস্কারিতা
 বাড়ান, একই কথা নহে। সম্পদ বিনাশ ও
 সর্বনাশ এই দুয়েরই সাধন হইতে পারে। নরী
 তালীষ সম্পদের সহিত সর্বোৎসাহে, সমগ্র অন্তঃস্থ
 সর্ববিধ উন্নতির পথ। প্রোট্ট শিক্ষা উন্নয়ন এক
 অঙ্গ। প্রোট্ট-শিক্ষায় কেবল কেবল নিরক্ষর অন্তঃস্থ
 পৰ্বত সীমাবদ্ধ নহে; বড় বড় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ-
 যেরও কোন না কোন বিস্তারিত শিক্ষার ব্যবহার
 আছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীতে ভেদ নাই।
 বড় শিক্ষকও শিক্ষার্থী আর ছোট শিক্ষার্থী ও শিক্ষক
 হইতে পারে। একথা এই পুস্তকের পাঠক আপনি
 নিজেই অনুভব করিবেন।

“এই পুস্তকে গাভীকীর কথেকটি ভাষণ ও
 কতিপয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ
 ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। এই বিবরণ হইতে
 গাভী-সাহিত্যে অল্পাংশী ব্যক্তির কাছে এই
 পুস্তকের আদর হইবে।”

এইরূপ বিষয় সমালোচনার পরে ‘আমার আর
 বলিবার কিছু থাকিল না। আশা করি আমাদের
 সোটা দেশ ইহা হইতে লাভবান হইবে, আর
 আমাদের বিচারধারা লোকমধ্যে প্রতিফলিত
 হইয়াছে তাহা দেখিবার সুযোগ আমরা পাইব।
 পুস্তকখানি ডালিমি-দং, সেবাঘাট ঠিকানায়
 পাওয়া যাইবে।

অনুবাহক—শ্রীযুক্তনাথ শুহ, সর্বোদয়ের
 সৌভাগ্যে।

শিক্ষা

এ হি কল্যাণকর কন্ঠিৎ দুর্গতিং ভাঙ গচ্ছতি

১০ম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

৭ম সংখ্যা

আলোচনা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও অর্থনীতি বিভাগের প্রস্তাবিত অধ্যাপক পদের জন্য পাঁচ বৎসরের বেতনের টাকা দিতে কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল প্রাশনাল চেম্বার অফ কমার্শের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রী ব্রহ্মলাল নেহেরুও একসময় আবেদন করিয়াছিলেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্শ বিশ্বভারতীতে ইংরেজির একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ দিতে সম্মত হইয়াছেন। আশা করি বেঙ্গল প্রাশনাল চেম্বার ও অল্পরূপ প্রতিষ্ঠানের আত্মহুণ্যে বাংলা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জন্যও অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হইতে পারিবে। স্বর্গীয় সাহিত্যে অচ্যুতানন্দ দ্বিজবংশী ও লক্ষ্মণবংশীর মৃষ্টিও যে এদিকে পড়িয়াছে তাহার নিদর্শন পাইয়াছি—প্রেসিডেন্সী কলেজের চাত্রও শিক্ষকদের চেষ্টায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার জানাইয়াছেন যে, অসুযোগিতা বিভিন্ন কলেজের ল্যাবরেটরি এন্সিষ্ট্যান্ট, ভিসিট্যান্ট টিচার ও লাইব্রেরিয়ান-সহ যে সকল শিক্ষক ও মহিলা নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯৪৩ সালের ইন্টারমিডিয়েট, বি. এ, বি. এস-সি এবং বি. টি, পরীক্ষা দিতে চাহেন, তাহাদের নিকট চাইতে নিম্নোক্ত তারিখের মধ্যে পরীক্ষা দিবার অসুযোগিতা লেখার আবেদন পত্র সূচীত হইবে :—

আই-এ ও আই, এস-সি—আগামী ১৫ই নভেম্বর; বি-এ ও বি, এস, সি—আগামী ১৩ই ডিসেম্বর, বি-টি, ১৯৪৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি।

নন-কলেজিয়েট চাত্রের কি ২০ টাকা সহ নির্ধারিত করমে আবেদন করিতে হইবে। সেনেট হাউস ও রেজিষ্টারের আপিসে আবেদন পত্র পাওয়া যাইবে।

পরলোক লক্ষ্মী

বিগত ২০শে জুন শ্রীমতী দেবী দেবী

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যকাল শান্তিনিকেতনেই কাটিয়াছিল। যৌধনে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্মের বীজ গ্রহণ করেন। বোলপুর বিদ্যালয়ের এবং পরে কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের আশ্রানে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। শান্তিনিকেতনের গোড়ার দিককার রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। পরে তিনি চট্টগ্রাম, কটক, মেমসেতপুর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতার কাজ করিয়াছেন, বিহারের নানাবিধ শিক্ষা-সংস্কারের ও সংস্কৃতিমূলক সর্ববিধ কাজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবেও জ্ঞানেন্দ্রনাথ বঙ্গজনের দৃষ্টি ও শ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার লিখিত 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বইখানি পড়িয়া অনেকেরই আনন্দ পাঠিয়াছেন। বইখানিতে যে আনন্দের শান্তিনিকেতনের অনেক কথা পাওয়া গেল। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহার সরকারের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অসহ্য শান্তিনিকেতনেই বাস করিতেছিলেন এবং সেইখানেই পুরাতন, অতিপ্রিয় পরিবেশের মধ্যেই তাঁহার জীবনাবসান হয়।

আত্মবাসীপন ও তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারসহ সকলের সঙ্গে আত্মা তাঁহার প্রতি প্রভা নিবেদন করিতেছি।

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষার অন্ত ব্যয়

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষার অন্ত যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার আলোচনাকালে

বেঙ্গীর শিক্ষা-মন্ত্রী মোলানা আব্বাস খানেন যে, এই বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের অহুপাতে মোটেই যথেষ্ট নহে। মোলানা আব্বাসের মতে ঘাটতির অন্ত কণ করিয়াও শিক্ষার খাতে ব্যয় করা প্রয়োজন।

বর্তমান লোকসভার বাজেটের অন্ত সকলেই উদ্বিগ্ন ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিষদের অন্ত প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষার প্রদান ও উন্নতি না হইলে সব উন্নয়নই যে বার্থভায় পরণামিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষা

বিগত আত্মবাসীপন কালে জানা গিয়াছে যে পশ্চিম বঙ্গে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ২৪.৫০ ; ১৯৩১-এর হিসাবে বেশি শতকরা ১১.৪২ জন যাত্র অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিল। সুতরাং কুড়ি বৎসরের মধ্যে নানা কুর্পণা—এমন কি রাষ্ট্রবিপ্লবের চিত্তবোঝে যে দেশ শিক্ষাবিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, ইহা আনন্দের কথা। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে, শতকরা অন্তত পঞ্চাশ জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, একথা বলিতে পারিলে কতই সুখের হইবে। এখন চার জনের মধ্যে একজনও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, একথাও বলিতে পারি না। ঘেঘেদের মধ্যে সাক্ষরজ্ঞান বড়ই কম ছিল ; ১৯৩১ সালে প্রতি দুইশতের মধ্যে সাতজনও লিখিতে পড়িতে জানিত না। আর অবশ্য প্রতি দুই শতের মধ্যে পঁচিশ জনের বেশি অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন।

এখন ভারত সারী, বাংলা দেশের যান জনসংখ্যার আশাধরই রাখিতে হইবে। সুতরাং জনশিক্ষার অন্ত যথেষ্ট কার্যকর করিতে হইবে।

ভারতে উচ্চশিক্ষার ধারা

(ডক্টর শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়)

প্রাচীন ভারত অগতঃ শুধু দর্শন উপনিষদেই দীক্ষা দেয় নাই, পরন্তু তৎকালীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নারায়ণের বসাবন, চৈতন্য ও ব্রহ্মভট্ট চিকিৎসা বিজ্ঞান, উচ্চ শিক্ষারতনের সহিত সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিকার্থের বীজগণিত (Algebra) বা আর্কটটের ত্রিকোণমিতি (Trigonometry), ব্যবহারিক জ্ঞানেরও পরিপূর্ণি সাধন করিয়াছিল। গণিতের লক্ষ্যগুলি আয়ত্তের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাহা মূলতঃ ভারতেই সম্পত্তি। হিন্দু যুগের রাজবৃত্ত বা লনক, পত্রিকা বা মহাশালাই অধিনায়ক ছিলেন। যৌক্তিক নীলভঙ্গ বা হবিষ বর্ষণ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে ইহাদের দান সামান্য নহে, বিট্‌গাল ও বীজানের স্থাপত্যবিদ্যার জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর নহে। ইহাধাও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অজ্ঞানবুদ্ধির মন্যপুণ্যেও মিলিলা নববীণের জ্ঞান ও বুদ্ধিশাস্ত্রের দান উপেক্ষণীয় নহে। সমগ্র ভাবে দেখিলে ভারতের দান চীন অথবা প্রাচীন গ্রীসের অপেক্ষা অনেক বেশী, অস্তান্ত দেশের তুল্য কথাই নাই।

প্রাচীন যুগের তুলনায় বর্তমান যুগের দানের বৈচিত্র্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পদার্থ-বিজ্ঞানে আচার্য বহু অথবা যমজ, ডক্টর সাহা, কৃষ্ণ অথবা ভাষা, বাহা দান করিয়াছেন, তাহা অগতঃ আদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা তির অল্প কোন পবেষণাই একমুখী উচ্চাঙ্গের হয় নাই বাহাতে বিশ্বের দরবারে আদর লাভ করিতে পারে। এই অজ্ঞানের তিনটি মাত্র কারণ হইতে পারে :

(ক) ভারতে বীজার অভাব,

(খ) পবেষণার উপযুক্ত সামগ্রীর অভাব,

(গ) শিক্ষাধারার মধ্যে অহুপনতি।

প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া গিলেও বর্তমান যুগে যে দেশ হইতে গাছী, বীজনাথ বা অপরীণ-চন্দ্রের উদ্ভব হইয়াছে, সেখানে যে বীজার অভাব ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রকৃতি হয় না।

উপকরণের অভাব অল্প দীক্ষার। অনেক পবেষণা পবেষণার অহুপনতি উপকরণ পান না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অর্থাভাবে উপকরণ ক্রমে অথবা পুস্তকাদির পঞ্চাশ পুস্তকক্রমে সজাই কুটিত। পবেষণা বাবুদু নহেন। পবেষণা কাণ্ডে লিষ্ট থাকিবার কালে তাহার সাংসারিক প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে হইবে। কোনরূপ দাবী পূরণে আর্থিক বহুদিনের তপস্বী সাপেক্ষ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এত অর্থ নাই যে পবেষণাকে বহুদিন অর্থ সাধনা করে। বৃত্তি হিসাবে যে ব্যসায়াজ্ঞ প্রবৃত্তি হয় তাহা যুব অল্পসংখ্যকের জন্যেই জোটে ও তাহাও অল্পদিনব্যাপী। অর্থের প্রয়োজনে বাহাতে অস্তান্ত কাণ্ডে লিপ্ত হইতে হইবে, পবেষণা তাহার গৌরব ভাব হইতে বাধ্য, ও একমুখী যুগে যুব অল্প কেন্দ্রেই উচ্চাঙ্গের পবেষণা আশা করা বাইতে পারে।

আমাদের শিক্ষাধারার অহুপনতিও উপেক্ষণীয় নহে। ১৮৫৭ সালে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষাকেন্দ্ররূপেই স্থাপিত হয় ও সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও কেবল পরীক্ষা লওয়া তির অল্প কোন দাবিদেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নয় নাই। বর্তমান ভারতে বহু আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলেও সমগ্র জাতীয় সংখ্যায় তিন-চতুর্থাংশ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট (affiliated) কলেজে

পড়ে, বাহাদুরের নিকটে বিবিসিভাগের পরীক্ষাভেদে
ভিন্ন অস্ত্র কিছুই নহে।

আমাদের পরীক্ষা প্রশালীও পরীক্ষণ মানসিক
উৎকর্ষ বিচারে অসমর্থ। কেবল স্বয়ং-শক্তিই
মানসিক উৎকর্ষ বিচারের একমাত্র মানদণ্ড নহে।
বিচার শক্তি, বিশ্লেষণ শক্তি, কল্পনা শক্তি, তর্ক শক্তি
ও উদ্ভাবনী-শক্তির পরিমাণ আমাদের পরীক্ষা-
প্রশালীর দ্বারা হয় না। যে স্বয়ং শক্তির বিকাশের
দ্বারা আমরা ছাত্রদের যোগ্যতার পরিমাপ করি,
তাহা তুচ্ছ পুণ্ড্রাতনের অধিষ্ঠিত পিণ্ড। নিত্য
নূতন সমস্তার সমুদায় চাই। সমাধানের নিজস্ব পথ
আবিষ্কার করিবার শক্তি তাহাতে নাই।

হয়তো একদম অসম্পূর্ণ শিক্ষা প্রশালী, এটুকু
একদম প্রাথমিক বিকাশের দ্বারা দেশের উদ্ভাবনী
শক্তি নষ্ট করিবার ইচ্ছা বিদেশী শাসকের পক্ষে

অসম্ভব ছিল। কিন্তু শাসনীয় ডায়টকে এই দ্বারার
আদ্য পন্থিবর্তন করিতেই হইবে, নচেৎ দেশের
যমীদার সমাক বিকাশ অসম্ভব। একমাত্র ইহার
দ্বারাই আমরা কবির স্বপ্ন সফল করিতে পারি।

“যেদের এদেশ নাহি হবে শিখে,
কবি হাজির কল্যাণি মিছে ;
হুসিনের তরে হীনতা সহেছে,
আসিবে আবার আসিবে।
আসিবে নিরুদয়, আসিবে বাণিজ্য,
আসিবে বিজ্ঞা বিনয় ও বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।” (অতুলপ্রসাদ)

• লেখক কলিকাতা বিবিসিভাগের স্নাতকোত্তর
বিভাগের কণা এখানে যত্ন নাই, স্নাতক বিভাগের
কণাই আলোচনা করিয়াছেন। —সম্পাদক

বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ

[শ্রীশঙ্কর দাসগুপ্ত]

আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়েই কৃতী,
ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের
ব্যবস্থা আছে। কৃতী ছাত্র নির্বাচনে আমাদের
দেশে যে প্রথা প্রচলিত আছে—তাহা সম্পূর্ণ
বোধহীন কিনা, অথবা তাহার সংশোধিত রূপ কিরূপ
হওয়া উচিত—তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়
নহে। এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রছাত্রী
শিক্ষক শিক্ষিকা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যদের
যথো যথো প্রাণচকল রূপটি দেখিতে পাই, তাহা যে
শিক্ষার দিক হইতে একেবারেই উপেক্ষণীয় নহে—
এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

এই উৎসবের অন্ত সাধারণত বৎসরের বিশেষ
মাস, মাসের বিশেষ দিন এবং দিনের বিশেষ

কোনটি ঘটা নির্দিষ্ট থাকে। প্রায় তিন বৎসর
পরিবর্তন বিতরণে কার্য করার পুঁই পর্যাধিক পারি-
তোষিক বিতরণী উৎসবে যোগদান করিতে বাধ্য
হইয়াছি। প্রাথমিক, মধ্য-ইংরাজী, উচ্চ-ইংরাজী,
উচ্চতর বালক ও বালিকা, সরকারী ও বেসরকারী
অনুমোদিত বিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হইয়াছি, কোথাও
প্রধান অতিথি হইয়া, কোথাও পারিতোষিক
বিতরণের আনন্দস্বাদক দাঁড়ি লইয়া, কোথাও
আমন্ত্রিত অতিথি হিলাবে। তাই বিভিন্ন বর্ণন-
কেন্দ্র হইতে ইহার বিভিন্নরূপে দেখিতে প্রয়াস
পাইয়াছি। যেন হয়, ইংরাজী ভাষায় হইতে
যে মাস পর্যন্ত পারিতোষিক বিতরণের বিশেষ কৃত্ত—
সরস্বতী বলিলেও অতীতি হয় না, ননি কি রবিবার

ইহার অল্প নিদিষ্ট দিন, সকাল ৭টা হইতে ১০টা বা বৈকাল ৩টা হইতে ৭টা ইহার অল্প নিদিষ্ট সময়।

উৎসবদিনটিকে সর্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া অল্প বিজ্ঞানবোধের উত্থাপন হইতে কোনও ক্রটি পরিলক্ষিত হয় না—তবুও সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে ইহা যে সমিষ্টভাবে অঙ্কিত—ইহার অহুষ্ঠান-নিশিথে যে বিজ্ঞানবোধের মূল হয় প্রতিবিম্বিত ও প্রতিধ্বনিত হয়, একথা যেন প্রত্যক্ষভাবে এখনও সকলের নিকট অস্বীকৃত হয় নাই।

উৎসবের অল্প হিসাবে প্রথমেই নজরে পড়ে বিজ্ঞানবোধের রূপসজ্জা—কোথাও কিশোর শিল্পীর প্রতিভার বিকাশ দেখি অপরূপ পত্রসজ্জা—কথা মুকুলও যেন কিশোরের প্রাণঢাকলো সজীব হইয়া উঠে। কোথাও কিশোরীর সুনিপুণ-অঙ্কনশিল্পের লাজবদ্বা মালায় পরিণত হইয়া সলজ্জ অভিনন্দন জানায় অতিবিধগন্ধে। আলি-পমার প্রাঙ্গন ও সিঁড়ি অপরূপ শোভা ধারণ করে। বিভিন্ন বেগুনে আঁকা ঝাঁক ঝাঁক নিপুণ ও অনিপুণ হস্তের চিত্রাবলী দৃষ্টিকে অপরিচিত শিল্পীর বয়সের সঙ্গে সহজেই পরিচিত করিয়া দেয়। কোথাও কিশোর বিজ্ঞানীর প্রস্তুত ছোট ছোট গীঘার, জাহাজ বেলগাড়ি, ছোটখাট বন, উদ্ভিদ বা কালীর বিজ্ঞান অগ্রে সুনির্দিষ্ট স্থানের স্থচনা করে। কাগজ কাটারই বা কি বিচিত্র সমাবেশ—বড় বেরঙের মূর্তি ও কাগজের সময়ে 'আত্মন' বা 'আত্মত্ব' আভ্যন্তরীণতার পূর্ণ হইয়া উঠে।

এই সজ্জার ব্যবস্থাপনার প্রতি বিজ্ঞানবোধের কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রছাত্রীদের কচি অহুধারী শিল্পী ও বিজ্ঞানী ছাত্রদের হস্তে ছুই বিভাগের সজ্জার উপকরণ স্তম্ভ করিয়া দেন এবং দূর হইতে কেবল সম্মেলন, সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া পরীক্ষালাভ করেন, তবে অতি অনায়াসেই উৎসবের মাধ্যমে সার্থক ভেতরে-টারের সৃষ্টি হয়।

সভাপতি বা প্রধান অতিথির বরণে মালাদানের

যে প্রচলিত রীতি বহিরাছে—তাচাতে সৃষ্টির কোন অভাব না থাকিলেও স্বতন্ত্রের দ্বারা অভাব থাকে বলিচাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। লোহার তারের বেড়াধানে নিষ্ঠে পুষ্পস্তবক সজ্জিত আবহাওয়ায় পুষ্ট হওয়া—লোভন হইলেও কেন যেন যোহন হয় না। সূঁচ সূতা গাঁথা একরঙা কোমল কুলে বয়সের স্পর্শ থাকে—তাই জীবন্ত কুলের স্পর্শে সত্যমস্তক তথা সভাপতি মহোদয় সজীব হইয়া উঠেন।

এই সভার বিজ্ঞানবোধ যে বার্ষিক বিবরণী পাঠের রীতি বহিরাছে—তাচা অনেক সময়েই সামাজিক সংস্কার পীড়নে, বিশেষী ভাগ্য ব্যবহার বা অনাব্যবহারে, বিবরণ সংস্থাপনার নিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ একান্ত নীতি হইয়া পিত্ত ও কিশোরবোধ মধ্যে বিশ্বাস্যতার সৃষ্টি করে—তখনই বিজ্ঞান-সাহিত্যেরও বৈধতা প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য কোথাও কোথাও এমন চমৎকার বিবরণীও শুনিবো—বাহার ভাষা অল্পম—ভাষণ-ভবী অপরূপ সাদৃশ্যবস নিশ্চিত। বিবরণীর অর্থহীন বৈধতা ছাত্রছাত্রীদের মনঃসংযোগে বাধা বহ্য—কিছুকণের মধ্যেই তাহাদের মধ্যে কলতরন শুরু হয়—মূল্যায়ন করা শুরু হয়। বিবরণী সহজ পাঠ্যভাষায় সরল করিয়া লিখিলে এবং “গত বৎসরের বিজ্ঞানবোধ ইতিহাস” টিলাবে উপস্থিত হইলে কিশোর কিশোরীরা নিঃশব্দে, শিকড়ের ও কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ ও তাহার ফলাফল সহজে কিছু তথা সংগ্রহ করিতে পারে, এবং বিবরণী তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

এইবার অহুষ্ঠাননিশির সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশের আলোচনা করিব। এই অংশে আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, ক্রীড়া ও বায়াম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহার প্রত্যেকটির স্থান কত উৎকর্ষে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আবৃত্তির ছন্দমাধুর্যের সঙ্গে ভাবমাধুর্য অস্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত। ছন্দ আবৃত্তি করানো খুব পক্ষপাত বা পাপাৎনয়। কিন্তু

ଡାକ୍ତରମଣିଆ ଆବୃତ୍ତି ବର୍ଷେକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟେ ସେମାନେ ମୌଡ଼ାହାରକ—ଲିକା ଓ ମାଧ୍ୟମର ଦିକ ହେଉଥିବେ ସେମାନି ବାର୍ଷ । ବରମ ଓ ଲିକାର ସାନସଂସ୍ଥେ ବାଟାଏ କବିତା ଇହାର ବିସାୟକ ନିର୍ବାଚନ କରିଥେ ହେବେ । ନନ୍ଦ୍ରାତି ଏକଟି ନାମାଂଶୀ ବିଜ୍ଞାନସଂସ୍ଥେ ବିଷୟର ବାସା ବସିଜ୍ଞାନାଧେବ “ଅଭିମାର” ଅଭିନୀତ ହେଉଥେ ସେବିହାହି ; ଏହିକମ ନିର୍ବାଚନକେ ହୁତିକ୍ତିତ ବଳା ଚଳେ କି ?

ଅଭିନୟେ ଓ ବିସାୟକ ନିର୍ବାଚନେ ଓକ୍ତହାସିବି ଲିକକ-ଲିକିକାମେ । ଅନ୍ତ ମନ୍ଦ୍ରାତି ସେ ନବ ଅଭିନୟ ସେବିହାହି ବା ସେମନ ଅଭିଜ୍ଞାନଲିନି ନାହିଁହାହି —ତାହାତେ ନିର୍ବାଚନେ ସେମତୋଟା ଅନ୍ତକମ୍ପନ ଧ୍ରୁବିବିବ ନବିବର୍ତ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଲିକତାର ମନ୍ଦାନ ନାହିଁହା ହୁବୀ ହେଉହାହି ।

ମନ୍ଦୀତରମଜ୍ଞୟାତ୍ରଇ ଜ୍ଞାନେନ ବଧା ଓ ହୁବ ସ୍ଥାନ ଓ ବାଲୋମୁୟୋଗୀ ନା ହେଲେ ସେମନ ହୁବ ଅଭିକଟୁ, ସେମାନି ହୁବ ଅଭିକଟିବ ।

କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବାହାମେ ଏ ବଂଶରେ ଅନିକାଂଶ କେତେଇ ଓକ୍ତବର୍ଷ ସେବିହା ହୁବୀ ହେଉହାହି ।

କୋନଓ କୋନଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ମାସିତୋଦିକ ବିଷୟବେବ ମଧ୍ୟେ ଗ୍ରହଣନୀୟଓ ବାସନ୍ତା ବସା ହୁ । ଇଂରାଜେ ଡାକ୍ତରଜ୍ଞାନୀୟେ ବାଂଞ୍ଚସିକ ନାନାବିନ ହାତେବ କାଳ ଅଭିଜ୍ଞାବକେସା ସେବିହାବ ହୁବୋମ ମାନ । ଏହି ବାସନ୍ତାଟି ଅତି ହୁବ । ଆବାହେବ ସେମେ ବିଜ୍ଞାନର ଓ ମୁହେବ ବାସନ୍ତାନ ଅନେକ, ଲିକକେବ ମଧ୍ୟେ ଅଭିଜ୍ଞାବକେବ, ଡାକ୍ତରଜ୍ଞାନୀୟ ଓକ୍ତାତି ମନ୍ଦ୍ରାତିକିତ ମନ୍ଦ୍ରାବିନିସାବ କବାଟିଂ ହେଉହା ବାକେ । ମାକାଂକାଂଓ ଓକ୍ତିବ ମସବେଇ ହୁବ ସାକ୍ତ । ନିଜାକ୍ତ ହୁର୍ତ୍ତାମାବନତ ମୁକ୍ତକକ୍ତା ମସିକାକ୍ତ

ମାନ କାହିତେ ନା ମାସିଲେଇ ଓକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞାବକେବ ମଧ୍ୟେ ଲିକକେବ ମାକାତେବ ହୁବୋମ ହୁ । କଳେ ମନ୍ଦ୍ରୋମିତାବ ଅଭାବେ ମହସ ଚେଟା କରିଲେଓ ଯୋଗ୍ୟତମ ଲିକକଓ ଏକଟି ମୁର୍ବ ମାହୁବେବ ଚିତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମଜ୍ଜିହା ସିତେ ମାସେନ ନା । ତାହି ଗ୍ରହଣନୀୟ ବାସନ୍ତାବ ମଧ୍ୟେଇ ଲିକକ ଓ ଅଭିଜ୍ଞାବକେବ ମଧ୍ୟେ ଯୋଗ୍ୟତମ ହାସିତ ହୁ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣନୀଟି ଅନ୍ତତ ହୁଇସିନ କିନ୍ତୁକେବେବ ଅନ୍ତ ଓକ୍ତକ୍ତ ବାସା ବାହୁନୀ । ତାହାତେ ଅଭିଜ୍ଞାବକମ୍ପନ ହୁବତାବେ ଗ୍ରହୋକଟି ମିଶ୍ରେବ ଗ୍ରାତି ମନକେମ କରିଥେ କରିଥେ ମାସେନ, ଏଂ ଏହିତାବେ ଗ୍ରହଣନୀୟ ହୁଲ ଓକ୍ତକଟିଓ ମାର୍ବକ ହୁ ।

ଓକ୍ତବ ଆମବେ ମୁଖ୍ୟା ବକାବ ଅନ୍ତ ଡାକ୍ତରଜ୍ଞାନୀୟେବ ବେ ଲିକା, ତାହା ଗ୍ରହଣକେ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେବ ସେମାବ ସାଂଘେଇ ଅନାସାମେ ସେଓବା ଚଳେ । ମୁଖ୍ୟା ବକାବ ଗ୍ରାସିକ ମାସିବୋବ ଗ୍ରହଣ କେକେଇ ହୁବେ । ଅନ୍ତ କାହାବଓ କୋନଓକମ୍ପନ ଅନ୍ତବିବା ହୁତି କବା କେବଲ ଅନ୍ତଚିତଇ ନେ—ଗ୍ରାସ ଅମାସାବେବେଇ ତୁଳା—ଏହି ବାସନ୍ତା ଗ୍ରାସ ବଂଶବ ବସନ ହେଉଥେ ବିଜ୍ଞାନରେଇ ସନ୍ତାହିତେ ହେବେ । କୋନଓ ମକା ବା ଓକ୍ତବେବ ଆମବେ ଅନ୍ତେବ କୋନକମ୍ପନ ଅନ୍ତବିବାବ ହୁତି ନା କରିବା ସେବିହାବ ଅଭାସ କବାହିତେ ହୁ । ଯାକ୍ତିମତ ଅଭିଜ୍ଞାତାବ ଜାମି, ଦୈର୍ବ ଗ୍ରହଣାଦୀ ଗ୍ରହଣବକ୍ତ ତାବେ ମାଡ଼ାନୋ ଓ କ୍ଷାର ଅଭାସ କବାହିବା ଗୋଟି ମିତ୍ତରେବ ମୁଖ୍ୟା ବକାବ ମାହାତ୍ତ କବା ବାହିତେ ମାସେ ।

ମାସିତୋଦିକ ବିଷୟବ ଓକ୍ତବ, ଲିକାବ ମାହାସମ୍ପ ଅନ୍ତ ବିନାବେ ମମା ହେଲେଇ ସେ ମାସାକ୍ତ ଓକ୍ତିକମିବ ଓକ୍ତେବ କବିଜାମ ତାହା ମାମୋଧନ କବା ମନ୍ଦବମ୍ପ ହେବେ ।

শিক্ষাত্রতীর আমেরিকা ভ্রমণ

[শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস]

শ্রীচরণেদু, আপনাকে আজ ব্যাডিসন ভ্রমণ কাহিনীর কথা লিখিব।

আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের International Relations Club-এর সভ্য। উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাণের ছাত্রদের বর্ষ বার্ষিক ইউনাইটেড নেশন্স (Sixth Students' United Nations Conference) এর অধিবেশন উপলক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবার আমাদের International Relations Club এর সভাপতি ডাঃ ক্লিংবার্গ (Dr. Klingberg)-এর উপর ছাত্র প্রতিনিধি মনোনয়নের ভার বিদ্যাহে। তিনি আমাকে ও আর চারজনকে মনোনীত করিলেন। তিনি উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছিলেন যে যেহেতু এখানে ভারতীয় ছাত্র আছে, সেই হেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবে। কিন্তু তাহারা পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিতে অসম্মত করিলেন। পাকিস্তান এখন Security Council-এর সভ্য।

২৮শে মার্চ সকাল ৭-৩০ সময় বগনা হইলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নূতন একখানা ডাক গাড়ি বিদ্যাহে, অত্যন্ত বাবতীয় ব্যবস্থাও বিদ্যাহে। ডাঃ ক্লিংবার্গ নিজে গাড়ি চালাইলেন। আমরা পাঁচজন শুধু বসিলাম হইয়া থাকিলাম।

৪৮টি মাইল ঘুরে উইস্কনসিন একটি বাজা, ব্যাডিসন তাহার রাজধানী। নিকাগো আরও কিছু উত্তরে। কার্বনডেল হইতে দূরত্ব প্রায় ৪০০ মাইল।

এখানে কুলী মজুরেরও গাড়ি আছে; আর সকলেই গাড়ি চালাইতে পারে। শিক্ষকদের

আর কুলীমজুরের আয়ের চেয়েও কম। কুলের শিক্ষকদের আর খরচ বাক বৎসরে ৩০০০ ডলার, কলেজে ৪০০০—৫০০০ ডলার। কুলী মজুরদের আর ৪০০০ ডলারের অনেক বেশি। কিতাবখোঁতে গাড়ি (এবং আর সব জিনিসই) কিনিবার সুবিধা থাকায় সকলেই গাড়ি কিনিবার দক্ষতি আছে। গাড়ি না থাকাই একটা আশ্চর্যের কথা। কেহ কেহ বস্তাটের জন্য গাড়ি কেনেন না। যেমন আমাদের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান। বছরে চর মাত্ৰ হাজার ডলার আর; কিন্তু বস্তাটের ভরে গাড়ি কেনেন না। অথচ কলেজে বহু ছাত্রেরই গাড়ি আছে।

এখানে গাড়ি সামগ্রিক জীবনের অঙ্গ। পাড়ারগায়ে যেমন দুই মাইলের পথ পথই নয়, কলিকাতায় যেমন ভগ্নানীপুত্র ভাষাভাষ প্রভিঃবনী, সব সময়ই সামগ্রিকতা। কুটুম্বিতা একা চলে, তেমনি এদেশে গাড়ি থাকায় গড় ৪০ মাইল ১০০ মাইল পথ পথই নয়; আমাদের বালীগর বাগবাগার। গাড়ি ৪০ মাইল হইতে ৮০ মাইল পথের বেগে চলে।

য হ বেগে গাড়ি চলিল। এদেশের অধিকাংশ পথ সিমেন্ট কংক্রিটে তৈয়াহী। দৈনিক হাজার হাজার গাড়ি চলিলেও কুড়ি পচিশ বছরে যাতা যোগাণ হয় না। আমাদের দেশে গাড়ি চলিবার নিয়ম Keep to the left এদেশে কিন্তু Keep to the right; যাতায জান দিক দিয়া গাড়ি চলিবে; দীঘারিং হইল ডাম দিকের বদলে বা দিক।

বসন্তের আগমন বেশ ঘোকা বাইতেছে। কিন্তু শীতের প্রকোপে দূর ঘাস সব যাবা পড়িয়াছে। যাতায দুই দিকের ভিত্তিতে চাষ আবাদ হয় তাহা

বেশ বোকা যায়। এসব অকলে কুটীর চাষ বেশি হয়; লোকে কুটী (Corn) খাইতে ভাল বাসে। কিন্তু সে ক্ষুদ্র পল্লী বা আটীর কুটির দাম বেশি নয়। মাল চলাচলের এমন সুস্থর ব্যবস্থা আছে যে কালিকোর্নিয়ায় কমলা লেবু ৩০০০ মাইল দূর নিউ ইয়র্কে খুব বেশি দরে বিক্রয় হয় না। বেলজিয়ারেট-এর এমন ব্যাপক ব্যবস্থা যে ১২ মাস ফল তরকারি প্রায় একই দরে বিক্রয় হয়।

আমাদের গাড়ি ২০০ মাইল চলিছে প্রায় ১২টার সময় এক ছোট দহরে বাধিল। আমরা সকলে ছুপুয়ের খাবার সারিধা নিলাম। তারপর আবার গাড়ি চলিল।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া United Nations Bulletin পড়িলাম। প্রোগ্রাম পড়িলাম যে অনেক গোলমালের ব্যাপার। Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, General Disarmament Commission, তারপর আবার General Assembly সব কাউন্সিলেরই প্রোগ্রাম আছে। যেহেতু পাকিস্তান Security Council-এর সম্প্রতি সভা নিবৃত্ত হইয়াছে সেই হেতু আমাদের সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রোগ্রাম বহিরা চলিতে হইবে। General Assembly সকলের অন্ত। নিরাপত্তা পরিষদে কয়েকটি প্রস্তাবের খণ্ডা দেখিলাম। তাহাতে যাকী খাদীন দেশতলিক U. N. এর সভা করিবার প্রস্তাব, মিশর ও সুয়েজ খালের বিবাদ, হাঙ্গেরীতে বন্দী আমেরিকানদের অস্ত্রস্থানার বিষয় ও আরো কয়েকটি বিষয় আছে। আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে আমরা ইচ্ছা করিলে যে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারি। সেজন্য কান্ট্রের "Free and Impartial Plebiscite"-এর প্রস্তাব করিয়া বলিয়া দিক করিলাম। খণ্ডা করিবার তার আমরা উপর পড়িল।

সভা সাড়ে ছোটোর সময় ম্যাডিসন দহরে প্রবেশ করিলাম। ম্যাডিসনের কিছু আগে থেকেই লক্ষ্য করিলাম যে সব বরফ গলে নাই। শীতও বধে। কিন্তু গাড়ির মধ্যে গরম করিবার ব্যবস্থা থাকায় আমরা শীতে কোনও কষ্ট পাই নাই। সঙ্গে গরম কাপড়ের ব্যবস্থাও ছিল। ডা ছাড়া, এখানে যে কোনও আচ্ছাদনের মধ্যে তাপ নিঃসরণের ব্যবস্থা আছে। এখানে ভিক্ষুক বলিতে গেলে নাই; কিন্তু বাধা আছে (বয়স ৬০৭০) তাহারাও আমাদের মদ্যবিশেষের চাইতে ভাল ভাবে থাকে।

উইল্ফ্রনদিন এখানেই অন্ততম প্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা নাকি প্রায় বিন হাজার; সব কিছুই এখানে শেখান হয়। হার্ভার্ড (Harvard) ও ইয়েল (Yale)-এর পর প্রিন্সটন, জনস্ হপকিন্স, ইলিনক, মিনিগান, উইল্ফ্রনদিন প্রভৃতির স্থান। ইহা পরকার পতিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়, সুতরাং যেতন অপেক্ষাকৃত কম; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যেতন বছরে ৬৭ শত ডলার পর্যন্ত আছে। আমরা প্রথমে গিয়া Registration সারিধা লইলাম, তারপর আমাদের অন্ত নির্দিষ্ট ঘরে গিয়া জিনিসপত্র রাখিরা খাওয়া দাওয়া শেষ করিলাম। রাত্রি আটটার সময় মিঃ উইলিয়াম এপ্‌স্টিন-এর বক্তৃতা শুনিলাম।

সভাপতি মহাশয় মিঃ এপ্‌স্টিনের পরিচয় দিলেন যে তিনি ক্যানাডার একজন বি. এ, বি. এস; যুদ্ধের সময় সিপাহী (Private) হইয়া গৈর বিভাগে চুকিয়াছিলেন; বধন ছাড়া পাইলেন, তখন ডালার পর ছিল Captain-এর। দেখিয়া মনে হইল বয়স চল্লিশ বছরের বেশি নয়। আর, বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল যে, শিল্পোন্মাদ বি. এ, বি. টি, বি. এস তারের চাইতে উচ্চ "মেকদার"-এর নন। এপ্‌স্টিন মহাশয় ইউনাইটেড নেশানের গেজটাক্সিয়েটে বড় চাকুরে।

সভা নভেম্বর মাসে জেনারেল এলেন্সের
প্যারিস অধিবেশনে কি হইয়াছিল এপ্‌স্টিন তাহার
একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেন। রাশিয়া, ইংল্যান্ড
ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের গোপন
অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইউ. এন. ও.
পৃষ্ঠি হইবার পর এই প্রথম তাহার কতকগুলি
বিষয়ে একমত হইলেন; আরও কতকগুলি বিষয়ে
একমত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও বোঝা
করিলেন। কিন্তু কি যে সে সব বিষয় তাহার
বিশ্বাস্যতা আত্মপ দিলেন না।

যুক্তার পর এপ্‌স্টিন মহাশয়ের অগ্র পৃথক
একটা অত্যর্থমূল্য বাবদ হইল ছাত্রদের
ইউনিয়ন বিল্ডিং। এটাও চার তলা দাগান।
আধুনিক সব কিছুই সুব্যবস্থা আছে। ক্লাব,
নাচের ঘর, ক্যাটিন, ক্যাম্পেটা-রিয়া, গ্রীল, লাইব্রেরী
সব কিছু আছে।

Reception-এ কফি ও কেক বিতরণ করা
হইল। আমরা খোলাখুলি আলাপ করিলাম।
তিনিও অগ্র কিছু খোলাখুলি কথাবার্তা বলিলেন।
ইউ. এন. ওর উদ্দেশ্য সকল হইবে কিনা;
সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক দেশগুলির অগ্র কমিউনিজমের
প্রণায় হইবে কিনা; বর্তমানে যে ভোটের
ব্যবস্থা তাহা গণতন্ত্রসমূহ নয়, কারণ ভারত, চীন
ও পাকিস্তানের লোকসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক,
তাহাদের অর্ধেক ভোট পাওয়া উচিত, বর্তমান ২০
ভোটের মধ্যে অর্ধেক-২৫ ভোট হওয়া উচিত, কিন্তু
তাহা না হইয়া যে দেশের লোক সংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ
সে দেশের এক ভোট আর যে দেশের লোকসংখ্যা
৩৬০ লক্ষ তাহারও এক ভোট; ফ্রান্সের ইকো-ডীন
ও টিউনিজিয়ার সাম্রাজ্যবাদের এবং ইংলণ্ডের
নুয়েকমাল ও নুদানে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করিলে
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অক্সফোর্ড দেশ এশিয়ার
প্রধানভূক্তি হারাইবে, ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলাপ
আলোচনা হইল। সহজ ভাষায় পট প্রদর্শিত।

করিতে আমি পূর্বে পট, আমার তাহাতে কোনও
চক্কলনা নাই। তাঃ আফির হোলেন এবং
মনকহালাজী তাহা জানেন। আমার প্রায় তিনি
কিছু এড়াইয়া গেলেন। তিনি ইউ. এন.-এর একজন
চাকুরে; প্রকৃত দৃষ্টি বা কোন দোষ থাকে তাহা
তিনি কৃত্তা হইয়া কেমন করিয়া পরিষ্কার তাহা
বোঝা করেন? তবুও কিছু কিছু বোঝা
করিলেন। আমার প্রায়ও উদ্দেশ্যমূলক এবং
তাহাতেই উত্তর জড়িত ছিল। আইনের ভাষায়
ইহাকে Leading Questions বলে। তিনিও
বুঝিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং উপস্থিত সকলেই
বুঝিল।

এই কফি আসরে এক মাস্তাজী ছাত্রের সঙ্গে
পরিচয় হইল। তাহার নিকট জানিলাম যে
এখানে বাঙ্গালী ছাত্রও আছে, পাকিস্তানীও আছে।
মোটমোট প্রায় ৩০০ জন ছাত্র থাকে ভারত
হইতে আসিয়াছে।

যাত্রি ১১টার সময় বিদায় লইলাম। আমাদের
ঘরে তাঃ স্টিংবার্গ, আমি ও মিঃ জোন্স নামে
আমার এক প্রতিবেদী ছাত্র। তাহার দুইজন
ভাইয়া পড়িলেন; কিছু পড়াশুনা করিয়া কান্ট্রী
সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া করিয়া যাত্রি প্রায় একটার
সময় শুইতে গেলেন।

বহুবে বিছানা; ছোট বড় হিন্দুনা ভোয়ালে।
ছোট একটুকরা নুতন সাবান আর মাখনের মত
মোলায়েম বালিশ। শুইয়া মাত্রই ঘুমাইয়া
পড়িলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দান লাগিয়া সকলে
Union Building Canteen এ গিয়া খাওয়া
শেষ করিলাম। অর্থনৈতিক ও সামাজিক
পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিলাম। পাকিস্তান
তখনও পর্বত ইহার সভা। ঐদিন General
Assemblyর দুপুরে সে অধিবেশন হইবে তাহাতে
পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সভা নির্বাচিত

হইবে। সুতরাং বর্তমান পর্যন্ত Economic and Social Council-এর সভা আছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাতে প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে। সেখানে গিয়া দেখি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন মূলমনি ছাত্র, একজন বাঙ্গালী ও আর একজন যুক্তপ্রদেশের কিন্তু ছালে করাচীর—বর্ণক হইয়া আলোচনা গুনিতে আসিয়াছেন। বাঙ্গালীর সাথে বেশি কথাটা আলাপ করিলাম। তিনি তাঁহার বাঙ্গালী বিকালে আইবার কল্প নিময়ন করিলেন।

এখানেই সানিয়ার প্রতিনিধি কমিউনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিকে অধিবেশনে যোগ দিবার প্রস্তাব করিলেন। উক্তগণের প্রতিনিধি আগন্তি করিলেন। আমি প্রস্তাব করিলাম যে তিনি আলোচনার যোগ দিতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারিবেন না। অতঃপরে সভাপতি মহাশয় কলিং দিলেন যে এ বিষয়ে Security Council-এর কোনও হাত নাই।

আমি বন্ধুদের গোষ্ঠীক সেখানে তিন দিন দিনরাত পড়িয়াছি। ট্রাউটার, মলা-বড় কেপ-কলার পন্থী কোট ও মাথার মালা টুপি। পাক-ভারতের যে কতজন ছাত্র দেখিলাম সকলেই একেবারে গোষ্ঠীক পড়িয়া থাকেন। নিজের দেশের নিজের গোষ্ঠীক পড়িতে যোগ হয় গজা পান।

কালুয়া ননী জলের ইংরেজী ভাষার উপর মোহ দেখিয়া হাহাকার করেন। ননী জলের ঘোষ কি? গত শীতকালে যখন দিল্লীতে ছিলাম একদিন সকালে লোহী ঘোড়ে গিয়াছিলাম। পরনে ঐ বাঙ্গালী ব্রহ্মপোষাক, মাথায়ও যখন টুপি, বাবা দেখিয়া হাসিয়া খুন : বলেন, দিল্লীপ, দেখে কি, আমাকে ছেবে কি? আরও যত্নব্য করেন, হী, জাহিয়ারিলিয়ার ঐ পবে বটে। পরমকালে তিনি বন্ধুদের হাতকাটা। মালা বুলাট ও ট্রাউটার পরেন, দেখিয়া তুলসী বনের বাগের কথা মনে পড়ে। শুধু তিনি নন; ইক-ভারতীয়, একলা স্বদেশসেবী কিন্তু বর্তমানে সংকয়ের বড় বড় চাকুরে থেকে ছোটখাট এমিস্ট্যাট মেক্রেটারি পর্যন্ত ঐ আমেরিকান গোষ্ঠীক নবা দিল্লীতে প্রায়ই চোখে পড়ে। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজিয়ারা আঁকিয়া বসিয়াছে। কালুয়ার হাহাকারে কোনই ফল হইবে না; ননী জলের কোনই ঘোষ নাই। দুই পাতা ইংরেজী পড়িলেই যখন বাবু হওয়া যায়, এবং বাবু হওয়াটাই যখন সম্মানার্থ, তখন গ্রাম্য অজ্ঞ লোকের ঘোষ কি? “বৈকুণ্ঠের উইলে” গোহুল গ্রাজুয়েট তাইকে জাকিয়া কেন বলিবে না, “তুমি হুম্মের সাথে ইংরেজিতে কেন কথা বল না?”

(কথনঃ)

শিশুরা মিথ্যাকথা বলে কেন ?

[শ্রীকুলদাসপ্রসাদ চৌধুরী]

মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস ছেলেমেয়েদের মধ্যে। আমাদের ঘূলে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৯ খৃঃ আমেরিকার ডেট্রয়েট মনোবিজ্ঞান ত্রিভিকের অঙ্কনকার্যের ফলে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৪৮ জন শিশু মিথ্যা কথার সাহায্যে প্রত্যা-
কথার অভ্যাস হইয়া উঠে। আমাদের দেশে ঐক্লপ কোন অঙ্কনকার্যের সাহায্য জানা না থাকিলেও মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ছেলে-
মেয়েদের মধ্যে। আমাদের ঘূলেও কম নয়। গত ২২।২৩ বৎসরে, বিশেষ করিয়া বিগত বিশ্বযুদ্ধের
কৃপায় মিথ্যাকথা এবং প্রত্যাশনা আমাদের সমাজে
এবং ঘূলে প্রায় বাণ্যবিক ব্যবহারের মধ্যে
থাকিয়াছে। কাহারও কথা আর আমরা সহজে
বিশ্বাস করিতে চাহি না। পরস্পরকে মিথ্যাবাদী
অজ্ঞান করিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে
সামাজিক সম্বন্ধের আবস্ত হয়। নিজেরা যাচাই
করি না কেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিথ্যাকথা এবং
মিথ্যা ব্যবহারকে আজও আমরা অব্যাহত
ব্যবহারের মধ্যে অন্ততম বলিয়া জ্ঞান করি।
মিস্ট্রী স্টেটাল ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনে ডাঃ
ই, এ, পিয়ার্স্‌ ছাত্রদের মধ্যে সচরাচর দুই এক শত
অব্যাহত ব্যবহারের ওপর নির্ণয়ের নিমিত্ত দুই শত
শিশু-শিকা বিভাগের ছাত্রের সম্মুখিত গ্রহণ
করেন। এই অঙ্কনকার্যে অব্যাহত ব্যবহারের দিক
হইতে ওপর বিভাগে মিথ্যাকথা সপ্তম স্থান অধিকার
করে।

মিথ্যাকথা একদিন আমাদের সমাজে বিশেষ
বৃদ্ধি কার্য বলিয়া গণ্য ছিল। গতাব্যাহত
সময়ে শাস্ত্রের বচন, পুরাণের দৃষ্টান্ত এবং নীতি-
শাস্ত্রের গল্প মিথ্যাকথারূপে লিপ্যে দিতে

আমাদেরকে সর্বদাই সচেতন রাখিত। আজও
ছাত্রদের মধ্যে মিথ্যাকথা শিক্ষকদের বিশেষ ক্রুদ্ধ
করিয়া তুলে; মিথ্যাবাদী ছাত্রই কঠোর শাস্তি লাভ
করে। শুধু আমাদের অনেকেরই হস্ত মিথ্যা
কথার অপকারিতা সম্বন্ধে সত্যকথা ধারণা নাই।
কার্যকারণ জ্ঞানের অভাবের ফলে মিথ্যাবাদীর প্রতি
ক্রোধ প্রকাশ এবং উৎপীড়নই শুধু হয়, তাহার
ব্যবহারের পরিবর্তনে প্রস্তুত হয় কোন কাজে লাগে
না। মিথ্যাকথার আমাদের ক্রুদ্ধ করিয়া তোলে
প্রধানত দুইটি কারণে। (ক) শিশু মিথ্যাকথা বলিয়া
ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা আমাদের
আত্মাভিমানকে আঘাত করে। ফলে শিশুকে
আপন প্রতিদ্বন্দী জ্ঞান করিয়া শাসন করিতে প্রবৃত্ত
হই। (খ) অজ্ঞানের মতে যে কাজের অন্ত
আমাদের নিজেদের মনে অপরাধবোধ থাকে,
অন্তকে এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে আমাদের
শাসন প্রবৃত্তি উদ্র হয় উঠে। মিথ্যাকথা বলা
সময়ে আমাদের নিজেদের মনে যে অপরাধবোধ
প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাই ছেলেমেয়েদের
মধ্যে এই অপরাধ দেখিলে কঠোর শাস্তি বিধান
করিয়া হস্ত আনয়ন আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি।

মিথ্যা বলা যে শুধুতর অসৎকার্যের ব্যবহার, তাহা
অস্বীকার করি না—এ অজ্ঞান পরিবর্তনের ক্ষমতা
যে শাস্তিবিধানের প্রয়োজন না হইতে পারে
তাহাও বলি না, তবুও এই কথা মনে রাখিতে
হইবে যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া যে শাস্তির বিধান
হয় তাহাতে কুল হয় বিপরীত। শাসক এবং
শাসিত প্রতিদ্বন্দীত্ব ভূমিকা অধর্মান হইলে শুধু
ভিত্তিকতারই উদ্ভব হয়। শাসিতের ব্যবহারের
পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলতা আনা থাকে না। কার্য

কাগজ সবচেয়ে দ্রুত বিক্রি মিথ্যা কথা
অবাক্যবোধের উপলব্ধি, ছাত্রদের মিথ্যা বলার
প্রণোদিত হওয়ার কারণ এবং কি করিয়া শিক্ষক
ছাত্রদের এই আবাক্যবোধ অবস্থা হইতে
জ্ঞান করিতে পারেন তাহার আলোচনা করা এই
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মিথ্যাকথা কেন অবাক্যবোধ ?

(ক) সামাজিক জীবনে মিথ্যা বলার মত
অনিষ্টকর অভ্যাস কমই আছে। পশ্চাত্যের প্রতি
বিদ্বান, একের সঠিত অপরের সবচেয়ে প্রতি
অবিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রীতিপ্রসূ লবণ কিছুতেই
স্থাপিত হইতে পারে না। বর্তমানে যিনি এম.
আমেরিকার মধ্যে যে এম চলিতেছে, পশ্চাত্যের
প্রতি অবিশ্বাস যে তাহার অন্তঃকরণ কারণ তাহা
সর্বজনস্বীকৃত। মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা ব্যবহারই
পশ্চাত্যের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। যিনি
এম আমেরিকার মধ্যে কেহ হয়ত বৃদ্ধ কামনা
করে না, তবু একের সত্যবাদিতার উপর অপরে
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ফলে উভয়
পক্ষই বৃদ্ধ সজ্ঞার ব্যাপৃত এবং আশঙ্কা হয় যে
নিজেরই ইচ্ছার বিপরীতে চরম দুঃখে লিপ্ত হইয়া
পড়িতে পারে। বৃহত্তর সমাজে যে নিম্ন সত্য,
বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সমাজেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না।
বর্তমানে পুঁথিগত অগণক্য ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের,
এবং ছাত্রদের পশ্চাত্যের মধ্যে বেলারের তত্ত্ব
বিদ্যা শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা
হয়। ফলের সামাজিক জীবন ভ্রান্তভাবে গড়িয়া তুলিতে
পারিলে, শিক্ষকের শিক্ষাদান সমস্তার যীবাংসা
অনেকটা আপনিই হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়সমাজে
বাস করার তত্ত্ব দিয়াই ছাত্রগণ আপনা হইতে
প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইয়া যায়। আদর্শ স্কুলসমাজ
গঠন করিতে হইলে ঐ সমাজ হইতে মিথ্যাকথা
এবং মিথ্যা ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে
হইবে। আদর্শ সমাজে পশ্চাত্য পশ্চাত্যের সহিত

অতি ক্ষুদ্রক্ষেত্রে এবং অতি অল্পবয়সে প্রবৃত্ত।
একের অবাক্যবোধ ব্যবহার দৃষ্টেই অপরের উপর
প্রভাব বিস্তার করে এবং বিদ্বান সবচেয়ে মত সমগ্র
সমাজমধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাতে গঠিত অস্ত্রের
সৃষ্টি করে। একটি মিথ্যাবাদী ছেলেও বিদ্যালয়-
সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। একের ভ্রান্ত লবণ
ফলের আবহাওয়া দূষিত হওয়া অসম্ভব নহে।
মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা ব্যবহারকে তাই সর্বপ্রথমে
বিদ্যালয়সমাজ হইতে দূর করা প্রয়োজন।

(খ) মিথ্যা কথা বলার ফলে মিথ্যাবাদী ছেলের
ব্যক্তিগত কতিও কম হয় না। যন্ত্রাতিরগণ
নিরাপত্তাবোধকে (need of security) ব্যক্তির
যেহেমন বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে
করেন। আপন না হইতে পারিলে নিরাপত্তাবোধ
আগে না। বিদ্যালয়সমাজে অস্ত্রের সহিত পৃষ্ঠিত
না হইলে কোন ছেলেই স্বস্তিবোধ করিতে পারে
না। মিথ্যাবাদী কাহারও আপন হইতে পারে না।
ফলে সে নিজেকে আপন করিয়া তুলিবার লোভে
হয়ত আরও মিথ্যার ভালে ছড়াইয়া পড়ে এবং
আরও নানাক্রম অস্বাভাবিক কার্যে প্রণোদিত হয়।
অনেক সময় সমাজপরাণীসের মিথ্যা বল গড়িতে
চেষ্টা করে। মিথ্যাবাদী সত্যই মহাজনুতির পাত্র।

(গ) সমাজের অশ্রদ্ধা হইতে মিথ্যাবাদী
নিজেকে বকা করিতে পারে না। অস্ত্রের অস্ত্রের
সে নিজেকেই নিজে অশ্রদ্ধা করে। নিজের প্রতি
প্রচার অভ্যাস ঘটিলে চরিত্রগঠন প্রায় অসম্ভব হইয়া
পড়ে।

(ঘ) প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস
মানসিক রোগের লক্ষণ। যে ছেলে মিথ্যাকথা বলে
সে আপন পারিপার্শ্বিকের সহিত বাণ বাণ্যাইয়া
চলিতে পারিতেছে না বুঝিতে হইবে। মিথ্যাকথা
বলার অভ্যাস আরও বড় শিশুর পক্ষে মাত্র।
প্রথম হইতেই সাবধান হইয়া কারণ অস্বপ্নজন
করিয়া প্রতিবিধান না করিলে মানসিক রোগের

আক্রমণের কালে ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন চাই

সকল বর্ষশাস্ত্রেই বেদন পাগকে ঘৃণা করার বিধান আছে যেমন পাগকে ঘৃণা করিতে নিষেধ আছে। আমরা কিন্তু তাহার ঠিক উল্টো ব্যবহার করিয়া থাকি। পাগকে দত্তখানি বা ঘৃণা না করি পাগকে তাহার চাইতে বেশী ঘৃণা করিয়া থাকি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিজের মনের অপরাধ বোধ হইতে এইরূপ হইয়া থাকে। তাই দ্বন্দ্ব শিক্কপদ মিথ্যাবাদী ছেলের নামেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। শিক্কপদ দৃষ্টিভঙ্গি অতি সহজেই অপরাধের ছাত্রের মধ্যে সংজ্ঞামিত হয়। মিথ্যাবাদী ছেলে সমগ্র জ্বলের ঘৃণাই হইয়া উঠে। ঘুরে ঘুরে দিয়া কাহারও ব্যবহারের পরিবর্তন হয় না। ভালবাসিয়া কাছে না টানিলে শিক্ক দেওয়া অসম্ভব—তাই মিথ্যাবাদী ছেলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন। যেন ঘাখিতে হইবে মিথ্যাবাদী ছেলে শুধু দুষ্টামির আনন্দের মিথ্যা কথা বলে না। সে কোন সমতান মাস্থের রূপ ধরিয়া অনুগ্রহণ করে নাই। অস্ব হইতেই সে কিছু অপরাধ প্রদর্শন নয়। তাহাকে মিথ্যাবাদী করিয়া তুলিবার জন্য আমাদের বহুতরের দায়িত্ব কম নয়। পরিবার, স্কুল এবং সমাজের পরিচিতিই দ্বন্দ্ব তাহাকে মিথ্যাবাদী করিয়া তুলিয়াছে। মিথ্যা কথা বলার দক্ষণ সে আমাদের বিয়ক্তি উৎসাহন করিতেছে বটে কিন্তু সে নিজের অনিষ্ট ও কিছু কম করিতেছে না—মিথ্যা কথা বলিয়া সে নিজেকে কম অগ্রসরী করিয়া তুলিতেছে না। মহাদুষ্টি মহাকারে মিথ্যাকথা বলার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ঐ অস্বভাব অবস্থা হইতে ছাত্রকে উদ্ধার করিতে সাহায্য করা কর্তব্য। অনেকের লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কঠোর শাসনেও মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস পরিবর্তিত হয় না। শাসন করিয়া

মিথ্যাকথা বলা যে অস্বভাব তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রের অন্তরতম প্রদেশে মিথ্যাকথা বলার জন্য কখনও সমর্থন থাকে না। মিথ্যাকথা বলা অল্পে অল্পে তাহার কাছেও সমান অস্বভাবিক। কি করিয়া ঐ অভ্যাস হইতে মুক্তি পাওয়া যায় সেই পথ আমাদেরকে দেখাইয়া দিতে হইবে এবং ঐ পথে চলিতে ছাত্রকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমরা শুধু শাসন করিয়াই চলি তবে ছাত্রের অন্তরে শুধু বিদ্বেষই জাগাইয়া তোলা হইবে। শাসকের উপর অসহ্যের যে প্রতিশোধ নেওয়ার মনোবৃত্তি তাহার কালে সে দ্বন্দ্ব আরও অধিক মিথ্যাকথা-প্রবণ হইয়া উঠিবে।

মিথ্যাকথা বলার কারণ

কি কারণে ছেলেরা মিথ্যাকথা বলিতে প্ররোচিত হয় তাহাই আমাদের সর্বপ্রধান অধ্যয়নের বিষয়। অতিক্রান্ত অতিবর্তিত বা কাল্পনিক বিষয় দেওয়ায় মিথ্যা কথা আশ্রয় দেওয়া বাইতে পারে। এক হিসাবে আমরা সবাই মিথ্যাবাদী। দুষ্ট বা ততোধিক প্রত্যক্ষদর্শীকে একই ঘটনার বিষয়ে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছে যে একের বর্ণনা অন্যের সহিত মিলে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনের প্রবণতা, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি অনুসারে নিজের অজ্ঞাতেই বর্ণনার অতিক্রান্ত পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করিয়া থাকেন। একই কারণে অতিক্রান্ত উপর কল্পনার প্রলেপও পড়ে। জাতসারে বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া অতিক্রান্ত বর্ণনার যে পরিবর্তন, পরিবর্তন, এবং কল্পনার বৎ কল্পনো হয় তাহাকেই শুধু আমরা মিথ্যাকথা বলিয়া গণ্য করি। মিথ্যা কথা তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম এবং উদ্দেশ্যের ভালমন্দ হিসাবে মিথ্যাকথার ভালমন্দের বিচার হইয়া থাকে। মিথ্যা কথা বলার ছাত্রের কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য হইতে পারে তাহাই বিচার।

(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মবক্ষার্থে মিথ্যাকথা ব্যবহার হয়। সমাজপন্থ্যের বস্তুত্ব স্বীকার করিতে নিতদের সময় লাগে। আমাদের সমাজে বর্তমান অবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজপন্থ্য নিত জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজননিবৃত্তির পথে অন্তর্ভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, নিতমনে ঐ পন্থ্যসত্ত্ব করার প্রবৃত্তি আগে এবং অধিকতর কমতাপালী সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বের শাসন এড়াইবার নিমিত্ত নিতরা মিথ্যাকথার প্রবৃত্তি হয়। যখন ক্রমে জ্যামিতি পড়ান হইতেছে—বিষয়বস্তু বা পড়ানোর পদ্ধতি কিছুই নিতমনের উপযুক্ত নহে। শুধু শাসনের ভয়েই নিতরা মন দিতে বাধ্য হইতেছে। এমন সময় বাহিরে দিনেমার হাতবিল বিলির বাস্তব জিনিষ শুনিয়া কোন ছাত্র শিক্ষক মহাপ্রভুর দৃষ্টি এড়াইয়া জানালা দিয়া চুপি দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বরা পড়িয়া বেত্রাঘাত এড়াইবার জন্য অমানবধনে সে মিথ্যা করিয়া বলিল যে সে মনোযোগ সহকারে পাঠ গ্রহণ করিতেছিল। হুঃ এবং পুরস্কারের সাহায্যে যেখানে আমরা ছাত্রদের “সংগঠন” আনিতে চেষ্টা করি সেখানে আত্মবক্ষার্থে মিথ্যাকথা বলার অভ্যাস বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য। প্রথম হইতেই আমাদের ধারণা যে “সংগঠন” চলা ছাত্রদের স্বভাব বিরুদ্ধ। শাসনের ভয় এবং পুরস্কারের লোভ না থাকিলে তাহারা সত্যব্যবহারে প্রণোদিত হইবে না। কিন্তু একথা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, যে স্থলে নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি আকর্ষণ অধিক অথচ শাসনের ভয় এবং পুরস্কারের লোভও প্রবল সেই স্থলে স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রগণ মিথ্যাকথা এবং মিথ্যাব্যবহারের আশ্রয় নিতে প্রস্তুত হইবে। প্রথম প্রথম দরত বা অন্তরে কিছুটা মানি হইতে পারে কিন্তু অভ্যস্ততার ফলে বীণে বীণে তাহা দূর হইবে।

(খ) অনেক সময় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে দ্বিগত এবং দণ্ডনাত্মক এক প্রতিযোগিতার আবহাওয়া

সৃষ্টি হয়। ঐসব ক্ষেত্রে শিক্ষক ঠকানো ছাত্রদের সমাজে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। সহ-পাঠীদের মধ্যে যত বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষার অনেক ছাত্র মিথ্যাকথা বলিতে প্রস্তুত হয়। বৈষাচারী শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে মিথ্যাকথার প্রচলনের জন্য অনেকটা দায়ী।

(গ) এতদ্ব্যতীত নানারূপ মনোবিকারের ফলেও ছাত্রগণ মিথ্যাকথার প্রবৃত্তি হয়। বাহ্যিক কঠোর শাসনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়—বাহ্যিক মনের আকাঙ্ক্ষা পিতামাতা, অভিভাবকদের দ্বারা পথে পথে ব্যাধিত হয় তাহারা অনেক সময়েই স্বয়ং বাস্তবতাকে পিতামাতা বা অভিভাবকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে। শিক্ষক বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঐরূপ ছাত্রদের ভালবাসা আকর্ষণ না করিলে তাহারা মিছামিছি শিক্ষকের প্রতিকূলতা করিয়া আনন্দ পায়। ঐরূপ ছাত্র শিক্ষকমহাপ্রভুর ঠকাইয়া, বাগাইয়া, তাঁহার কাজে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করিয়া আনন্দলাভের নিমিত্ত অনেক সময় মিথ্যাবলার প্রবৃত্তি হয়।

অনেক ছেলে আবার পারিপার্শ্বিকের ফলে নিজেদের মনে মনে হের ভাবিতে অভ্যস্ত হয় (Inferiority Complex)। তাহাদের মন ভিতরে ভিতরে অপরাধে ভাবাজ্ঞাত থাকে কিন্তু বাহিরে সে নিজেদের নির্দোষ এবং ভাল বলিয়া জাহির করিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফলে সে মিথ্যাকথার অভ্যস্ত হইয়া উঠে। নিজের গুণবস্তু প্রকাশ করিতে কত অল্প অল্প প্রয়াসই না সে ঘটনা করিয়া সহপাঠীদের তলাইয়া থাকে। পিতামাতা এবং শিক্ষকও সব সময় তাহাদের গল্পের হাত হইতে নিত্যর গান না। সে নিজেও দরত বলে যে স্নোডারা তাহাদের গল্পে আদ্য স্বাপন করিতে পারিতেছে না তথাপি যেন নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ‘মিথ্যাকথা’ বলিয়া চলে। ঐরূপ ছেলের মিথ্যাকথা বলা বাইরে মত হইয়া দাঁড়ায়।

শিক্ষাবাদী ছাত্রের ব্যবহারের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিশেষ অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন।

(ক) সাধারণভাবে স্কুলের আবহাওয়ার জটিল সংশোধন করিতে হইবে। শিক্ষকদের বৈগাচায়েক সর্বপ্রথমে স্কুল হইতে দূর করিতে হইবে। বিদ্যালয়-সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ বলিয়া জান করিতে হইবে। এই সমাজে ছাত্রগণ শুধু আজাবাদী নহে। সকল ব্যবহার ছাত্রের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সুবিধা অসুবিধা শিক্ষককে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। পরিচালনার স্বাধীনতার দায়িত্ব ছাত্রদের নিজের উপর হাড়িয়া দিতে হইবে, তাগাদা যেন সর্বাবস্থায় অল্পকাল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। কলে "সংকর্ষ" ছাত্রদের প্রবণতা তদ্ব্যবহায়ে। শাসনের তর বা পুরস্কারের লোভ দ্বারা সংকর্ষ আকর্ষণ করে না। অল্পকাল আবহাওয়ার ছাত্রদের শিক্ষাকথা বলার প্রয়োজন দূর পাইবে। সাধারণত ক্রোধের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত নহে। ঐক্য বিদ্যালয়-সমাজ গঠন করা পূর্বে কঠিন কাজ সম্ভব নাই, কিন্তু এই কার্যে সফল হইলে শিক্ষাদান কার্য অতি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিবে।

(খ) শাসন বা পুরস্কারের সাহায্যে আচরণ পরিবর্তনের চেষ্টা স্বাধীনতার পরিভ্রাণ করিতে হইবে। শাসন করিতে বাধ্য হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, অপরাধ যত শুদ্ধতরই হউক না কেন শিক্ষাকথা বলার দণ্ড সর্বদা উদ্দেশ্যে শুদ্ধতর।

(গ) শিক্ষাবাদী ছেলে অনেক সময় গড়ানোর পক্ষাংগ থাকে। স্কুলের কাজ যদি তাহার ভাল লাগে, স্কুলের সমাজে সে যদি অপর

দশজনের একজন হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে শিক্ষাকথা দণ্ডের প্রয়োজন এবং প্রযুক্তি আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। কাহ্নেই কোন ছেলে বাছাতে স্কুলের কোন কাজে পক্ষাংগ না থাকে, প্রতি ছেলে কোন না কোন কাজে অগ্রণী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঘ) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহের সম্বন্ধ গড়িয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন। বয়স্কদের প্রতি এবং তাহাদের বিষয় পৃথক্যের প্রতি অল্পকাল মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে যাতায়াত বা অভিভাবকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছাত্রের প্রতি বাড়ীর আচরণে পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বাবস্থায় শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনোভাব দূর করা প্রয়োজন।

(ঙ) ছাত্রের মধ্য হইতে হীনতার মনোভাব দূর করিতে হইবে। অপরাধ করিলে তাহার সমালোচনা না করিয়া, কি করিলে সে ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে সেই পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। প্রথম প্রথম সহজ কাজ করিতে দিয়া ধীরে ধীরে তাহার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে। স্কুলের অপর দশজন ছাত্রের মত সকল কাজ করিতেই সে সক্ষম এই বিশ্বাস তাহার মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহার মত ছেলের পক্ষে বাহা সম্ভব তাহা অপর দশজন ছেলের মত সেও করিতে সক্ষম। কথাবলাব চাইতে তাহাকে কাজে নিযুক্ত রাখার অবিকল্প চেষ্টা করিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

[ত্ৰিখণ্ডকল্পক সেন]

শিক্ষাব্রতী । ববীন্দ্র-সংখ্যা ।

সম্পাদক, ত্ৰিখণ্ডকল্পক সেন। ১৪এ
কুদিয়ায় বোস হোড, কলিকাতা ৬ । ২৪শে
ঠেংলাখ, ১৩৪২ । মূল্য এক টাকা ।

শিক্ষাব্রতীৰ ববীন্দ্র-সংখ্যা পড়িয়া বিশেষ ক্রীতি
লাভ কৰিলাম । ববীন্দ্রনাথৰ স্মৃতিমিত্তে, শিক্ষা-
ব্রতীৰ তৃতীয় বৰ্ষে এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে
ববীন্দ্রনাথৰ মৰ্যাদা বক্ষা কৰা হইয়াছে, স্বীকাৰ
কৰি । চিত্ৰেৰ প্রচুৰ, মুদ্রণ ও প্রকাশনেৰ
দোষ্টবে, এবং প্রবন্ধ গৌৰবে বাঙ্গালী পাঠকেৰ পক্ষে

ইহা আদৰ্শগীৰ সংখ্যা । আচ.ৰ কিৰিমোহন সেন,
ত্ৰিখণ্ডকল্পক সেন, ত্ৰিখণ্ডকল্পক সেন, ত্ৰিখণ্ডকল্পক
সেন হাৰ্ডগুপ্ত, ইহাৰেৰ প্রবন্ধচক্ৰেৰ বিশেষ কৰিয়া
শিক্ষাব্রতীৰ অন্ত লেখা, অস্তান্ত বচনাৰ পত্ৰী আৰও
প্রমাণিত, সাধাৰণ পাঠকেৰ অন্ত লেখা । অনিল-
বাবুৰ মহাস্বা পাত্ৰী ও কবিশুৰ ববীন্দ্রনাথৰ
শিক্ষাব্রতীৰ তুলনামূলক আলোচনা স্মৃতিমিত্তে হইয়াছে ।
আমরা আশা কৰি, এই সংখ্যাৰ আদৰ্শে শিক্ষাব্রতী
মধ্যে মধ্যে অন্তান্ত বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ কৰি
বাঙ্গালী শিক্ষাব্রতীকে প্রচুৰ আনন্দ দান কৰিব
যাবহা কৰিবেন ।

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকর कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति

১০ম বর্ষ

আষাঢ় ১৩৫৯

৮ম সংখ্যা

আলোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

ভারত সরকারের নির্দেশক্রমে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেতৃষ্ণ ও সমাজসেবার পরিশ্রমিতে এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করিবেন। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে ছাত্র নির্বাচনের পদ্ধতি ও বর্তমান পাঠ্যক্রম ইত্যাদির পরীক্ষার বিবরণ হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাগুলিকে পড়াশুনাগতিক পন্থার পরিবর্তে সজীব কর্মমুখী করিয়া তোলার বিষয়ও ইহারা বিবেচনা করিবেন।

শিক্ষকের শিক্ষণ, তাহাদের বেতন ও ভাতা নিধারণ, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপরে বর্তমান অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার বিষয় কমিশন বিবেচনা করিবেন। মাধ্যমিক শিক্ষার আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরাজি ভাষার স্থান নির্ধারণ করা ইত্যাদির অন্ততম প্রধান কাজ হইবে বলিয়া প্রকাশ।

সাক্ষাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইন-চ্যান্সেলার ডাঃ লক্ষীবাঈ মুদালিয়ার এই কমিশনের সভাপতি

নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা পেরিয়া সুনী হইলাম দ্বিতী পেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনের অধ্যক্ষ ক্রীমনাথনাথ বসু এই কমিশনের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কমিশনের অন্ততম সভ্যও হইবেন। আমরা ইহাদের নিয়োগে আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি। কমিশনের আরও ছয়জন সভ্যের মধ্যে দুইজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ থাকিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষার পরই মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। বর্তমান অবস্থার পরিশ্রমিতে নূতন ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক বিচার ও বিবেচনা আজ একান্তই আবশ্যক। আমরা আশা করি সুযোগ্য কমিটির হাতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুসম্পন্ন হইবে।

অন্ধদের শিক্ষা

অন্ধদের শিক্ষার জন্য সুই ব্রেইলের কল্যাণকর প্রচেষ্টার কথা সকলেই জানেন। সত্যিই এই মহাজ্ঞান মনোবিদ ব্রহ্মপত্নীবাঈ উগলকে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষাঙ্গণে ডাকতে অন্ধদের জন্য পদক্ষেপ

বৎসরের প্রচেষ্টা নামে একখানা বই প্রকাশ করিয়াছেন। অঙ্কের কল্যাণের জন্য এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের প্রচেষ্টার ইতিহাস বাস্তবিকই বিবরণ্যকর।

আমাদের দেশে অঙ্কের জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮১ সনে অমৃতদেবে। বর্তমানে প্রায় ৫০টি বিদ্যালয়ে প্রায় ১৫ লাখ শিশু ও প্রাপ্যবয়স্ক অঙ্ক শিক্ষা লাভ করিতেছে। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া নানা রকম হাতেব কাজ ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয়—স্তীত ধোনা, বেতের কাজ, পেলাটে, মাটি ও প্রাস্টিকের খেলনা তৈরি, পত্র-পালন প্রভৃতি কাজে ইত্যাদির বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বে লেট ড্যান্টোনস্ হোটেলে কেবল অঙ্ক নৈমিত্তিকের শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৯৫০ সাল হইতে ভারত সরকার এইটির ভার লইয়া প্রাপ্তবয়স্ক অঙ্কের শিক্ষাকেন্দ্র পরিণত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ভারতসরকার বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। শিক্ষাদান ছাড়াও এখানে অঙ্কদ্বিগকে বিনা খরচে খাওয়া খাকা, কাপড় ডোপড় প্রভৃতি সমস্তই দেওয়া হয়।

অঙ্কের জন্য বেলগুমে পরিভ্রমণ, অঙ্ক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিনা ভর্তুকি বই বা অন্য সহায়াদি আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র ব্রেইল দাত্তিক গ্রহণ করার নিষ্পত্তি গৃহীত হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডও সমগ্র ভারতের জন্য “ব্রেইল ভাষা” নামে দাত্তিক গ্রহণ করিয়াছে। মেম্বারনে একটি কেন্দ্রীয় ব্রেইলী ভাষাভাষী স্থাপনা স্থাপন করা হইয়াছে।

তখনো যা জ্যোতির্গম্য, কবিত্বের অস্তর যবিত্ত করিয়া যে প্রার্থনা একদিন উল্লসলোকে দেবতার পানে উঠিয়াছিল, তাহা যুগে যুগে নানা ভাবে বিশ্বাসীরা আকুল ক্রন্দনের সঙ্গে মিশিয়া দেবতার সিংহাসন জালোড়িত করিয়াছে। চন্দ্রমানের অস্তরের

তখনো তিনি বিদ্রুিত করিতে পারেন তিনি যেমন আমাদের নম্র, দৃষ্টিশীল তিনি দৃষ্টিমানে মহাশক্তি করেন তিনিও আমাদের তেমনই নম্র। অঙ্কের আলোকনিকেন্তনগুলি দিন দিন উন্নতির পথে চলুক, একটি ইঞ্জিনের অভাবে তাহাদের জীবনগুলি ব্যর্থ না হইয়া সমাজের সেবার নিয়োজিত হউক।

মনীষী ফ্রায়েবেল

মার্কসের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে Industrial Revolution একদিন যে বিশেষসাধন করিয়াছিল তাহা যেমন আশ্চর্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে মনীষী ফ্রায়েবেলের নূতন পদ্ধতিও তেমনই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল। পালিয়ে পলায়নি আর তার পরেই ‘ডাডবের’ নীতিই সর্বত্র প্রচলিত ছিল। শিশু তখন শিক্ষকের হাতেব পশুসমাজ ছিল, একটি জীবন্ত মার্কস মনে করিয়া তাহার চিত্তবিনোদন, অভাব পূরণ ও তাহার কৃতি অঙ্গকারী বুদ্ধির বিকাশের চেষ্টা ছিল না। বহুকের বেহাল ও কৃতি অঙ্গকারে শিশুর শিক্ষা বিধা গড়িয়া-পিটিয়া মার্কস করা হইত। ফ্রায়েবেলের কিওয়া-পার্টেন প্রণালীতে শিশুর যে শুধু পূর্ণ মার্কসের একটি ছোট সংস্করণ মনে করিয়া চলা হয় তাহা নহে, তাহার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে উচ্চানের মনোবসতা, ‘মুমবার গৌরবে’ বাহা সহর বিকাশের যুক্ত অঙ্গনে আনিয়া শিশুর হস্ত চিত্তবৃত্তিগুলির বিকাশ সাধনের জন্য চেষ্টিত। ফ্রায়েবেলের Gailগুলি ইঞ্জিনের পরিচালনা ও পুষ্টির দ্বারা শিশুশিক্ষার যে যুগান্ত আনিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। ফ্রায়েবেলের পরে অপরাপর বহু মনীষী ক্রমে পরিবর্তন, পরিবর্তন ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তনের দ্বারা শিশুর শিক্ষাপদ্ধতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন, আজও বিদ্যুৎ নুতন দ্বারা লইয়া পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু পঞ্চপ্রদর্শক হিসাবে ফ্রায়েবেলের স্থান সকলের উপরে।

কেন্দ্রীয় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি করা

নোনা বাইভেছে, এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষাবিধি ও অন্যান্য কার্য পরিচালনার বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি রাখিবেন। এই পরিষদ কয়েকজন পরামর্শদাতা ও পরিদর্শক নিৰ্বাচিত করিবেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাহাদেয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন। অবশ্য ডিগ্রী দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই হাতে থাকিবে।

এই পরিষদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ সদস্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারদের যথা হইতে লওয়া হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে ইংরেজি

সম্প্রতি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার যে ফল বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখায় একটা চাকলোর সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন

কলেজের অধ্যক্ষদের এক সম্মিলিত অধিবেশনে গত ১৭ই জুলাই এই বিষয়ে যে আলোচনা হয় তাহাতে স্থির হয় যে ইংরেজি ভাষা অবশ্যপাঠ্যই থাকিবে, কিন্তু তিন পেপারের বদলে দুই পেপার করা হউক। আর একটি সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, কেবলমাত্র বাংলা ভাষারই পাঠের নব্বই শতাংশ করা ৩৬ রাখিয়া অন্য সব বিষয়ে শতাংশ ৩৩ করা হউক।

আমাদেরও মনে হয়, তিন পেপারের জায়গায় দুই পেপার করিলে ভালই হইবে, কারণ তৃতীয় পত্র সাধারণত মুখের কড়িগাই ছাত্রগা তরিয়া যায়। তবে সন্দেহ শুধু ঐখানেই নয়, একটি পেপার কম করিয়া বা দুই একটি অংশ বাদ দিয়া সেই পদ্ধতির যৌক্তিকতা হইবে কি?

পরীক্ষার ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে?

[ত্রিশ্রুপ্রভা হাসকণ্ঠ]

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হয় প্রধানত শিক্ষানানের স্বীতিকে, শিক্ষকদের যোগ্যতার অভাব ও দারিদ্র্য পালনের ত্রুটিকে; ছাত্র ও অভিভাবকের ত্রুটিকে সৌণ মনে করা হয়।

“ছেলের পাল করা যদাবিত্ত ও নিরুদিত্ত পরিবারের পিতামাতার জীবনে একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভেরই অংশ ভাড়া আর কিছু নহে সুতরাং ছেলের ছেলের সংবাদ একটা পারিবারিক চূর্ণটনারই মতো”—এই মন্তব্যটি কি এই সমস্তা সম্বন্ধে আলোকপাত করে না? এর থেকেই যোক্তা যায়, শিক্ষা বলতে সমাজ অর্থকরী বিভা আশা করে—তাই শিক্ষার্থীর মনের গড়নও সেইভাবেই হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার্থীর উপরে যে দাবী

থাকে, তার করন! সেট অসুসাহ্য বা চার, বিদ্যালয়ে তার ব্যবস্থা না থাকায় তার মন বিমূগ্ন হয়ে থাকে। অকৃতকার্যতা কি তখন স্বাভাবিক নয়?

শিক্ষার বিষয়বস্তু সাধারণের ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত ও তার পরিমাণ কি হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয়েছে আজ পর্যন্ত? এখানে ওখানে বাপছাড়া ভাবে কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু পিতৃকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত বছর কাটি কিসের জ্ঞান শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করে তোলা হবে, সেটাই যদি জল্পনা করে না ওঠে, শিক্ষা ব্যবস্থার গলম ওবে হু হুবে কি করে? প্রাথমিক পরীক্ষার ইতিহাস ও অভ্যর্থনা নিলেখাস কিছু কমিয়ে দিবে, ইংরেজি বাংলার দুই তিনটি গল্প বাদ দিয়ে অকৃতকার্যতা নিবারণ করা যাবে না—সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বের

কুগোলের “বোঝা ও বিভক্ত বিখ্যাত”—সেই ছিলে দেওয়ার অন্ত মাঝের মালা মণ করা বন্ধ না হলে। শিশুকাল থেকে শক্তির অপব্যয় ঘোষণা করা ও লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা চাই।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে যদি ইংরেজি শিখতেই হয় তবে সেই অন্তরালেই পাঠের অংশগুলি বাছিতে হবে—পরীক্ষার প্রস্তুতি ও কাব্যসমালোচনা বা মনোবিজ্ঞান ব্যাপ্তে পারে না। নীচের ক্রমে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ওপরের চাপ তো কিছুমাত্র কমে নি। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ইংরেজির Standard কমানো না যায় তবে কেলের সংখ্যাও কমানো যাবে না।

এর মধ্যে আরেকটি কথাও আছে—শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হওয়াও ও এক বিষয়ে ফেল হলেও ঘোড়ের ওপর পান হলে প্রমোদন পাওয়ার নিম্ন শক্তির শেষ পর্যন্ত সব ছাত্রই ক্রাস পার হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তত্ত্ব নির্বাচিতও হয় এই আশায় যে, পানের হার নেমে যাওয়ার ভয়ে কৃষক হয়তো বা কিছু নবর গ্রেন বিয়ে পান করিয়েও দিতে পারে। ইংরেজির মাধ্যমে যখন পড়ানো হতো তখন সপ্তম শ্রেণী থেকেই ফেল হয়ে হয়ে ছাত্র বাছাই করে যেত—যে বাছাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার গিরে হয়। আগে নীচ ক্রমেই অকৃতকার্য হয়ে তাত্রা চির পথ পরতো, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কেলের হার এত বেশি দেখা দেত না।

যদি হয় যে, পতকরা ৭৫ জন ছাত্রই কি পড়ার অবস্থলা করে? তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার অক্ষমতা শিক্ষকদেরই। এক্ষেত্রেও কারণগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইউরোপের সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যখন প্রথম এল, তখন দেশের যে সব সেই সভ্যতার আলোকে উদ্বীণ হয়ে উঠলো, তাদের মধ্যে মননশীলতা, সৌন্দর্যবোধই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গাভীজি যখন গণআন্দোলন আরম্ভ করলেন তখন অসহীন ব্রহ্মহীন মলে মলে লোক যে শিক্ষার দাবী করল, সে তো আগের দাবী

অঙ্গুলি করে পাওয়া সম্ভব নয়। তাইগরে, ধানিয়ার বিপ্লবে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির যে আন্দোলন ইতিহাস এখানে প্রচার হল তার কলে বেশ উল্লেখ্যমাত্র ভবে গেল।

আমরাও ভাল থাকব, ভাল খাব, ভাল পরব, এই দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। গতবছর ও নেতাক্রান্ত সকলেই দেশবাসীর জীবন ব্যাজার মান উঁচু করার কথাই প্রচার করছেন। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তো সেই মত মোড় ঘোঁরে নি। পূর্বের প্রচলিত পদ্ধতিতেই চলার ফলে পরীক্ষার পানের হার যে শোচনীয় ভাবে নামবে তাতে আন্দোলন হবার কিছু নেই, অধিবাস ও অসহায় আবহাওয়ার শিক্ষা কি এসেছে? বর্তমান অবস্থাটা দুর্ভে ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে যতদিন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা না হবে ততদিন এই ভাঙনের এলোমেলো অবস্থার অন্ত শিক্ষকদেরই বিশেষভাবে দাবী করা চলে না।

শিক্ষকরাও সমাজেরই অন—সমাজের আবহাওয়ায়ই তাদের বাস। তাদের মনেও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশ্বাস নেই, অথচ চির পথ তো তাদেরও জানা নেই। ভাল খাব, পরব—তাদেরও আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু উপায় নেই। কাজের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেবে—কিন্তু ছাত্রদের দিকে এগুনের অন্ত আগ্রহ কই।

পুষ্টির অভাবে দেশের স্বাভাবিক অক্ষম ছাত্রেরা অতিক্রম করতে পারে না। আবার তাদের প্রাণের চাকলাও নানা আন্দোলনের ব্যাপার সংহত হতে চায় না।

এই সব প্রবল দাবী নিয়েও ছাত্রের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করবে যে শিক্ষক, তার মধ্যেই বা সে আসন্ন, সে প্রেরণা কই? তারও নিশ্চেষ্টে নির্জীব মন সামান্য সেখানেই তাতে তাস, তার করকে মনে করে অপূর্ণীয়—এই সৌন্দর্য, এই মঙ্গলবোধ তার কাছে নষ্ট নয়। কিন্তু এই ধঃসহ অবস্থা কখনই বীর্ষকালের নয়—সব কিছুই এখন পরিবর্তনের মধ্যে—দেশের চিন্তার গভীর বেধমাঝেই পথের সংকেত করবে।

গল্প বলার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

শ্রীকণিত্তরূপ বিশ্বাস

গল্প পোলে আমরা আর কিছু চাই না, ছেলে বৃদ্ধো সকলেই গল্পের অগ্র পাগল! গল্প ভালবাসে না এমন লোক নেই বলেই চলে, কিন্তু গল্প বলার কৌশল কয় জনেই বা আয়ত্ত করেছি? যদিও আমরা হামেসা গল্পভক্ত কবি, তথাপি ব্যাপারটা যে কি গোলমালে,—ছোটদের কাছে গল্প বলতে বসে তা বেশ টের পাওয়া যায়। গল্প শুনে শুনে ছেলেটা এমন সব প্রশ্ন করে বলে, যার উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। অনেক সময় গল্প বলার পোষে ছেলেটা বান শুনে কান শুনে বসে, ফলে গল্প বলার উদ্দেশ্য বার্থ হয়ে যায়। আদ্যে এমনও দেখা যায় যে, গল্পটি ঠিক অচুপাবন করতে না পারায় হৃদয় ছেলেটা প্রশ্নবাহে অতিষ্ঠ করে ফুলছে, কথায় কথায় 'তার মানে কি', 'কেন হলো'—এমনিস্তর নানা অবাঞ্ছিত কথার বক্তাকে কেবলি বাধা দিচ্ছে; কাহিনী মোটেই একত্রে চাচ্ছে না; শুধু বুঝতে হবে যে গল্প বলার মধ্যে জ্ঞান ও তৎপরিগত কোথাও নিষ্কর একটা গল্প বয়ে গিয়েছে; তার ফলে শিশুর চিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে; জীবনের যাকপথে কল্পনার খেই হারিয়ে যাচ্ছে; কাজেই যেখানে আনন্দ পাওয়ার কথা, সেখানে শিশুর বিজ্ঞান মন তবে উঠছে বিরক্তিতে, কিন্তু কেন এমন হচ্ছে বা এর পরিণামই বা কি, গল্প বলতে বসে কোন দিনই আমরা তা চিন্তা করি না। তা ছাড়া গল্প বলার সময় মনের মধ্যে এমন সব এলোমেলো চিন্তার ঝোঁরাব আসে যে, গল্পের সাময়িক স্বকা করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক কী ভাষায়, কেমন করে বললে শিশুর হৃদয় স্পর্শ করবে, অনেক সময় তাও আমাদের খেয়াল থাকে না। এর ফলে গল্প বলার

পূর্বেই শিশুমনের চাহিদা ও গল্প বলার বীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবখাল হতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে গল্প বলার ভালমন্দ কিসের উপর নির্ভর করে? গল্প বলার ক্ষেত্রে কি উপকরণের একান্ত প্রয়োজন? গল্প বলারটা যদিও একটা মৌখিক বিবৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়, তথাপি সেই জ্ঞান-জগীটাকে কিভাবে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ গল্প বলার মাপ্য—বক্তার কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভর করে অনেকখানি। কাজেই এই বাস্তব কণ্ঠস্বরকেই আমরা গল্প বলার প্রথম উপকরণ বলে ধরে নিতে পারি। কণ্ঠস্বরের ভেতরে অনেক নীরস বিষয়ও মধুর হয়ে উঠে। গল্প বলার দ্বিতীয় উপকরণ হচ্ছে কথা ভাষার উপর যথেষ্ট দখল থাকা। সহজ স্বাভাবিক কঠে অনর্গল কথা বলতে না পারলে, কথার জালে গল্পের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। গল্প একত্রে না একত্রেই যদি ক্রমাগত বক্তাকে ধামতে হয়, তাহলে শিশুর কল্পনার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়; কথার বাক্য গাঁবে ক্রমাগত বাক্য খেয়ে শিশুর জীবন শিথিল হয়ে পড়ে, চকল মনের সে সজীব কৌতুহল আর থাকে না। তৃতীয় কথা হচ্ছে, শিশু-মনকে জানতে হবে। শিশুর মনস্তত্ত্ব না জানলে গল্প বলার সময় বিশেষ অসুবিধার পড়তে হয়। কোন বয়সের শিশু কি ভালবাসে, কিসের প্রতি তার স্বাভাবিক কৌতুহল, তা না জানলে শিশুর মনের চাহিদা যেটানো যায় না। চতুর্থ কথা হচ্ছে যে, শিশু সাহিত্যের সহিত সঙ্গতিযুক্ত হতে হবে। গল্প উপকরণ হবে নাট্যরস বোধ। এইগুলি হচ্ছে গল্প বলার অপরিহার্য প্রাথমিক উপকরণ।

কিছু উপকরণ ঘাই হোক না কেন, গল্পবস্তুর পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে গল্প। এ বিষয় প্রত্যেক শিক্ষকে বিশেষ সতর্ক হতে হবে। গল্পগুলি বয়সের উপযোগী না হলে কিছুতেই শিশুর গল্প শোনার আগ্রহ উদ্দীপ্ত হবে না। কাজেই শিশুরা গল্পের মধুচক্র থেকে বঞ্চিত হবে। সেই ক্ষেত্রে জেবে চিন্তে এমন গল্প সংকলন করতে হবে যেগুলি শিশুমনকে নাড়া দেবে, খুঁধর করে তুলবে তার কৌতুহলকে। কিন্তু সেগুলি কি ধরণের গল্প হবে? নিছক আশঙ্কবি কল্পনার গল্প, না বাস্তব কাহিনী? তার উত্তরে গল্পকার বলেছেন যে নিম্নলিখিত আখ্যানগুলি-ই সাধারণত শিশু গল্পের পর্যায়ভুক্ত হবে, যথা—উপকথা, রূপকথা, জীব জানোয়ারবোত গল্প, লৌহাণিক কথা, বীহের কথা এবং গাছপালা পশুপক্ষীর কথা। এ ছাড়া আর যে সব জটিল গল্প আছে, সেগুলি যে শিশুমানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই অধিবেশকের মহা গল্প নির্বাচনের কালে শিশু সাহিত্যের আনন্দময় উপভোগের দিকটা ধার মাটি হবে। কালে শিশুর আগ্রহ তো তাগত হই-ই না বরং গল্প শোনার মোহ আর বেটে।

সুতরাং গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি কি হবে, সে বিষয়ে একটু জেবে দেখতে হবে। শুধু গল্পের কাঠামো ও কলাকৃতি নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না, গল্পের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথাও চাযতে হবে। গল্পগুলিকে বয়সের পর্যায়ে ফেলতে গেলেই নিম্নলিখিত তিনটি ভাবে ভাগ করতে হবে, যথা—(ক) কি ধরণের গল্প কোন্ প্রকার শিশুদের উপযোগী হবে, তা নির্বাচন করে ঠিক করতে হবে (খ) রূপ কথার গল্প কোন বয়সের শিশুদের মনোরঞ্জন করবে এবং তার মূল্য কি সে বিষয়েও কিছুটা সত্যাকিহাল হতে হবে। (গ) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে-ই বা কি ধরণের গল্প কলা ঠিক হবে, তারও হৃদিশ রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের কিছু এটা মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান-ই শিশুর কাছে নতুন। শিশু তার বর্তমান অভিজ্ঞতার গতির মতোই বাস করে, প্রতিদিন যা ঘটে, যা সে দেখে তার মধ্যেই সে থাকতে ভাল বাসে। অপরিচিত পরিবেশের প্রতি তার একটা আশংকা আছে, তাই সে বহুস্তর দুখোদ-পরা মজার পরিবেশ শিশুকে তার দেখায়। তাই শিশু অপরিচিতকে এড়িয়ে যেতে চায়। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সে আবিষ্কার করে বহু বিচিত্রকে, তাই প্রতিদিনের জগৎ তার কাছে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি বহুস্তর ঢাকা। নতুন বাস্তবই তার কাছে পছন্দ বিষয়ের বস্তু। এই ক্ষেত্রে জানার মধ্যেই সে অজানাকে নানাভাবে উপলব্ধি করে, আবিষ্কার করে নিত্য নূতনকে। কাজেই শিশুর মনে পরিবেশকে জানার কৌতুহল আগাটা খুবই স্বাভাবিক। সে রোজ যা দেখে, কানে শোনে, বা সে হাতের মধ্যে পায় সেটুকু যৎসামান্ত হলেও তা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট। অর্থাৎ শিশুমানই একটু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য; নিজেকে দিয়েই সে অন্তরকে বিচার করে। কাজেই এমন গল্প শিশুকে বলতে হবে যার মধ্যে শিশু নিজেকে শুধু সন্নিবিষ্ট করতে পারবে তা নয়, নিজের আচার আচরণের মধ্যে গল্পটিকে উপলব্ধি করে তুলতে পারবে। এমনি করে গল্পের নাগকের স্থান অধিকার করবে শিশুরা।

এই মনোভাব ছোট শিশুদের একচেটিয়া। শিশুর চার বছরের শিশু নিজ অভিজ্ঞতার কথা শুনে ভাল বাসে। ডাকা বা প্রত্যক্ষ করেছে, যা তারের জীবনেই ঘটছে—ঠিক সেই ধরণের কোন গল্পই তাদের কাছে উপভোগ্য হবে। কাজেই শিশুর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কাহিনীর পাত্র পাত্রীদের মধ্যে ঠিক সেই বয়সের সংলগ্ন ক্ষেত্রে দিতে পারলে খুবই ভাল হয়। শুধু তাই নয়, ছেলেরের এমন ধরণের কাহিনী শোনাতে হবে, যা শিশুমানটিকে করে থাকে, তা করতে হলে কিছু

যশস্বত্বাদিক শিষ্টাচার আচরণের মান নির্ণয় করে নিতে হবে; তা হলে আপনা থেকেই অনেক মুক্তিলাভ হতে পারে। নিজেদের ভাব ভাবের মধ্যেই শিষ্টাচার কোড হলে সব সময় নিয়ম থাকে না; তার প্রতিবাদী পক্ষ পাণ্ডিত্যলোকে সে জানতে চায়, বিচিত্র জীব জীবনোপায়ের সংগে শিষ্টাচার দিতালি করতে। যশস্বত্ব সংগে সংগে যখন শিষ্টাচার কল্পনা শক্তি বাড়তে থাকে, তখন শিষ্টাচার মনে আসে স্বপ্নকথার মতো। একেত্রে কিছু একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, অতি ছোট শিষ্টাচার কল্পনা কথার গল্প বলাটা ঠিক কি না। নিজের ছোট শিষ্টাচার কল্পনা বলাটা যে ঠিক হবে না তা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হবে গল্পটির মধ্যে একটা আনন্দময় বাচনিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা; অর্থাৎ গল্পের এমন একটা আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিতে হবে, যেখানে তারা অবাধে স্বাধীনতা করতে পারবে; শুধু তাই নয়, কোন বিজ্ঞানিক মধ্যে সে যেন বিশেষভাবে না হয়ে যায়— সে দিকেও নজর দিতে হবে।

কাজেই গল্পের পরিণতির সংগে শিষ্টাচার মন যাতে এগিয়ে যেতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে; কারণ শিষ্টাচার যখন বাস্তব পরিবেশের মধ্যে পড়বে সত্যের বাস্তব, শিষ্টাচার তখন দূর অজানার আভাস দিতে গেলে গল্প বলায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, সত্যের বর্তমানকে তিরিয়ে শিষ্টাচার দূর অতীতের নাগাল পাবে না; যা শিষ্টাচারের বাইরে তার জগৎ শিষ্টাচার এবং উৎসাহ আগা সম্ভব নয়। কাজেই নিম্নলিখিত মনস্তাত্ত্বিক ত্রিভুজ উপর বচনা করতে হবে গল্পের বাস্তবতা, যা—

(ক) শিষ্টাচার-জীবনের অভিজ্ঞতাই হবে শিষ্টাচারের ভিত্তি।

(খ) শিষ্টাচার থাকবে দেশ-বিশেষের চেলে-মেয়েদের কথা।

(গ) জীব-জানোয়ার, কল-কলা সম্বন্ধিত

যন্ত্রপাতির বিষয় এবং যে কোন চলমান প্রাণীর কথা।

(ঘ) পরীক্ষা গল্প বা লোক-গল্প।

(ঙ) আশ্চর্য কাহিনী, যাদু বিজ্ঞা, অতিমানব কথা (যে থেকে উচ্চ যশস্বত্ব ছেলেমেয়েদের উপযোগী হবে।)

(চ) হাতযশস্বত্ব গল্প।

(ছ) প্রাণী বিশেষের গল্প।

(জ) ছোট ছোট জিনিষ, যাদু এবং প্রাণীদের গল্প।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মৌখিক গল্প বলায় উদ্দেশ্য কি? গল্প বলায় পূর্বেই প্রত্যেক শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিষ্টাচার বাস্তবতা ও অসংকোচ আনন্দকামের সুযোগ দেওয়াই গল্প বলায় মূল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যবিহীন গল্প বলায় কোন মূল্য নেই। কাজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে একটু খেয়াল রেখেই গল্প বলা শুরু করতে হবে :—

(১) গল্প বলায় প্রথম উদ্দেশ্য হবে শিষ্টাচার আনন্দ দেওয়া। যত বাইরে যেখানে যে জগৎই গল্প বলা হোক না কেন, শিষ্টাচার চিত্র বিনোদন করাই হবে গল্প বলায় মূল উদ্দেশ্য।

(২) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে শিষ্টাচার চিত্রা করার সুযোগ দেওয়া—কারণ গল্পের মাধ্যমেই শিষ্টাচার জীবন ও জীবকে রূপায়িত করতে পারে।

(৩) তৃতীয় কথা হচ্ছে শিষ্টাচার স্বাধীনতার বিকাশ সাধন করা অর্থাৎ যত বাস্তব সুযোগ দেওয়া।

(৪) চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিষ্টাচার কল্পনা ও জীববৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহায়তা করা।

(৫) ছন্দকে উপলব্ধি করতে দেখানো।

(৬) সাহিত্যসুখ বৃদ্ধি করা।

(৭) সুসাহিত্য পাঠে সাহিত্যিক জ্ঞান দেওয়া।

কারণ সাত আট বছর বয়স থেকেই শিষ্টাচার

কিছু জ্ঞান জাগ্রত হয়ে উঠতে থাকে। তাহার

ঐশ্বর্য এবং পারিশ্রমিক। শিল্পের স্বাধীনতা, সাহিত্যিক অস্তিত্বাধিকার নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করে, তাই রূপ রস আনন্দময় কল্পনার অগ্নি পিত্তর জীবনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়ে যায়—রূপ কথার অগ্নিতে পিত্ত হাড়িয়ে কেলে নিজেই। স্বাধীনপ্রবণতা পিত্তরনের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। আলাংকারিক শব্দ, কল্পনা এবং প্রকাশ-নৈপুণ্য পিত্তর সেই প্রকাশ কক্ষতাকে শুধু উজ্জ্বলিত করে তোলে না, তার জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে।

(৫) শব্দ কথার মধ্যে নীতি শিক্ষা দেওয়া, অর্থাৎ গল্পের মাধ্যমে পিত্তরের মনে সমাজচেতনা ও নীতিবোধ জাগিয়ে তোলা সহজসাধ্য। তার সাক্ষ্য অবশ্য গল্প নির্বাচন ও বলার নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে।

গল্প বলার মধ্যে আছে নির্বাচনের পথের পর্ব। ভাল করে গল্পের বিষয় জানা না থাকলে, ঠিক মত শুদ্ধিগে গল্প বলা যায় না। যে বিষয়ে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট, সে বিষয়ে জল্পনা করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে রাখতে হবে গল্পের মূল আখ্যানটিকে, শুধু গল্পের মূল সূত্রটিকে জানলেই চলবে না, গল্পের কথা ভাবতেও ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে হবে। অনেক আবার মনে করেন যে, গল্প জানার প্রথম কথা হচ্ছে আগ্রহ কাহিনীটি সুখর করা এবং সময় মত তা আবৃত্তি করা। এ কথাটা একবারে সত্যি না হলেও মিথ্যা নয়। গল্পের কোন কোন অংশ অবশ্য কঠর রাখতে হয়; কখনো হয়তো সমস্ত গল্পটাই আগ্রহসোড়া প্রায় সুখর করে রাখতে হয়। অবশ্য সেটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাছাড়া কঠর করার মধ্যে এই যে, এর ভাষা সুখর থাকার দরুন গল্পের স্বচ্ছ বাচন ভঙ্গীর মধ্যে আসে একটা আড়ম্বর—মুস্তন প্রোতাহের কাছে পেটা মোটেই উপভোগ্য হয় না। অনেক সময় গল্পটি হ'লে গড়ে নিচক বক্তৃতা মাত্র। তাহলে গল্পের মূল সূত্রটিকে জানলেই

হবে, যা গল্পের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুই জানতে হবে? তার উত্তরে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, গল্প জানার অর্থ হচ্ছে তার সবটুকু জানা,

কাজেই গল্প সংকলনের মূল বিষয় হবে :—

(ক) সংস্থাপন (খ) উপস্থাপন (গ) আঙ্গিক অস্তিত্বাধিকার (ঘ) বক্তার ব্যক্তিত্ব (ঙ) গল্পের উপযোগী চিত্র, কাটা কাগজের ছবি প্রকৃতি ও (চ) খেলাধুলা, নৃত্যকলা এবং নাটকীয় ভঙ্গী।

গল্প বলার কাজে এই উপাদানগুলি অপরিহার্য। এ ছাড়া ব্যাকবিশ্লেষণের দিকেও নজর দিতে হবে। যতদূর সম্ভব ছোট্ট এবং সোজা কথা ব্যবহার করাই ভালো। অস্পষ্ট খোঁজাটে শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্যাকবিশ্লেষণে একাধিক কঠিন শব্দ থাকলে ছেলেদের গল্পটা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। এ ছাড়া ব্যাকবিশ্লেষণে শব্দ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা উচিত। গল্পের মূল সূত্র এবং কাঠামোটি না জানলে গল্পের বক্তৃতা জানা যায় না। গল্পের আঙ্গিকের খুঁটিনাটি বিষয়টুকুও জানতে হবে। গল্পের চিত্র-বাহ্য, কল্পনা, অস্তিত্বাধিকার, পরিবেশের সৌন্দর্য, আলাংকারিক বাচ্যার্থ, লেখকের শব্দ প্রয়োগের বিশেষ অর্থ—প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা ধারণা না জ্ঞানে গল্পের মূল সূত্রটিকে কিছুতেই আবিষ্কার করা যায় না।

তবে কি গল্পাংগের কোন কিছুই সুখর করা প্রয়োজন নেই? গল্পের মূল সূত্রটি ছাড়া যে আর কোন অংশ মনে রাখার দরকার নেই, এমন নয়। কাহিনীর সবটুকু অবশ্য রাখা থাকবে মনে; ছোট্ট অথবা বড় বাবেই অস্ত্রেই গল্প চোক না কেন, গল্পের এমন কতকগুলি অংশ আছে যা প্রত্যেকেরই কঠর থাকা উচিত। কোন কোন গল্পের আশ্রয়টুকুই যেন সমস্ত কাহিনীটির চূড়ান্ত বিশেষ—যা শেষ পর্যন্ত এবল বেগে আকর্ষণ করে পিত্ত মনকে, পিত্তর আগ্রহ তার বাগা কখনো উদ্বীর্ণ হয়, আবার কখনো এর সংকুচিত—এক কথায় গল্পের

অনিহিত যাত্রার আভাস দেয় নাটকের মনে। সে অংশটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আবার গল্পের শেষ অংশটুকুরও গুরুত্ব বড় কম নয়, কারণ তার উপরেই গল্পের ভাল মন্দ নির্ভর করে অনেকখানি, কাজেই সে কোণসটুকু আরও করতেই হবে। তা ছাড়া নিকরকে বরণ রাখতে হবে যে, গল্পের মধ্যে পুনরাবৃত্তির যে অংশটুকু আছে, অথবা যে আনুষ্ঠানিক পদের পুনরাবৃত্তি পিতৃদের আনন্দ দেয়—তা সুস্থ করতেই হবে। ‘কংকবতী’ ‘হুয়ো হানী সুয়োহানী’ প্রভৃতি সুপরিচিত গল্প থেকে দু’ একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(ক) সাতু তাই চন্দা জাগরে

কেন বোন পাকল ডাকবে

—‘হুয়োহানী সুয়োহানীর গল্প’

(খ) তাই হয়ে হবে হানী তাও কি প্রাণে নয়
কংকবতীর নৌকাখানি হুঁ পূর যায়।

ইত্যাদি

গল্পের এই চটকদার কথাগুলি পিতৃর কাণে কংকার ভোলে। কথাগুলি তাদের এত ভাল লাগে যে, কিছুতেই পিতৃর তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে না; একাবিবহার তার পুনরাবৃত্তি করে তবু তৃপ্তি পায়। তা ছাড়া এই শব্দমুখর কল্পনার অগতে সে যখন ডুব দেয়, তখন বক্তা যদি সেই পদটুকু সঠিক পুনরাবৃত্তি করতে না পারেন, তা হলে পিতৃর অতি যাত্রার মনস্থর হ’তে পারে; শুধু তাই নয়, পিতৃর বিরক্ত হয়ে বক্তার কুল সংশোধন করিয়ে দিতে ছাড়ে না। কাজেই গল্পের ছন্দাংশটুকু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যাতে গল্প বলার সময় কোন ক্রমে কুল না হয়। কারণ এ কল্পিত মতোই আছে মন জয় করার যাত্রা।

সাধলীল ভংগিতে কেমন করে গল্প বলার শুরু করতে হবে, এখানে তার একটা নমুনা দেওয়া গেল

এই বিশেষ বাচন ভংগির কথা কুলে চলে না।

কারণ এর উদ্ভূতকরণ সব সময় সম্ভবপর নয় :—

‘যথা—আদিকালের বড়ি বুড়োর আয়লের কথা...তখন না ছিল এমন বিজলী বাতি আর বিজলী পাখার ফুৎফুৎ হাওয়া...অথবা যদুপক্ষী খোড়ার চড়ে পোঁ পোঁ করে নীল আকাশ ফুড়ে যাবপুতুর চলেছে-তো-চলেছে...দিন যায় রাত যায় তবু যেন পথ আর ফুরায় না।.....

সমাপ্তির নমুনা

আর বার কোথায়! কাকে কাকে তীব্রকল
হল কোটাতে লাগলো চোবের পায়ে বাখার বুকে
পিঠে। চোর চীংকার করে, বাপরে! সেলাম
যে! বুদ্ধি ঘরের ভিতর চরকা চালিয়ে আর কোক্কা
ঘাতে হিঁ হিঁ করে হাসে।

এবার গল্পের সংলাপের কথাই আলাদা বাক। কথোপকথনই গল্পের প্রাণস্বত্ব। যে কোন ভাল গল্প তার সংলাপের ভোরেই যে উৎসে যায়, পাঠক যাত্রেই তা জানেন, সুতরাং গল্পের এই কলা-কৌশলটুকু আরও করতেই হবে। পিতৃর পতপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলের দুখ থেকেই কথা তুলতে চায়। কিন্তু তাদের কথার বার্ষ অহুকরণের পুনরাবৃত্তি তুলতে তারা ভালবাসে না। গল্পের পর্যালোচনা বা কুলনামূলক পর্যালোচনার দ্বারা পিতৃগুলিকে মনে রাখা সহজ। এই অংশে বিভিন্ন গল্পের মধ্যে পার্থক্য যে কোথায়, তা’ আবিষ্কার করার সুযোগ দিতে হবে পিতৃকে।

তাছাড়া বিভিন্ন সংকরণ থেকে একই গল্প বার কয়েক পড়ে পোনালে, পিতৃদের মনে রাখার পক্ষে তা খুব সহজ হবে, পাল গল্প হলে তো আর কথাই নেই, পিতৃর একবার তা তুললে সহজে কুলে বাবে না। হেয়ালী বা অংশটুকু বরণের গল্প তুলে পিতৃর কিছুতেই মনে রাখতে পারে না।

আবার এমন কতকগুলি গল্প আছে যা চিরন্তন কালের, তাই সংলাপ এবং কলাকৃতির দিক থেকে

সেগুলি এমন নিখুঁত যে, তার রস বদল করা চলে না। সেখানে কলম চালাতে গেলে গল্পের রস সৃষ্টি স্বাভাবিক হতে পারে, এ ধরনের গল্পগুলি স্বেচ্ছা কঠোর করা ছাড়া সম্ভব নেই, আবার এমন গল্পও আছে যাকে বলে মোহে নিতে হয়। একেই গল্পের রূপান্তর বলে। দীর্ঘকাহিনীগুলিকে বহুলাংশে উপযোগী করে বলতে গেলেই প্রয়োজন যোগে আখ্যানটিকে সংক্ষিপ্ত করে নিতে হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা করা উচিত তা না হলে দল্পাদনার যোগে অনেক সময় হয়তো গল্পের মূল স্রুটি বিকৃত হতে পারে। খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক জ্যাকারসনের কুন্সিং হংস গল্পটি এমন চমৎকার যে তার উপর কোন কারিকুরি চলে না। অতি ছোট ছেলে থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ বয়সের ছেলেদের কাছেও তা স্বাক্ষর বলা চলে।

শব্দসম্পদও গল্পের একটি প্রধান অংশ। কাহিনীর মধ্যে বেশি করার মার প্যাচ না থাকাই ভাল। কঠিন করার আদিক্য ঘটলে কাহিনীটি সম্পট এমন কি দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। পুরাতন পরিচিত শব্দ ও করার মাঝে মাঝে অতি কৌশলে নতুন শব্দের আমদানি করতে হবে। তা হলে শিশুর মনে নতুন শব্দ জানার ঐচ্ছিক্য যেমন তেজে উঠবে, তেমনি গল্পের শেষ অবধি যোগে থাকবে তার কৌতুহল। গল্পের দিকে কিছু বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়; কিন্তু অযথা ক্রিয়ার বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

এই ক্ষেত্রে ভাল গল্প-বলিবে হ'তে হলে রীতিমত অল্পশীলনের প্রয়োজন। অন্যথায় ভাল গল্প-বলিবে হওয়া যায় না, এই কারণে পান্ডিত্য যোগে গল্প বলা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে বিশেষ অল্পশীলনের ব্যবস্থা আছে। কোন না কোন অবকাশের সময় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের গল্প বলার পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অল্পশীলন কেবলে যোগদান

করতে হয়। আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

এই কারণে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, নিয়মিত বিবরণ গল্প-বলিবার বিশেষ ট্রেনিং থাকলে তাৎক্ষণিক যথেষ্ট সুবিধা হতে পারে।

(১) কঠোর শিল্পরূপের শিক্ষা :

সংস্কৃতির সময় যেমন গাইয়ের কঠোর বিভিন্ন পদার্থ ওঠা নামা করে, গল্প বলার সময়ও তেমনি কাহিনীর স্রুতি মিলিয়ে কঠোরেরও পরিবর্তন করতে হয়। এ ছাড়া অনিত্য নথিও সংলাপের জ্ঞান থাকলে খুবই ভাল হয়; কারণ তাতে উচ্চারণেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়। শুধু যে নিতুল উচ্চারণ করায় সুযোগ ঘটে তা নয়, বাক্য সংগঠনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়। শেষের অনিবাধ্যও গল্পের কম বড় আকর্ষণ নয়। অর্থাৎ শব্দ হ'লেও শেষের সংকার শিশুর মূর্খ করে, সব কথাও অর্থ তার। সব সময় বুঝতে চায় না। তাই শেষের সংকার গল্পের মধ্যে থাকা উচিত, 'কম্বকম্ব' 'বিন্ বিন্' 'টপ্ টাপ্' 'হুন্ হুন্' প্রভৃতি অনি-প্রধান শব্দগুলি শিশুর মনে সংকার তোলে, তার কল্পনার সৃষ্টি করে একটা অপর্যবাহিত। এ ছাড়া ভয়, অহংকার, চাকলা হুটে ওঠে এমন অনেক শব্দও আছে, যেগুলি শ্রুতকৌশলে প্রয়োগ করতে পারলে গল্পের আবহাওয়ার তা সহজেই বৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। যেমন 'হাঁও মাঁও কাঁও, মাছের গন্ধ পাও' বাক্যটির মধ্য দিয়ে শিশুর মনে অতি সহজেই আতঙ্কের উদ্ভেদ করা যায়, আবার 'পট্ট পট্ট বট্ট বট্ট' প্রভৃতি শব্দে গতি বা চলার স্রুতি হুটে ওঠে।

(২) গল্প-বলার বিভিন্ন প্রয়োজন :

বিভিন্ন গল্প বলার অপরিহার্য রীতি। অতিব্যক্তিগত ঠিক স্থানে যতি বিভাগ হলে গল্পের মূল স্রুতিকে বহু ভাষা এবং কাহিনীর চোখাটাও আচ্ছাদন করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটু লক্ষ্য

মাথা উচিৎ, যাতে এই ব্যক্তিগুলি গল্পের
বহিরাংশের বস্তু না হয়ে ওঠে; এবং তা যেন শুধু
শ্রেষ্ঠ গল্পেরই অনাবিহীন অংশ। ঠিক গল্পের মূল
স্থিতিতে আবিষ্কার করতে হলে সংবেদনশীল মন
নিরে প্রবেশ করতে হবে গল্পের অগন্ত—বেগানে
জয়যাগের আর প্রাণের অত্মত্ব।

(৪) পরিবেশ সৃষ্টি—পরিবেশ সৃষ্টি গল্প
বলায় একটা প্রধান দিক, প্রসঙ্গে এমন কোন
গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যে, শিল্প
কল্পনা সূত্রে হবে উঠবে; নিত্য প্রত্যক্ষ করবে
ঘটনার প্রাণবন্ত রূপটিকে; তখনই বুঝতে হবে
গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে; উদ্ভূত হয়েছে শিল্প
কৌতুহল। গল্প পরিবেশনের সেই হবে ত্রুটি মুহূর্ত,
—তার আগে বা পরে গল্পের বস্তু ঠিক হবে না।

(৫) ব্যক্তির প্রস্তাব—ব্যক্তিই বস্তুকে
অনেক সমস্ত হাত থেকে উদ্ধার করে, যে কোন
কৃত্রিম উপকরণ, কঠোর ভাব ভংগিমা অপেক্ষা বস্তুর
ব্যক্তির প্রস্তাব দেয় বেশি। মিন্মিনে স্নেহ
গম্যবস্তুর কল্পনা, সকল ছেলেবা তা শুনে পাবে
না; কালেই সেখানে ছাত্রের মতো বিশৃঙ্খল ও
গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বস্তু যদি
স্বাভাবিক লোক হন তা হলে তাঁর বস্তুবোঝ
গাভীরের মতো ছেলেবা কিছুতেই অসহিষ্ণুতা
প্রকাশ করতে সাহস করবে না, বস্তুর ব্যক্তিবস্তুই
সৃষ্টি হয় আবহাওয়া। কালেই এই বৈশিষ্ট্যই
অর্জন করতে না পারলে গল্প বলায় দিকটা কিছুতেই
আনন্দদায়ক প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে না, গল্পবলিরকে
বস্তুই সম্ভব নয়, মহাপ্রকৃতিশীল হতে হবে,
পরিবেশের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি থাকবে তার
সঙ্গীত সৃষ্টি, তা' ছাড়া কোথাও কিসের প্রতিক্রিয়া
চলেছে, তাও লক্ষ্য করতে হবে; জীবনের ঘটনার
সঙ্গে মূক করে সক্রিয় করে তুলতে হবে কল্পনাকে
—জীবনব্যাপী সত্যিকার সাধনা ছাড়া যাওয়ার

স্বপ্ন দুঃখের মধ্য দিয়ে গল্পের প্রাণবন্ত অত্মবোধ
করা সম্ভব নয়।

(৬) অস্তিত্বের অবকাশ—অনেকে মনে
করেন যে, গল্প বলায় মতোও ভাব ভংগি
প্রকাশের মধ্যেই অবকাশ আছে, ভংগিপ্রধান
অস্তিত্বের উপর-ই গল্প বলায় চমৎকারিত্ব নির্ভর
করে অনেকখানি। কালেই শুধু বস্তুর ব্যক্তিবস্তু
কথা চিন্তা করলে চলবে না, ভাব ভংগিমা সবচেয়ে
শিল্পের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সার্বিক গল্প-
বলিরেখার চরিত্রে থাকবে একটা মহত্তম অঙ্গীকার।
তবে কি অভিনেতারাই তাদের অভিনয় চাতুর্যে
ছুটিতে তুলতে পারবে গল্পের বিষয়বস্তুটিকে, অথবা
কেবল গল্প বলায় প্রচেষ্টা হবে নিষ্ফল বিবৃতি মাত্র?
কোন কথাটাই ঠিক নয়, কারণ অভিনয়বিদ্যে গল্প
বলায় দিকটা মাটি হয়ে পড়ে পাবে। অভিনয়ের
দিকে স্রোতের মনোযোগ আকৃষ্ট হলে গল্পের
বিষয়বস্তু বাবে চাপা পড়ে। হাত, চোখ, মূখ এবং
কঠোরতার সাহচর্যেই শিল্পক অবস্থা কিছুটা ভাব
ভংগিমা ছুটিতে তুলতে পারেন, একেই সংঘম
এবং সামঞ্জস্য বিধানই হবে গল্প বলায় প্রধান লক্ষ্য।
যে চরিত্রের মূখে যে ভাষা বেগে উচিত, সেই
সংলাপই ছুড়ে দিতে হবে। গল্প বলায় চেয়ে
অভিনয়ের দিকটা বড় হয়ে উঠলে, সেই ভাব
ভংগিমাতে স্রোতের মন এমন জুড়ে বসবে যে,
গল্পের প্রস্তাবটুকুও মুছে যাবে নিত্য স্রোতের
বস্তু থেকে।

গল্প বলাটাই হচ্ছে গল্প বলির কাজ। বস্তুই
সম্ভব নাটকীয় ভাব ও ভংগিমা পরিহার করে গল্প
বলাতে হবে; কাহিনীর নৈপথ্যে অবস্থা থাকবে বস্তুর
ব্যক্তিবস্তু; কিন্তু মোটের উপর মোট দিতে হবে
গল্পের উপর-ই। গল্প নির্বাচনের পর গল্পের বিষয়-
বস্তুর উপর এই আস্থা রাখতে হবে যে, কাহিনীটি
শিল্পের মনোবহন করবে, ব্যক্তিই তুলবে তার
কৌতুহল।

(২) স্থান প্রদান নিয়ন্ত্রণ:

এক নিম্নোক্ত কড়ের মত গল্প বলা ঠিক নয়।
কল্প গল্প বলার ঘোষ এই যে বক্তার সংগে স্রোতাগণ
ঠিক ভাল বেখে চলতে পারে না। কলে ছেলেগা
গল্পের মূল স্রষ্টাকে ধরতে পারে না, কাহিনীর
মাক পথেই ঘটনার খেই হারিয়ে ফেলে।
অতি ভাড়াভাড়া গল্প বলা যেমন ঠিক নয়, তেমনি
গল্প বলার সময় ক্রমান্বয়ে থামাও উচিত নয়।
যেখানে যেমন তাই যেটুকু থামা উচিত সেই
স্বাভাবিক দাবীল ভাগীই হবে গল্প বলার মীতি।
এক নিম্নোক্ত মন্তব্যও রাখাও শেষ করার
প্রচেষ্টা প্রণয়নীয় হতে পারে, কিন্তু তাতে শিখরা
বোটেই উপকৃত হবে না। গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টির
প্রয়োজনে সংলাপের বিভিন্ন অভিযুক্তি অহুসারে
ইচ্ছামত বর্জন নাহিয়ে বা চড়িয়ে গল্প বলার
কাছে লাগতে হবে। স্বাভাবিক কৃত্রিম বর্জনের
শিখরের কানে বাজে; কাজেই বড়দুঃ সম্ভব
স্বাভাবিক কণ্ঠ গল্প বলা উচিত।

ছেলেদের দ্বিগুণ গল্প বলানো: গল্প
বলার দুটি বিক, শোনা এবং বলা। কাজেই
শিখরের শুধু কাড়ি কাড়ি গল্প বললেই চলবে না,
তাদের দ্বিগুণ গল্প বলতে হবে। গল্প বলানোর
আগে ছেলেদের কথোপকথনে অভ্যাস করাতে
হবে। কথা বলাটা শিখর অন্তর্গত স্বাভাবিক
অভ্যাস; সে দিন যান্ত্রিক কইতেই ভালবাসে।

আগাগোড়া সমস্ত গল্পটা নিতুল তাই বলায়
আগেই শিখরা যখন কবিতাশিল্পিত পুনরাবৃত্তির
অংশটুকুর দ্বারা বলতে শুরু করবে, সেই অনুসারে
তাদের কথা বলার প্রবৃত্তির কিছুটা কৃতি বিধান
করতে হবে। ক্রমে একটু একটু করে গল্পের
সমস্ত কাহিনীটি আয়ত্ত করবে শিখরা। শিখরের
কথোপকথনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তাদের সংগে
গল্পের সংলাপ নিবে শুরু করতে হবে উত্তর প্রত্যুত্তর,
ছ' লাভ বছরের ছেলেদের কাছে বই থেকে কোন
গল্প পড়ে শোনালে বিশেষ ফল হবে বলে আশা
করা যায় না। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের কাছে
মৌখিক গল্পের চেয়ে কেতাবি গল্পের প্রস্তাব অবশ্য
অনেক বেশি, যে গল্প তাদের আগেই বলা হয়েচে,
বই থেকে সেই কাহিনী তাদের পড়ে শোনাতে
হবে। তাহলে ছেলেগা সহজেই গল্পটিকে মনে
রাখতে পারবে।

কাজেই বোকা যাচ্ছে যে গল্প বলাটা এমন একটি
পদ্ধতি, যা আয়ত্ত করা সাধনা মানেই। দীর্ঘ
দিনের অভ্যাস ও অহুসীলন ছাড়া গল্প বলার
শিখলাভ করা যায় না। ভাল গল্পবলিয়ে হতে
হলে প্রথম থেকে প্রসিদ্ধ শিখর সাহিত্যিকদের
লেখাগুলি খুব বড় সহকায়ে অধ্যয়ন করতে হবে।
শিখরের বনতনের কথা জানতে হবে, এবং অর্থন
করতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত বাকপটুতা, তা না হলে
শিখরের গল্প বলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে যাবে।

পরীক্ষার পাশের হার

[ডাঃ জামশেদ হাসভগ]

ধর্মের কাগজে যেখানে এবারও ইন্টার-মিডিয়েটের পরীক্ষার পতকরা প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে। গত কয়েক বৎসর ধরে প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও কম খুব ব্যর্থ হতে। পতকরা ৫০।৬০ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার কৃতকার্য হতে পারছে না। ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপক অকৃতকার্যতার কাহিনী জাতির শক্তির কতখানি মর্যাদিক অপচয়ের কথা, তা বুঝতে কান্নাই সময় লাগা উচিত নয়। পরীক্ষার্থীদের বিবেক যদি তাকান যায় তবে দেখতে পাই কৈশোরে অকৃতকার্যতার এই আঘাত তাদের জীবনে কম নয়। পরীক্ষার পাশ করতে না পেরে নিজেকে দারিদ্র্য জীবন ধরে দিকার দিবে এসেছে, এমন ব্যক্তিদের কথাও আমরা জানি। এ কথা ঠিক, নিজের প্রতি অতখানি বৈষম্যমোচনের একমাত্র কারণ পরীক্ষার অকৃতকার্যতা হতে পারে না—তার আরো কারণ রয়েছে। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ঐ সব কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে জীবনের প্রারম্ভে এমন অকৃতকার্যতার গুরুত্ব কম নয়।

প্রশ্ন এই যে পরীক্ষায় এই ব্যাপক অকৃতকার্যতা নিবারণ করা কি সম্ভব নয়? সম্ভব নিশ্চয়ই। কিন্তু তৎপূর্বে ডেবে দেখা দরকার—এই অকৃতকার্যতার কারণ কি? এই অকৃতকার্যতার কোন কল্যাণের দিক আছে কিনা। কেউ কেউ মনে করেন পরীক্ষা ফেলার মূল রয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই শিক্ষার প্রতি অমনোযোগ ও অবহেলা। একমাত্র অকৃতকার্যতার রূপ আঘাত হেনেই শিক্ষার প্রতি তাদের ঔষাদিচ্ছা খুঁচান সম্ভব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অবহেলাই পরীক্ষার এই

ব্যাপক ফেলের প্রধান কারণ বলে আমরা মনে করি না। কয়েক বৎসর ধরেই এই ব্যাপক অকৃতকার্যতা চলেছে। অকৃতকার্যতার আঘাতের দ্বারা এই পরীক্ষার্থীর উন্নতির মান উন্নীত করা যেত তবে এতদিনে ফেলের হার কবে আসত। একথাও আমরা স্বপ্ন করব পত দশ বৎসর মাত্রের তাগো অনেক দিক দিবে বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথমে এল যুদ্ধ, তারপর দুর্ভিক্ষ, তারপর বাস্তবত্যাগ। শিক্ষার গুরুত্বও এতদে প্রভাব বিস্তৃত হয়নি এমন কথা কেউ মনে করবেন না। তবুও মাত্রের গড়া ধুঁকই এই পরীক্ষার ব্যাপক অকৃতকার্যতার সবচেয়ে বড় কারণ নয়। পরীক্ষার ফেল হওয়া একরকম শাস্তি। নিজের ভিত্তি হারিয়ে অনিশ্চয়ের অনিশ্চয়তাকে যে নিজের জীবনে বরণ করে নিল, পড়াশোনার যথোচিত মনোযোগ দেওয়া তারপক্ষে সম্ভব নয়। বাস্তবজীবনের গুরু জীবনের অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে—ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরীতে অধিক অযোগ্য দেখাও কথা যদি আমরা ভেবে থাকি, পরীক্ষার মান সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ আমরা দেখাব না কেন?

পরীক্ষা ব্যবস্থাটো একটা পরিবর্তন আনা আশ প্রাণকর। কোন দিক দিবে পরীক্ষার উন্নতি সাধন করা যায় বিবেচনা করতে গেলে বলতে হবে, পরীক্ষার তিনটি দিক আছে—বিষয়বস্তু, পরীক্ষাপদ্ধতি, নব্বয় দেওয়া ও নব্বয়কে ব্যাখ্যা করবার রীতি। প্রথমে নব্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। পরীক্ষার পাশ নব্বয়টি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লীমাবেশ। পরীক্ষার্থীদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মাঝখানে এই যে কীণ বেখাটি, এ কি ভাবে নির্ণয়িত হয়? বলা চলে একটি বিষয়ের অন্তত পক্ষে যেটুকু জানা উচিত সেটুকু

জানলে একজন পরীক্ষার্থী ৪২ নম্বর পাবে তাকেই আমরা পশ্চাদ্ধাবন বলব। অসম্ভবতঃ যেটুকু জানা উচিত সেটা কিভাবে স্থির করা হবে? কিরকম বক্তব্য দিতে থাকিবে না পরীক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে? প্রত্যেক বিষয়েই একটি শিক্ষাপ্রদ দাবী আছে। বাংলা-ভাষার জ্ঞান তাইই হয়েছে, যে সে ভাষা বলতে, লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারে। কিন্তু বাংলা বিভিন্ন ধরণের আছে। তার সহজ ও কঠিন অংশ রয়েছে। সুতরাং বাংলা ভাষার জ্ঞান সবই সমান সহজ নয়। বিভাগের শিক্ষা যে সাধ করতে চলেছে তার কতটুকু বাংলা জানা উচিত? যদি বলা হয় সত্য সমাজের ন্যায়িকভাবে জীবনযাত্রার (যেমন বহুবিধ কাপড় পড়ে তার মর্দোকার করা, চিঠিপত্র লেখা, ব্যক্তিগত হিসাবপত্র রাখা, কবিতার বঙ্গমহাভারত প্রভৃতি) যেটুকু বাংলা তার জানা বরফের যেটুকুই সে জানবে—তবে আমাদের প্রেরণ একটি উত্তর আমরা পেলো—সমস্তই সম্পূর্ণ সমাধান হল এ কথা বলা চলে না। বহুবিধ কাপড়ের নোটামুটি একটি নির্দিষ্ট মান আছে। সাধারণ ড'বের হিসাবপত্র রাখার, চিঠি লেখার রীতিও নোটামুটি এক। একই উৎকর্ষতা বিভিন্ন প্রকারের। একটি অল্প শিক্ষিত লোকের চিঠি ও বীজ্যনাথের লেখা চিঠির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কবিতার মধ্যেও ভাল, মন্দ, কঠিন সহজ আছে—কবিতার বঙ্গমহাভারত তেমনই হয়েছে। তারপর যদি মেনে নেওয়া যায় মাঝামাঝি ধরণের চিঠি লেখা, কবিতা বোঝাই বিভাগের শিক্ষালভের লক্ষ্য, তবে এ প্রেরণ করা চলে যে, এই লক্ষ্যটি সাধন করবার জন্য আমরা বঙ্গম জেনী পণ্ডিত অপেক্ষা করব কেন? চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শ্রেণীর শি্ষরা এই জ্ঞান ও শক্তি লাভ করবার জন্য চেষ্টা করবে না কেন? এর উত্তরটি সহজ। চেষ্টা করলেও এই জ্ঞান ও শক্তি তারা লাভ করতে পারবে না। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শি্ষরা যে

পাঠ আদর করতে পারে সেটাই তাইই পাঠ্যক্রমে নির্ধারিত করা হয়েছে। যা তারা পারবে না তাই দিতে তাইই তারাক্রান্ত করার কোন অর্থ হয় না। উপরেই উক্তির অন্তর্নিহিত সত্য যদি আমরা বুঝে থাকি তবে আমরা স্বীকার করব যে পূর্বে উল্লিখিত “যেটুকু পাঠ্য উচিত” কথাটির চূড়ান্ত অর্থ হচ্ছে—সাধারণতঃ যেটুকু ছাত্রছাত্রীরা পারে। লেখাপড়ার ব্যাপারে কৃতিত্বের জন্য সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে বুদ্ধি। চৌক বঙ্গম বহুবিধ মাছের বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রাথমিক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের আমরা মোটামুটি বুদ্ধির দিক দিয়ে বিবেচনা করে প্রাপ্তবয়স্ক বনে মনে করতে পারি। যেটুকু ছাত্রছাত্রীরা পারবে সেটা ‘সাধারণতঃ’ শব্দটি আমরা ব্যবহার করেছি। ‘সাধারণতঃ’ কথাটির অর্থ বুঝতে আমরা বাস্তবিক বিজ্ঞানের নিয়মটি (Law of normal distribution) গ্রহণ করব। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদেরই যদি নেওয়া যায়—তবে বলা হয় শতকরা ৬৮ জন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। সাধারণ বা বাস্তবিক শব্দটির সংখ্যা-বিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা। শতক ভাষার বলতে গেলে সমাজের যারা অধিকাংশ তাই বা বাস্তবিকের মান। অনেক অবিভিন্ন ব্যবহারী ৪৪ জনকে ‘সাধারণ’ বলেন। তাঁদের ব্যবহার অনুসারে ৪৪ + ৩৩ (উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন) = ৭৭ জন হবে পূর্ণের উপযুক্ত। এ কথাও ঠিক, যেনের সময় ছেলেমেয়েদের বহুবিধ এই নিয়মের কথা আমরা বলি। যে সব ক্ষেত্রে একাংশ পড়ছে তাইই বেলাতে কি হবে? আমাদের মতে তাইই বেলাতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। যখন ক্রমে ক্রমে সময় ছেলেমেয়ে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে তখন তাদের পটভূমিতেই বাস্তবিক নুতন মান প্রতিষ্ঠা হবে। স্বভাবতই মান তখন আরও নীচ হবে। এই কারণে এদিন বলেছেন শিক্ষা বস্তু বেশি গণতান্ত্রিক হবে তার মান তত বেশি নীচ হবে বাবা। পাঠ্যক্রম নির্ধারণের সময় এই ‘বাস্তবিক’

অর্থাৎ শতকরা সম্ভাব্যতা ১৬ জনের পাঠ্য ন্যায় পাঠ্য কথাই পূর্বাগ্রে স্বয়ং ব্যবহৃত হবে। শতকরা বাকী ৩৪ জনের মধ্যে শতকরা ১৭ জন উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন ও বাকী ১৭ জন কীণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। সাধারণ ছেলেমেয়ে বা পারবে উচ্চবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলেমেয়ের দল তা পারবেই। তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে পাঠ্যশুচী যদি সাধারণ ছেলেমেয়েদের উপযোগী হয় তবে সে পাঠ্যশুচী আয়ত্ত করার শক্তি শতকরা ৮০ জনেরও বেশি ছেলেমেয়ের আছে। শক্তি ও বুদ্ধির যথোচিত ব্যবহার করবে না, করতে পারবে না, এমন ছাত্রছাত্রী কিছু থাকবেই। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি এমন আমরা মনে করি না। নতুন শিক্ষা, শিক্ষার্থীর আগ্রহকে কেন্দ্র করে অধিকতর মর্যাদা দান করা যায় সে কথা ভাবছে। সেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে পর, শক্তি আছে অথচ অনন্যোযোগী এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরো কমবে। বর্তমান শিক্ষাতেও শক্তি থাকা সত্ত্বেও তার সম্যকহার হচ্ছে না এমন ছাত্রছাত্রীর তার যদি শতকরা ৫ জন মনে করি তাহলে বলা চলে পাঠ্যশুচী যদি যথার্থরূপে নিরূপিত হয় তবে শতকরা ৭৫ জন ছেলেমেয়ে তাতে পান করবে। এই সত্যকে যদি আমরা স্বীকার করতে রাজী হই তাহলে পানের একটি নির্দিষ্ট নম্বর পূর্বেই স্থির করে রাখা কতদূর যুক্তিযুক্ত, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা চলে। শতকরা ৭৫ জন পান করবেই এটাই স্থির থাকুক। যে নম্বরটিকে পানের নম্বর বললে শতকরা ৭৫ জন পান করবে সে বৎসরের সেইটাই হবে পান নম্বর। এই নিয়মে প্রতি বৎসর পান নম্বর এক থাকবে না কিন্তু পানের হারটি এক থাকবে। পানের হারকে বর্তমানে উন্নীত করার জন্য এ পদ্ধতি সাময়িক ভাবে গ্রহণ করা বোধহয় উচিত।

কিন্তু এর দ্বারা সমস্তর সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। বাংলার কথাই আবার খর্যাক। দেখা

গেল কোন এক বৎসর শতকরা ৭৫ জনকে পান করতে চলে শতকরা ১০ কিংবা ১৫কে পানের নম্বর করা আবশ্যক। সে বিষয়দ্বয়কে পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করা চেষ্টা শতকরা ১০ কিংবা ১৫ গেলে তাকে এত অসম্পূর্ণরূপে জানা হয় যে তাকে অনেকাংশে না জানার সান্নিধ্যই বলা চলে। আমাদের নীতি চওড়া উচিত আমরা পাঠ্যকর ছাত্রছাত্রীর উপযোগী করেই প্রস্তুত করব। এবং ছাত্রছাত্রীরা সেই পাঠ্যকর যেন ভালভাবেই আয়ত্ত করবে। কোন একটি নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে-মেয়েরা যদি যোগ বিয়োগ বুঝতে পারে কিন্তু যোগ বিয়োগের পরবর্তী অংক বুঝতে অসমর্থ হয়—তবে যোগ বিয়োগই তাদের পাঠ্যশুচী রূপে নির্ধারণ করা উচিত হবে। কিন্তু সেদর ছেলেমেয়েরা যেন যোগ বিয়োগ শিখে, যোগ বিয়োগের অংক মোটামুটি ভালভাবে করতে পারে সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব। যে পাঠ পরীক্ষার্থীদের ক্ষমতার বাইরে সেটা তাদের পাঠ্যরূপে পরিগণিত করে—সেই বিষয় সম্বন্ধে তাদের অত্যন্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে 'মোটামুটি মন্তব্যজনক' রূপে যেনে নেওয়া সমস্তর অত্যন্ত অসম্পূর্ণ সমাধান।

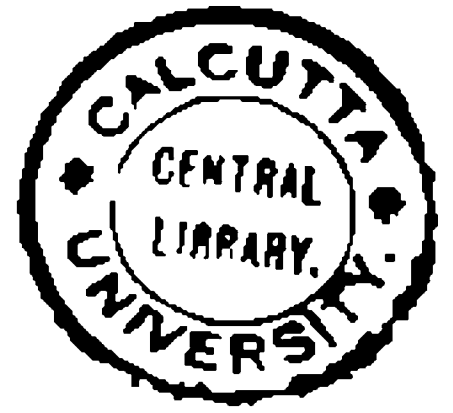
“কমতান্ত্রিক পাঠ্য”—কথাটি আমরা কেন ব্যবহার করেছি সে কথা আমাদের “নব মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যশুচী” প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। সে প্রবন্ধে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, কিছুদিন যাবৎ প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। যে সকল গৃহে লেখা পড়ার চলন ছিল না সে সকল ঘরের ছেলেমেয়েরাও আজকাল লেখাপড়া করছে। এটা জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক, বুদ্ধিবীবিদ্যের ছেলেমেয়েদের তুলনার এই নবগত বিমূর্ত বুদ্ধি (abstract intelligence) লেখাপড়া-প্রদান—শিক্ষাপ্রণালীর (academic type of learning) শক্তির পরিমাপ

পড়ে কম। এদের মধ্যে নিম্নতরই অনেক আছে—
বিদূর্ত বুদ্ধিতে দারী বুদ্ধিভীষিনের ছেলেমেয়েদের
সম্বন্ধ কিংবা বুদ্ধিভীষিনের ছেলেমেয়েদের
চেয়ে বেশি। কার্যকরী বুদ্ধিতে (Practical
Intelligence) এদের অবিকাংশই বোধহয়
বুদ্ধিভীষিনের দরের ছেলেমেয়েদের থেকে বিশেষ
খাটো নয়। কিন্তু বিদূর্তবুদ্ধি বা লেখাপড়া-প্রদান
শিক্ষা লাভের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে
হবে বুদ্ধিভীষিনের ছেলেমেয়েদের তুলনায় নবাগত
মলের অবিকাংশ অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিসম্পন্ন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠানুষ্ঠী বুদ্ধিভীষি
ছেলেমেয়ের প্রয়োজন ও সামর্থ্যকে সামনে রেখে
রচনা করা হয়েছিল। কলেজী শিক্ষার সোপান
রূপে ঐ পাঠানুষ্ঠী নির্ধারিত হয়। কলেজে পড়ে
যারা লাভবান হয়ে না, শক্তি বাতের অপেক্ষাকৃত
কম সে সব ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এই পাঠ যে গুরুতর
হবে তাতে সন্দেহ কিছু নেই, তাই আজ সরকার
নতুন পাঠানুষ্ঠী। নতুন পাঠানুষ্ঠী প্রণয়নে নবাগত
মলের প্রয়োজন ও শক্তি সামর্থ্যকে প্রধানত অঙ্গ
রাখতে হবে। কলেজী শিক্ষার তত্ত্ব প্রস্তুতি
হিসাবে নয়—সত্য সমাজের সাময়িকরূপে সাধ্যমত
মুচ্যক জীবনব্যয়াদি তত্ত্ব যে কোন দক্ষতা ও ক্রি-
য়ার আবশ্যক সে সব শিক্ষা লাভই এদের লক্ষ্য
হবে। কিন্তু নবাগত ও বুদ্ধিভীষিনের ছেলে-
মেয়েদের মধ্যে একাংশ থাকবে যাদের বুদ্ধি ও
শক্তির পরিমাণ বেশি। তাদের ও সাধারণ
পরীক্ষার্থীদের পাঠানুষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে এক হতে পারে
না। ইতোও ছুইজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্ব
বিভিন্ন পাঠ্যক্রম ও বিভিন্ন ধরনের বিভাগ—মর্ভার্গ
ও গ্রামার স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদেশে আমরা
যদি উপযুক্ত ছুই মলের তত্ত্ব বিভিন্ন বিভাগের

ব্যবস্থা নাও করি তবু বহুলাংশে বিভিন্ন পাঠ্য রচনার
প্রয়োজন হবে। আমাদের মতে উক্ত পাঠ্যক্রমের
মধ্যে একটি অপরিহার্য সাধারণ অংশ থাকবে যেটা
ছুই মনই পাঠ্য করবে। শিল্প প্রকৃতি ব্যবহারিক
(Practical) বিষয়গুলির উপর সাধারণ ছাত্র
ছাত্রীরা শোম দেবে। উক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা
অল্প পক্ষে, বিভাগের থাকাকালীন কলেজ ও বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে পড়ার তত্ত্ব প্রস্তুত হবে। দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ
করা যেতে পারে সাধারণ ছেলেমেয়েদের বীজগণিত
পড়াবার কোন দরকার নেই; পাটীগণিতের
পরকারী অংশগুলি শিখলেই তাদের চলবে।
উক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা পাটীগণিত তো পড়বেই
বীজগণিতও তাদের পড়তে হবে। এ কথা বিশেষ
ভাবে প্রযোজ্য তাদের বেলাই, কলেজে গিয়ে
যারা অংক, বিজ্ঞান কিংবা টেকনিক্যাল শিক্ষা লাভ
করবে। পূর্ব প্রবন্ধে আমরা যে আলোচনা
করেছি বিদূর্ত ভাবে তারই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন
নেই, তাই এখানে কান্স হলাম। শুধু এটুকু
বলি—পাশ নবায়ন রীতি বঙ্গলান দ্বারা সমস্তার
প্রকৃত সমাধান সম্ভব নয়। সমস্তার সমাধানের
তত্ত্ব প্রধানত সরকার পাঠানুষ্ঠীর আশ্রয় সংকার।
শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও শক্তি সামর্থ্যের সঙ্গে পাঠ্য-
নুষ্ঠীর সামঞ্জস্য সাধন হলে পয়—পাশের দ্বারে এমন
শোচনীয় দুর্ঘটনা বারংবার ঘটবে না, এ কথা
অনিশ্চিত। কিন্তু পরীক্ষকের সাধু ইচ্ছা থাকা
সত্ত্বেও প্রস্তুতির মান প্রতি বৎসর ঠিক এক রাখা
সম্ভব নয়। কিছু পার্থক্য ঘটবেই। সেই পার্থক্যের
ফলে পরীক্ষার্থীর মন বাতে অধিক লাভবান বা
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য পাশের দ্বারকে নির্দিষ্ট
রেখে পাশের নবায়ন প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিবর্ষ
রাখাকেই আমরা বুদ্ধিমুস্ত বলে বিবেচনা করি।

শিক্ষা



স হি কল্যাণকর कन्ठिह् दुर्गतिह् तातु गच्छति

১০ম বর্ষ

শ্রাবণ ১৩৫৯

৯ম সংখ্যা

আলোচনা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শ্রাবণ মাস আসিলেই যে ছুইজন মহাপুরুষের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়, তাঁহাদের একজন শিক্ষাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৩ই শ্রাবণ ইহার মৃত্যু হয়। এই দিনটি বাঙালীর ও বাঙলা দেশের পবন দুর্দিন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে শ্রুতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের বহুদূরী প্রতিভা ও তাঁহার জীবনের সহস্রধারার প্রবাহিত অগণিত কীর্তির কথা সভা সমিতিতে শতদূরে বলিয়াও শেষ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সভ্যই বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর কেবল একজন যে বাঙালী বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি বীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি ধর্মাবতার ছিলেন। অনন্তমূল্য বহুদূরীর প্রাচীরেই তাঁহার মতে বিদ্যাসাগরের জীবনের সর্বোচ্চ দৌরবের বিষয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে, বাঙালীর

শিক্ষার, সমাজ সংস্কারে, বাংলা দেশের বিজ্ঞানবোধের মর্যাদা নির্ধারণে, বাঙালীকে আচার আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, গীন হুখীর অস্তর ঘোচতে, এক কথায় পবন বাঙালী জাতিকে আত্মমচেতন করিতে এই মহাজানী অথচ নিবহকার, বলিষ্ঠচেতা অথচ সুকোমল কৃপা মহানানন্দের অলস দানের কথা আমরা কি গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিব। আমরা রবীন্দ্রনাথের কথাকব্ধি উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষার শ্রাবণ সংখ্যার শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর মহাপুরুষকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

“তাঁহার মতঃ চরিত্রের যে অক্ষরটি তিনি বহুকুশিতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ সহস্র বাঙালি জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিম্নল আড়ম্বর জুলিয়া দুঃস্বপ্নম ওর্কমাল ও দুঃস্বপ্ন আড়ম্বর বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সরল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিজ্ঞা ও ধর্মাব আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীতে সংস্রবে আসিয়া বসেই আমরা মাহুত হইয়া

উষ্ণ, যতই আমরা পুস্তকের মতো দুর্গম বিতীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব ততই আমরা নিজের অস্তরের মধ্যে অহুত্ব করিতে থাকিব যে, যথা নহে, বিজ্ঞা নহে, টেকসম বিজ্ঞানগণের চরিত্রে প্রধান পৌরষ তাঁহার অধোঃ পৌরষ, তাঁহার অকর মহত্ব এবং যতই তাহা অহুত্ব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিখ্যাত উদ্ভেদ সফল হইবে। এবং বিজ্ঞানগণের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিত্তবিনোদন ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।”

২২শে প্রাবণ

প্রাবণ মাধ্যমে সেই মহাপুরুষকে আমরা প্রচার করণ করি, ২২শে প্রাবণ ঐহার মহাপ্রবাসের দিন। বাঙালী জাতি ও বাংলা দেশ সেদিন হাওয়ায় হাওয়াইয়াছিল তাঁহাকে আমরা আবার আমাদের মধ্যে আহ্বান করি। আজ দেশের ও জাতির জীবনে এক সত্যিকার উপস্থিতি, এই দুর্গমস্থিতিতে আমরা প্রতিপক্ষেই অহুত্ব করিতেছি সেই আলোর অভাব যে আলো আমরা পাইতাম কবিগুরু বাণীর মধ্যে, যৌক্তিকতার সাধনালয়, অভিজ্ঞতাপূর্ণ লেখনীও হুজু হুজু। বিস্ময় অংশভাগী বহিরা এদেশের শিক্ষা বীকার, কাজে ও কথায়, বাস্তবীতিতে ও সাহিত্য সত্য যে মনোবীর চিন্তাধারা বাঙালী জীবনকে নিরঞ্জিত করিয়াছিল তাঁহার তিরোস্তাব আমাদের কাছে ব্যথিতই করিয়া তোলে না, বর্তমানের এই অন্ধকার পরিবেশে শিশুদেরা আমাদের তাঁহার অভাব বুঝমান করিয়া কেনে। তাঁহার জীবন আমাদের জীবনবিধাকে কখন কখন উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহার বাণী আমাদের সমস্ত আমাদের কল ও বিদ্যার সমস্ত সাধনা দিয়াছে। আজও আমরা হুখে হুখে, উৎসানে পড়নে, বিদ্রবে বিপর্যয়ে সেই মহাপুরুষের জীবনের সত্যকার শিক্ষাটিকে কেনে স্বার্থ ছববে খতিতে পারি। “তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে বহন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে,

পরবর্ত্ততা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমাদের কাছে নিজের সত্যপন্থিতে, সত্যচেতায়, সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে; আমাদের কাছে শিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অস্ত্র দিবে; অহুত্ব করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে।”

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিগত ২৪শে জুলাই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বার্ষিক অধিবেশনে অস্বাভাবিক বিবরণ সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন, বিজ্ঞানদের আসবাব উপকরণ ও ছেলেদের দেয় দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বর্তমান বর্ষের বাজেটে বিজ্ঞানকে টিকিৎ দেওয়ার খাতে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। এই টাকার পশ্চিম বঙ্গের ১,২০০টির মধ্যে ৪০টি মাধ্যমিক বিজ্ঞানদের ৪,৫০০ ছেলেদেরকে অর্থাৎ শতকরা ২০জনকে বিনামূল্যে টিকিৎ দেওয়া হইবে। এই টাকার সম্বলান না হইলে ছেলেদের দখল কমাইতে হইতে পারে।

এই পরিকল্পনায় আশাচরিত্র ফল পাওয়া গেলে ক্রমে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা আশা করি এই প্রচেষ্টায় একটি মহৎ উপকার সাধন হইবে। সরকারি সাহায্য পাওয়া গেলে বিজ্ঞান কল্লপক ভাসিতাবেই টিকিৎ ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

নার্সিং শিক্ষার জন্ত বৃত্তি

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে পশ্চিমবঙ্গের সরকার দিল্লী কলেজ অফ নার্সিং-এ জরুরী বিষয়টিতে অনাস লইয়া বি, এস সি পড়িবার জন্ত ৪টি মেয়েকে বৃত্তি দিয়াছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে দীপা সেন, শান্তি চক্রবর্তী, জ্যোতি মুখার্জি, কেলারানী চ্যাটার্জি। প্রত্যেকে প্রথম বৎসর ১,০০০ টাকা, ও পরবর্তী তিন বৎসর ২০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। আমরা ইহাদের লালসা কামনা করি। নার্সিং শিক্ষার জন্ত পশ্চিম

বঙ্গের রাজ্যপালের দানের পরিমাণ কম নয়। সম্রাতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যপালের যেতন ব্যবস জমা ৮০,০০০ আনি হাজার টাকা উচ্চতর নার্সিং শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিরাছেন। এই টাকা রাজ্যপালের দ্বিতীয় দান বঙ্গবাসী মুখোপাধ্যায় কাণ্ডের সঙ্গে মিলাইয়া নার্সিংয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে।

আমাদের দেশে নার্সিং বিজ্ঞান এখনো নৈশব, বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এই বিজ্ঞান প্রবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

স্বর্গীয়কুমার মুখোপাধ্যায় বৃত্তি

বিশ্ব ২৯শে জুলাই সেনেটের অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিম বাঙালার রাজ্যপাল জাঃ মুখোপাধ্যায়কে স্বর্গীয়কুমার বৃত্তি কাণ্ডে একলক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব জানান। এই কাণ্ডের টাকার বাঙালী যুবকদের সামগ্রিক শিক্ষা নিশ্চয় হইবে। এক বৎসর পর পর এই কাণ্ড ঘোষণা বা অহরণ কোন সরকারি কলেজে সামগ্রিক শিক্ষালাভের জন্য একটি ছেলেকে বাৎসরিক ১০০০০ টাকার বৃত্তি দিবে।

জাঃ মুখোপাধ্যায় এই নিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অর্পণ করিলেন। বিভিন্ন খাতে এই অর্থ হইতে উপযুক্ত ছাত্রদিগকে সাহায্য করা হইবে। একমাত্র সত্যানের বৃত্তিতে অনিত এই অর্থ উপযুক্ত পাত্রের শিক্ষার ব্যয়িত হইলে বাঙালী ছেলের কৃতিত্বের মধ্যেই তাঁহার পুত্র ভবিষ্যতের বাঙলাদেশে চিরজীবী হইয়া থাকিবে।

রাজ্যপালের পুটোস্তে আরও অনেক এইরূপ জ্ঞাপের ও মহাসুভবতার পবিচয় দিলে দেশের কল্যাণ হইবে।

অন্ধদের জন্য বৃত্তি

ভারত সরকার অন্ধদের উচ্চশিক্ষা অথবা উন্নততর বৃত্তিশিক্ষার জন্য দশটি বৃত্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বৃত্তির জন্য আবেদন পত্র

নূতন দিল্লী শিক্ষা দপ্তরে পাওয়া যাউবে। প্রাথমিক পরীক্ষার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কেন্দ্রীয় দপ্তর এই বৃত্তিগুলির জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করিবেন।

উদ্বাস্ত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

সম্রাতি দাদবপুরের বিজয়গড় উদ্বাস্ত বিদ্যালয় ভবনে বাস্তবায়ন প্রাথমিক শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহুতিত হয়। অধ্যাপক প্রিয়ব্রজ সেন সভাপতিত্ব করেন ও অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতি বলেন যে, উদ্বাস্তরা ভারতেরই নাগরিক, অস্বাস্ত নাগরিকগণ যে সময় স্থখ সুবিধা পান, তাঁহাদেরও সেই সকল অধিকার ও দাবি আছে। স্বাস্থ্য ও বস্ত্রের পথেই আসে শিক্ষার প্রের, আর প্রাথমিক শিক্ষার প্রেরের দাবি সকলের আগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক-গণের বৃত্তি:স্ফূর্ত চেষ্টায় যে সকল বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলি যেন উঠিয়া না যায় সেদিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সরকারের যেমন করিয়া আটেনের বলে দখলী জমির সম্বন্ধে কয়েকটি করিয়াছেন তেমন করিয়াই এই বিদ্যালয়-গুলিকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়া বাচাইয়া রাখা প্রয়োজন। সাহায্য বন্ধ করিবার যে কথা শোনা যাইতেছে তাহার প্রতিবাদে অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত বৃহত্তর উদ্বাস্ত সমস্যারই এক অঙ্গ। উদ্বাস্তদের এই অবস্থার জন্য স্বাভাবিক পবিবেশই দাতী, কাজেই সরকারকেই ইহাদের মূল আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা হইতে হইবে। সরকারি সাহায্য বন্ধ করা দূরে থাকুক, সর্বভোভাবে ইহাদের প্রচেষ্টা সাক্ষ্যমণ্ডিত করার জন্য সরকারকেই অগ্রসর হইতে হইবে।

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্র

সম্রাতি মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় ছাত্রদের নির্বাচনে যেন উচ্চতর মান বক্ষা করা হয়। ১৯৫১ সনে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ১৩ জন এন্ডার ছাত্রদের মধ্যে মোটে

১৯ জন পাল করে। ইঙ্গিতীয়সি পৰীক্ষাও
ভাৰতীয় ছাত্ৰদের কল পোচনীয় হইয়াছে।

সেইসঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করিয়াছেন যে
ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এম সি পৰীক্ষার
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্ৰছাত্ৰীরাই কেবল এই
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পৰীক্ষা দিতে পারিবে।
পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে প্রবেশের ক্ষমতা কেবলমাত্র
প্রথম শ্রেণীর এম, এ অথবা বিসার্ট ছাত্ৰরাই উপযুক্ত
বিবেচিত হইবেন।

ডাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলেন যে ভাৰতীয় ছাত্ৰদের
এই পরিচয় আমাদের অগৌরবের কথা। পাঠের
দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়া এই অগৌরবের
মানি মোচন করা ছাত্ৰদেরই হাতে, তাহারা এবিধে
অবহিত হউক। অবশ্য এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের
দায়িত্বও উল্লেখ্য নহে।

নিরক্ষর শিক্ষা

গত অগ্রহায়ণের 'শিক্ষা'র প্রকাশিত 'নিরক্ষর
শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহার প্রবাসীর শ্রাৱণ
সাধার বিবিধ প্রশ্নে উদ্ভূত হইয়াছে। সেখানি
তাল লাগিলেও নামকরণটি প্রবাসীর ভাল লাগে
নাই। প্রস্তুত করিয়াছেন, 'শিখোনামা কি ব্যাকরণ-
সমস্ত ?' নক্সতাবে নিবেদন করিব যে, 'নিরক্ষর ব্যক্তি',
'নিরক্ষর লোক' ইত্যাদি প্রয়োগে নিরক্ষর শব্দ
বহন অকরবিহীন অর্থে ব্যক্তি ও লোকের বিশেষণ-

রূপে ব্যবহৃত হয়, এখানেও তেমনি অকরবিহীন
অর্থে শিক্ষা শব্দের বিশেষণরূপে নিরক্ষর কথাটি
ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গত আর একটি যত্নবান সম্পর্কে লেখকের
একটু বলার আছে। প্রবাসী বলিয়াছেন, "এবং
লেখক আকস্মিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব অর্পণ করেন
নাই; করিয়াছেন আচরণ শিক্ষার উপর।"

তিনি বাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা
সিদ্ধান্ত বা কী হইতে স্পষ্ট হইবে :

"এই উত্তর শিক্ষার কোনটির স্থান আগে :
মাতৃশিক্ষা গড়ে, কি ইচ্ছা গড়ে তাহা বিচার
করিবেন পাঠক"।

চন্দ্রকান্ত ইন্সটিটিউশন

২২শে জুলাই দাঁড়িয়া ডাঃ চন্দ্রকান্ত ইন্সটিটিউশনে
দেখপূজা বিভাগের মহাপ্রবক্তার এককথিতম বক্তৃ-
বার্ষিকী অঙ্কিত হইয়াছে। সকাল সাতটার
গোলদীপিত বিভাগের মহাপ্রবক্তার মর্মবৃত্তিতে
মালামান করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্বের
সমস্ত ডাঃ পি, কে, খোব পৌরোহিত্য করেন।
বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র নিবিলেশ ও শব্দ
উচ্চারণ বক্তৃতা করে। সত্যপতি মহাপ্রবক্তার
মহাপ্রবক্তার স্তম্ভাবলী বর্ণনা করিয়া ছাত্রদিগকে তাঁহার
পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন।

বাংলার বহু শিক্ষালয় হইতে অধ্যাপক অধ্যাপিক
পালন করা হইয়া থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষা

[প্রয়োজিত্বচক্ৰ চার]

বুনিয়াদী শিক্ষার রূপ কি হবে, কেমন করে এই শিক্ষা দেওয়া যাবে, এই শিক্ষার মূল লক্ষণ কি, সেই কথাটা আলোচনা করা যাক।

এ কথাটা এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রাথমিক শিক্ষার একান্ত কোন ধরাধারা সুনির্দিষ্ট রূপ হতে পারে না। একমাত্র প্রাণ থেকেই প্রাণসকলের কাজ হতে পারে, আর প্রাণ হল একটা প্রবাহ যাত্র। সর্বদা নিজেই প্রতিবেগে সে চকল। স্থিরতাব ধীম দ্বিগে তাকে পাকপাকি ডাবে বেঁধে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রিত করা মানেই হল তার মৃত্যু। কাজেই এই শিক্ষার সর্বতোমুখ প্রতিবেগকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ডাখে নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। নিরন্তর একে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে হবে। সমাজের সদা পরিবর্তনশীল জীবনধারার মত এরও সর্বতোমুখী বাণীর নতুন নতুন প্রকাশ হবে। সেই বাণীকে কোন দিকে স্থূল করা চলবে না।

তবুও তার কিছু কিছু নির্দেশ বা লক্ষণ থাকবে বই কি! কিছু সে লক্ষণ হবে নমনীয়। তার তিত্তবে নির্দেশ-বস্তু থাকবে বটে, কিন্তু তা কোন কবেই তার আভাস, ইঙ্গিত, বা অন্তর্নিহিত বাণীর ব্যাখ্যাত ঘটাতে পারবে না।

এইটুকু মনে রেখে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষণের কথা আরম্ভ করতে চাই। বুনিয়াদী শিক্ষা যেনে অপ্রবিশ্রব আরম্ভ হয়ে গেছে। নানান দিক থেকে তার নানা বক্তব্যের সমালোচনাও হয়েছে। কাজেই লক্ষণও তার কিছু কিছু নির্দিষ্ট হবে গেছে।

এ কথা সকলেরই জানা যে, গাড়ীভীই এ যেনে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করান। তিনিই প্রথমে এর পরিকল্পনা করেন এবং ষ্টিটামুটি কতকগুলি

লক্ষণও নির্দেশ করেন। তার প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার একটা স্থিৎব অর্থ এখন শিক্ষাবিশেষের মহলে ঝাঙ্কিয়ে গেছে। আমরা এই শিক্ষার একটু ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলেও মূল লক্ষণগুলির সঙ্গে তার কোন পরমিল নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হল যে, পুঁথি দিয়ে এই শিক্ষা শূক হবে না। হাতের কাজ, পারিপার্শ্বিক জীবন ধারা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে অর্থাৎ এইগুলিকে অবলম্বন করে এই শিক্ষা শূক হবে। হাতের কাজটা কেবল খেলা বা খেলার কাজ হবে না। সেটা হবে উদ্বেগমূলক সৃষ্টির কাজ অর্থাৎ উৎপাদনাত্মক প্রয়োজনীয় শিল্প নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করা হবে।

শিশু কাজ করতে ভালবাসে, বই পড়তে ভালবাসে না। বই তার কাছে অর্থহীন। সেই অল্প শিশুকে ছোঁয় করে বই দিয়ে বসিয়ে রাখলে তার স্বাভাবিক কর্মশক্তির সূরণ হয় না, তার মনে প্রেরণা জাগে না, সে নতুন সৃষ্টির আনন্দ লাভ করে না, বক্তব্যের মত কোন একটা কিছু করতে পারা বা পড়ে তোলায় গৌরব বা আনন্দপ্রসাদ সে বোধ করে না। নিজে যে কিছু করতে পারে এ বিশ্বাস তার হওয়া চাই, কেন না এই বিশ্বাস থেকেই ভবিষ্যতে তার মধ্যে আত্মমর্যাদার বোধ জেগে উঠবে। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই কর্মের বাধা বা প্রতিবন্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এক দিকে যেমন সে স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা লাভ করবে, অন্য দিকে তেমনই তার মেহ, ইন্দ্রিয় ও মন স্বাভাবিক বিকাশ লাভ করে সতেজ ও সুসমঞ্জস হয়ে উঠবে। এক কথায় তার মেহ ও মন কাজ ও মনের খোঁজক পেরে সর্বাঙ্গীন পটুতা লাভ করবে।

তাই যে-কোন উৎসাহনাস্তক কৃষ্টিবিদ্য নিজে প্রাথমিক বুনিয়াদী বিভাগেই কাজ শুরু করা হয়। সাধারণত তুলসি ও চরকা বা সবজি উৎসাহনের শিল্পকেই প্রথম শিল্প হিসাবে নেওয়া হয়। অতঃপর কোন স্থানীয় শিল্পকে আত্মবৃত্তিক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানভেদে ও উপযোগিতা-ভেদে আত্মবৃত্তিক শিল্প নানা রকমের হতে পারে। সুতাকাটা ও সবজি উৎসাহনের চাহিদা প্রায়াকলের পর্যায়ই আছে। তা ছাড়া এই কাজের বিভিন্ন ভাবে সংযুক্তি অল্প সময়ে কাজের একটা সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়। সেই জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি শিল্প বিশেষ উপযোগী।

সে খাই ছোক, বুনিয়াদী শিক্ষার শিল্প প্রথমে হাতের কাজ আশ্রয় করবে। হাতের কাজ করতে করতে সে হাতচাট ও কাজের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবে। প্রত্যেকটি পথে নান লেখা থাকলে সেই নাম লেখার দরকার সে বোধ করবে। বিভাগের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে হতেও সে হাতের কাজের জিনিষপত্রের নাম জানার দরকার অনুভব করবে। তার নিজের নাম ও এই সকল জিনিষের কাজের নামের তিস্তর দিয়ে তার লেখাপড়া ও হিসেব আশ্রয় হবে।

কাজের দিকে শিশুর স্বাভাবিক গতি। সেই কাজ থেকে হবে কাজ-কথা। কাজ-কথা ছুঁতে হবে বই। কাজের হিসেব থেকে আসবে অঙ্ক। কাজের জিনিষের পরিচয় থেকে আসবে দেশ বিদেশের পরিচয় এবং অতীত ও বর্তমানের সংযোগ অর্থাৎ ইতিহাস ও ভূগোল। আশপাশের প্রকৃতির পর্যবেক্ষণের ফলে আসবে বিজ্ঞান, এবং প্রাণের ও দেশের উৎসব থেকে আসবে আনন্দ ও নতুন শিক্ষা। প্রথম কর্তব্য বৎসরে শিক্ষার চারটি হবে এই রকমের। এই সময়ে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের বই নিজেদের তৈরি করে নেবে। পরের তৈরি বইএর সাহায্য

নিজে তারা আশ্রয় করবে তখনই, যখন তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপুষ্ট লাভ করেছে।

এই শিক্ষার দ্বিতীয় যে লক্ষণ পাণ্ডীকী নির্দেশ করেন সেটা হল এই যে, এ-শিক্ষা আবলম্বী হবে, অর্থাৎ এ শিক্ষা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ নির্ভর করবে না। ছেলেদের উৎসাহ জিনিষের বিক্রয়দুলা থেকে শিক্ষার খরচ উঠে আসবে। পাণ্ডীকী যখন এই শিক্ষার কথা তখন তখন বেশে যাদব নিবারণের কথা চলছিল। দেশ থেকে যাদবজন্মের ব্যবহার একেবারে ফুলে দেবেন এই ছিল পাণ্ডীকীর অন্তরের ইচ্ছা। কথা উঠেছিল, যাদবজন্ম থেকে গজবর্ষেটে। যে আর হয় সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে কি করে? সেই কথা চিন্তা করতে করতে পাণ্ডীকী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেন। সেই শিক্ষাকাল লাভ বৎসরের অর্থাৎ সাত থেকে চৌদ্দ বৎসরের হবে বলে তিনি ঠিক করেন। এই সময়ের মধ্যে প্রায়ের ছেলেদেরদের মধ্যে মোটামুটি একটা সমগ্র ও সর্বাঙ্গসম্মত শিক্ষার গোল-গঠন হবে, এই কথাই তিনি মনে করেছিলেন। আর এই সাত বৎসরের সময়ের চোটার বলে উৎসাহিত্য দ্বারা বিভাগ চলতে পারবে, এই ছিল তাঁর ধারণা।

বর্তমানে যে পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে তাতে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ রকমে আবলম্বী হবে উল্লেখ কি না সে বিষয় নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, বিভাগের উৎসাহ আর থেকে আংশিক ব্যয় নির্বাহ হয়েই। কিন্তু শিল্প যদি বোধ করে যে সে নিজে থেকে নিজের শিক্ষার ব্যয়, অন্তত আংশিক ভাবেও, নির্বাহ করতে পারছে, তা হলে যে-পরিমাণ নৈতিক ও চারিত্রিক বল সে লাভ করবে তা তাকে, তার সহানুভূতি, তাঁর জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ হল,

ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা নতুন সমাজের বোধ জাগিয়ে তোলা। কাজ, লেখাপড়া, উৎসব-আনন্দ সবের তিত্ব দিয়েই তারা হবে পরম্পরের প্রতি নির্ভরশীল। কাজের তিত্ব দিয়ে তারা একটিকে যেমন হবে উঠবে দাঁড়িয়ে, অন্য দিকে প্রত্যেকের জীবনের মূল্য তারা হাতে কলমে করতে পারবে এবং পারম্পরিক সহযোগিতার কাজ যে ভাল হয়, বীয়ে বীয়ে এটাও তাদের উপলব্ধি হবে। তা ছাড়া শারীরিক জীবকে যথাযথ দেখার ফলে, বর্তমান সমাজে বৃদ্ধি ও শারীরিকের যে কৌলীকমত বিস্তার দেখা যাচ্ছে, সেই বিভাগটা ঐ বিভাগের সামাজিক জীবনে দেখা যাবে না। সেইটেই হবে পদম লাভ। আজকের পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর সমাজের বিচ্ছিন্ন চাপে ছুটো একটা বুদ্ধিদীপ্ত বিভাগের এই জ্বলন্ত প্রথম প্রথম হয় তো চোখে দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই পরিবর্তন যে একটু একটু করে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল বিভাগের হবে বর্তমান সমাজকে ভিল ভিল করে বহলাবার ক্ষেত্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষা যদি যেনে ছড়িয়ে পড়ে তবে বর্তমান সমাজের খোল-নলচে যেদিন সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে, অতীতের দিকে না তাকালে সেদিন খোঁজা যাবে না, কি করে সেই সমাজ এমন করে বদলে গেল। সমস্তটা বেন আমাদের আগোচরেই ঘটে যাবে।

বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার চতুর্থ লক্ষণ হল, তাতে বিশেষী ভাষা বা ইংরেজি লেখার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। সাত বৎসর ধরে মাতৃভাষা আহত করে, মাতৃভাষার আত্মপ্রকাশ করে ও সর্বাঙ্গীন জ্ঞান অর্জন করে ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রকাশের শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। এই ভাষার তিত্ব দিয়ে যে জ্ঞান তারা আহত করবে, সেটা তাদের হবে সম্পূর্ণ অবিগত। মাতৃভাষা লম্বাক অবিগত হওয়ার দরুন উত্তরজীবনে যদি কখনও তাদের বিশেষী ভাষায় লেখা পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হয়, তবে তারা সহজে ও অল্প সময়ে সেই ভাষার ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নিতে পারবে। তার মত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়ের দীর্ঘ কাল ব্যয় করতে হবে না।

বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার মোটামুটি একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হল। যেনের মোক এটা গ্রহণ না করলে এ শিক্ষা চলবে না। বর্তমান সমাজের চেহারাও তা হলে বদলাবার আর সম্ভাবনা থাকবে না। বর্তমান সমাজের চেহারা ধ্বংস করে রাখতে চান, পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থা বদল করার কথা তাঁদের মত নয়। ধ্বংস নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন, আশা করি, তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত হবেন।*

* "সাধারণ" পত্রিকার মৌলভে।

বানান ভুল

[প্রিয়বন্ধন লেখ]

সুতরাং শিক্ষা পত্রিকা বিবিসিডালয়ের পত্রিকা। ছাত্রদের অকৃতকার্যতার কারণ কিছু কিছু বলা হইয়াছে; প্রতিষ্ঠানের উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে অকৃতকার্যতার পরিণামে কলেজগুলির অবস্থা আর শোচনীয়, কলেজ শিক্ষক ও কৃত্তপক্ষ বিপর, কিন্তু সবচেয়ে ভাবিবার কথা এই যে, সুসম্প্রদায় মানসিক অবসাদভাবে পীড়িত। পরামর্শকে সহজ করিয়া লইতে পারেন কখন? অকৃতকার্যতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন কখন? কিন্তু বিবিসিডালয়ের পত্রিকার ফল যাহাই হউক, পড়াইতে গিয়া পদে পদে যে ভুল বানানের সমুদয় হইতে দূর, তাহার উপায় কি? আমার মনে এক বস্তু বসে, আমার নিকট নাকি সকল পাণেই মার্জনা আছে, শুধু বানান ভুলের মার্জনা নাই; কিন্তু এ যুগের দাপ্তরিক শুদ্ধ বানান করাও কঠিন। একদিকে বিকল্প বিধান, অপরদিকে অভিধানের উদারতা, তাহারও উপর ব্যক্তি-স্বাভাব্য, সমস্ত মিলিয়া আমরা বেন হতবুদ্ধি হইয়া পাই। নিজের বানানটাই যে ঠিক তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। যেখানে হাত দিই, সেখানেই ভুলের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। ব্যাকরণ ও অভিধান দেখা, বারবার অতর্কি সংশোধন—এ সমস্ত উপায় তো অবলম্বন করিতেই হইবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার “বাংলা পড়ানো” বই খানার স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চোখ পরীক্ষা করাইবার কথাও বলিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আর কিছু বলিতে চাই। অনেক ছেলে ঘরে ছাপার সমস্ত লেখা চোখ দিয়া পড়ে না, কিন্তু ঘন দিয়া পড়ে—অনেকটা অহুমানের অর্থ বুঝিয়া নেব, অনেক শিক্ষকেরই একটা অভিজ্ঞতা আছে।

এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকবন্ধু হইলি বটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের অবগতির দৃষ্ট প্রকাশ করিতেছি। অনেক বিজ্ঞানী ব্যক্তিও পুত্র—তিনিহাছি, উদ্ভিদার কোন সামন্তপ্রাণের পুত্র—অস্বাস্থ্য সকল বিষয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হইলেও ভুল বানানের দ্বারা শিক্ষক প্রভৃতি সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া যানিত, নিজেও অবশ্য ঠিকিত, বুদ্ধি ও বিচার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করিত না। তাহার গৃহশিক্ষকের সহিত কলেজের অন্য কোন শিক্ষক এই বিষয়ে আলোচনা ক্রমে বলিয়া কেলে, ঐ কলেজেরই মনেই ইংরেজীর অধ্যাপক হোমিওপ্যাথি ওয়ান পেন, তাঁহাকে একবার দেখাইলে কেমন হয়? ছাত্রটি ঘুমে বানান ঠিকই বলিত, কিন্তু লিখিবার সময় কেমন বেন সব গোলমাল হইয়া পাইত। অধ্যাপক তাক্যার গৃহশিক্ষকের অসুযোগে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিলেন, এবং একবার ঔষধ সেবনেই ছাত্রটির বানান ভুলের অভ্যাস অনেকটা দূর হইল।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হইল এই, একজন ছাত্র কিছুতেই বানান ঠিক করিতে পারিত না, সে পড়াশুনার মন ছিল না, খেলাধুলারও ভাল ছিল, কিন্তু তাহারও একজন গৃহশিক্ষক ছিল। ছাত্রটি ছুতর অনেক কিছু বুঝিতে পারিত, বুঝাইতেও পারিত, কিন্তু বানান ভুল এত হইত যে, তাহার বুদ্ধির কোন বল সে পাইত না। ইহার সম্বন্ধে তিনিহাছি, প্রফের গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল। ছেলেটি টেনিস খেলিতে খুব ভালবাসিত, তাঃ বসু তাহাকে টেনিস ছাড়িয়া ব্যাটমিটন খেলিতে বলেন এবং এই

সামান্য পরিবর্তনেই তাহার বানান তুলে অত্যাশ
শোধরাইয়া যায়।

ছইটি ঘটনায়ই বিস্তৃত বিবরণ পাইবাছি, এবং
কোনটিকে বিখ্যা বলিবার কোন লক্ষ্য কারণ নাই।
বিদ্যালয়ে পড়ীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা কত
হইবে।

যে প্রয়োজনীয় তাহাই বলিতে চাই। সমস্ত
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য পাইলে পঞ্চমতী জীবনে

শিক্ষার দিক দিয়া কতি যে কিছুটা পরিমাণে
নিবারণ করা যায়, তাহার ব্যয় শিক্ষককে করিতে
কিভাবে পড়ীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা কত
হইবে।

বিদ্যালয়ে রস-চক্র

[শ্রীমদভ্যাস মুখোপাধ্যায়]

আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যালয় ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি
যেমন বাড়ছে বলে মনে হয়, বলবোধের দৈন্তও
তেননি ক্রমশই পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে—কি প্ৰতীক
আজিওই না বলেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল। আর
বিদ্যালয়ের ছয়ছাড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার এই মর্যাদিক
দৈন্ত দখলে চিত্তা করার সময় এসেছে, কিন্তু কোথায়
সেই রস-সাধনার উৎসর্গিতপ্রাপ শিক্ষক, আর
কোথায়ই বা সেই রসের কাঙাল ছাত্র সম্ভাব্য?
র্যান-কন্ট্রোল বর্ষঘণ্টার অতি বাড়ানোয়
অন্তরের ক্ষুধা পেছে চাপা পড়ে, সেখানে বিরাট
গহ্বর মেলে মাথা চাড়া দিয়েছে বস্তুতাত্ত্বিক পৃথিবীর
দৈব প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য দৈত্যগুলো। এ অবস্থা
মর্যাদিক হলেও আভাবিক মনেই নেই।

বিদ্যালয় তো শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, সমস্ত
ও সংস্কৃতির দিক থেকেও তার একটা গুরু দায়িত্ব
হয়েছে। আরকের শিক্ষা বড়ো বাস্তবধর্মী
ব্যাখ্যাই লাভ করে থাকুক, আর জীবনের সাথে
একে আজ বস্তু অতিরিক্ত করে বেধা হোক না কেন,
শিক্ষার সাংস্কৃতিক প্রয়োজন তো আজও ক্ষুণ্ণ নয়।
শুধু বাহিরের প্রয়োজন, শুধু দৈব প্রকৃতির জাগ্রিত
কোন শিক্ষাই কোনদিন নিয়োজিত হতে পারে না,
পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তো শুধু বাহিরের বাস্তব প্রয়োজনে

পড়ে ওঠে না, অন্তর ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণিতে
প্রাণ-রস জুগিয়ে থাকে। আর শিক্ষার লক্ষ্য এই
স্থায়ী ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেওয়া।
আমরা চাই একটি properly integrated
personality পড়ে তুলতে। এ ব্যক্তিত্ব পড়ে
তুলতে গেলে শুধু পাঠ-ক্রম আর পাঠন-পদ্ধতি দখলে
অবহিত হলেই চলবে না, জানতে হবে শিশুর মধ্যে
নিহিত সম্ভাবনার বীজাংকুরকে, অক্ষুণ্ণ পরিবেশ
সৃষ্টি করে সে সম্ভাবনার ডাঙে বা দিতে হবে দরদ-
তর। অন্তরের আত্ম গমন দিচ্ছে—তবেই আগে
উঠবে পূর্ণাঙ্গ মানুষ, সার্থক হবে সৃষ্টিকর্তার সাধন-
ঐতিহ্য। আর তা না হলে, জন্ম নেবে আরকের
মত সংস্কৃতিহীন বিকৃতরূপ অপূর্ণ মানুষের দল—
শিক্ষা পেতেও তারা শিক্ষিত নয়, আলোর থেকেও
বাদের অন্ধকারের ঘোর ফাটল না। প্রকাশের
দৈন্ত বাদের লোকসমাজে প্রতিনিহিত বিকৃত করে
তোলে, মনের দায়িত্ব বাদের বাইরের ঐক্যকেও
করে উপহাসিত—তারা তো এই শিক্ষায়ই, এই
সাধনায়ই কণ। কিন্তু কেন এদের এই বিঘ্নতা, তা
কি চিন্তা করেছি কোনদিন? কোনদিন কি
ভেবেছি যে, লৌকিকবোধের অভাবে মানুষ শুধু
রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় না, তার মানসিক ও

নারীত্বিক বাহ্যিক ক্ষেত্রেও বিড়ম্বনাও অসম্ভব না।

শিশুর জীবনটা একটা ceaseless becoming, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন হওয়া, তার মধ্যে রয়েছে অস্বস্তি, সৃষ্টির উদ্ভাবনা, সে প্রতিনিমিত্তই চাইছে তার অস্বস্তি হ্রাসের প্রতিভাও, তার মধ্যে অংকুরিত নতুন সত্যসত্যকে বাস্তবায়িত করতে। জন্মের অনন্ত মার্গকে সে চায় প্রাণ মন ভরে উপভোগ করতে। বাইরের আলো হাওয়ায় কবোফ অস্বস্তি তার স্পর্শলু মনে ছোঁয়াচ বেখে বাহ, বিপণিত নীলিমার স্বপ্ন-মন্দির হাতছানি তাকে উদ্ভাবনা করে, সে স্বপ্ন দেখে ঘুম স্নিগ্ধের কোলে আনতোভাবে ছুঁয়ে যাওয়া কোন মাত্রায় তপস্বেয়। সমস্ত বাধার পরে অস্বস্তি শির তুলে সে বলতে চাই—‘আমি আছি।’ কিন্তু অন্তরের লিখা তো শিশু-মনের এই ভাববিভ্রান্ত অস্বস্তির স্বার্থ প্রকাশ ঘটতে সাহায্য করে ছি, বৈদ্যমিন পাঠ্যের বৈচিত্র্য-হীন একঘেয়েমিতে শিশুর প্রাণ-পুরুষ হয়েছে অতিষ্ঠ, পরীক্ষা আর শাসনের স্বতন্ত্র উদ্ভূত হুঁসিয়ারি নিয়ে বাহে বাহে নীড়িত করেছে তার জন্ম-চাকলাকে। আশ্র-প্রকাশের পথে বাধার উপল চাপিয়ে জন্ম-মারী প্রাণ-রসের মশাও উজ্জ্বলকে দমিত করেছে আদর। কিন্তু শিশু-মনের এই ভাবালুতা, এই সৌন্দর্য-বিদ্যুৎ বা স্বপ্নস্রষ্টা নিগানায় নতাই কি কোন মূল্য নেই? পারি না আমরা এই স্বপ্নের প্রকাশের আবেগকে বিভাগের চোখ-কুঠির মধ্যেই পথ করে দিতে? আমরা, বিশেষ করে সাহিত্য-শিক্ষকেরা এ কাজ করতে পারি সব সময়েই, কেমন করে তাই বলি।

প্রত্যেক বিভাগেই একটি করে ‘স্বপ্ন-চক্র’ প্রতিষ্ঠা করে আমরা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে সহায়তা করতে পারি। এই ‘স্বপ্ন-চক্রের’ মাঝে দ্বিগুণে থাকবে পাঠ্যগার, বিতর্ক-ক্লাব, সাহিত্য-চক্র, পত্রিকা সম্পাদনা ও নাট্য-চক্র। এই

স্বপ্ন-চক্র তার পক্ষ মাঝার স্বপ্ন-বক্তার হোমানল জালিয়ে বক্তৃতালাভ আশ্রয় জানাবে স্বপ্ন-সাধকের। এছাড়া তাতে এক একটি মাঝে পুঙ্খ নু পুঙ্খভাবে সৃষ্টি ও সাহিত্যের যে মহান ঐতিহ্য রচনা করবে, বিভাগের lone and tradition-এর দিক থেকে তার মূল্য অসীম, এই স্বপ্ন-চক্র লব্ধে এবার সংক্ষেপে কিছু জানাই।

পাঠ্যগার সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি, কাজেই এবারে সে আলোচনার আর পুনরাবৃত্তি করব না (লিখা মাঘ ১৩৪৮)। ছাত্রের চিন্তা-শক্তিকে প্রসারিত করতে, বিচারবুদ্ধিকে সুকৃতিপূর্ণ করতে এবং বাচনভঙ্গীকে সাবলীল করতে বিতর্কের চেয়ে বড়ো সহায়ক আর নেই। ছেলেরা চিন্তা করে, কিন্তু প্রকাশ করতে গিয়ে সব এলোমেলো হয়ে যায়। উজ্জ্বলের আধিক্য সুকৃতি নাগানাবুদ হয়ে পড়ে, ফলে অতি বড় প্রতিভারও প্রকাশের বৈজ্ঞানিক কাটা যায়। এই দ্বয়বাহার একমাত্র প্রতিকার, বিভাগের স্বপ্ন-চক্রের উদ্যোগে বিতর্কের ব্যবস্থা করা। প্রথম প্রথম সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ের আবৃত্তি বা বক্তৃতার মত। গিয়ে এই বিতর্কের গোড়া-পত্তন করা যায়। মাইকেল মধুসূদনের ‘মেঘনাদ-বিচীর্ণন’ কাব্যের দুইজনের কথোপকথনকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক-সভা বেশ চলতে পারে। বিষয়টির নাম দেওয়া যায়, মেঘনাদকে হত্যা করা লক্ষ্যের পক্ষে কতখানি সুকৃতিস্বত্ব হইয়াছে? বাংলা রচনা-সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্বাচন করে বিতর্কের সূত্র রচনাটি আলোচনা করে নেওয়া যায়। নবম বা দশম শ্রেণীতে পাঠ্য বিষয় হতেই এই বিতর্কের উপাদান পাওয়া যেতে পারে। যেমন ‘মাইচরণের চন্দ্রিকা’ একটি অস্বাভাবিক সৃষ্টি, ‘বক্রিমচন্দ্র ঘোষ আদর্শবাদী’ ইত্যাদি। বিতর্ক-সভার আলোচনার পর বিষয়টি নিবিস্তৃতভাবে সাহিত্য-সম্পাদকের নিকট জমা দিতে বলা হবে। পরে যেটি উৎকৃষ্ট হবে, সেটি বিভাগের পত্রিকায় মুদ্রিত হবে। বিভাগের

বিতর্কের ব্যবস্থা না থাকলে বাইরে ছাত্ররা বিতর্কে নিপুণ হয়ে উঠতে পারে না।

এর পরেই আসে সাহিত্য-সভার কথা। সাহিত্য-সভার আয়োজন সাপ্তাহিক হতে পারে, আবার বিশেষ বিশেষ সাহিত্যিকদের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যেও এই সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠান হতে পারে। এই ভাবে ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সঞ্চারিত করে দিতে পারলে তারা দেশের প্রতি অহুসানী হয়ে উঠতে পারবে। অনেক বিভাগের বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানে নামকরা সাহিত্যিকদের নিয়ে এসে একটা করে বক্তার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের কাজ বিশেষ থাকে না। এর চেয়ে ছাত্রদেরই আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদিতে মুখ্য স্থান ছেড়ে দিলে তারা তাদের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সত্যকারের সাহিত্য-রস উপভোগ করতে পারে। এখানেও আলোচনা বা সমালোচনাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এর পরেই আসে পত্রিকার কথা। প্রায় বিভাগেই একখানি করে পত্রিকা থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা, অতি অল্প সংখ্যক পত্রিকাই ভাল বা রসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্যতা দাবী করতে পারে। যেখানে যেন হয়, যেন দায়দায়গা গোছের একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে শুধু নিয়মিতই রেখে যাওয়াই এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য হয়ে বাড়িয়েছে। বিষয় নির্বাচনে কোন মূল্যমানের ছাপ নেই। তার-বারায় নেই সঙ্গতি, এ যেন এক কিছুত্ব কিম্বাকার সৃষ্টি। অনেক পত্রিকায় শুধু ছেলেদের কাঁচা হাতের লেখা থাকে। অনেকগুলিতে বা শিক্ষকদের পাকা হাতের লেখাই তীক্ষ্ণ করে থাকে। এর কোনটিই মূল্যবান নয়। পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হবে সাহিত্য-শিক্ষকে। তাঁকে অবশ্যই সাহিত্য-রসিক হতে হবে। তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, প্রতিভার মৌলিকতা বা নিরন্তরীণতা থাকা চাই। কখনো কখনো ছাত্রদের বড়দের লেখা বা পুরানো

পত্রিকাদির লেখা নিয়েও যেন চালাবার অপপ্রবৃত্তির বশীভূত হতে দেখা যায়, একেই যদি ছাত্ররা জানে যে, ছাপার বরকে নাম বের করাই পত্রিকা প্রকাশের চরম লক্ষ্য নয়, তা হলে তারা এ লোভ সংবৃত্ত করতে পারে। অন্যদিকে বিতর্ক বা সাহিত্য-সভার আলোচিত বিষয়গুলিকেই প্রকাশের কিংবা সপ্তাহে সপ্তাহে বিভাগরূপে বসিয়ে ছাত্রদের মধ্যে আন্তঃ-শ্রেণী প্রবন্ধ বা গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে এই দুর্নীতি কিছুটা দমন করা সম্ভব হতে পারে। মাঝে মাঝে 'ভ্রমণ' ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারলে সেই ভ্রমণ কাহিনীও পত্রিকাতে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিষয়বস্তুর মধ্যে স্তর-নির্দেশ করে দেওয়া যায়। যেমন ৪ম ও ৫ষ্ঠ শ্রেণীর ভ্রমণ ছড়া, গল্প বা অচিহ্নতার কাহিনী, ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে একটু উচ্চ মানের রচনা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে সমালোচনা, সমস্যা-মূলক প্রবন্ধ, বিভাগের টুকি টাকি ইত্যাদি দেওয়া হবে। এইভাবে ছাত্রদের প্রকাশভঙ্গী, ভাষাজ্ঞান, গঠন-কৌশল ও দেশ-সাহিত্য-জ্ঞান বৃদ্ধি ও সুসমঞ্জস হয়ে উঠবে। তবে শিক্ষকের পরিশ্রম এতে যথেষ্টই হবে, আর সে পরিশ্রম এড়িয়ে গেলে পত্রিকার মান খুবই নিম্ন স্তরের হবে, সন্দেহ নেই।

এই ভাবে বিভিন্ন দিক হতে ছাত্রদের রস-চেতনা উদ্বোধনের সুযোগ করে দিতে পারলে তারা সত্যকারের শিক্ষা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠবে। অত্যন্ত সেনে এই অল্প-কূলতা সহনশীল বলেই তারা বিভাগের হতেই আর হয় সুন্দর ব্যক্তিত্ব আর মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ে। Rugg ও Bhunaker তাঁদের Child centred School গ্রন্থে এই সৃষ্টির দায়িত্ব আর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার কথা বহুভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে এই ভাবে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ও আলোচনার সাহায্যে শিশুর মধ্যে সৃষ্টি-প্রতিভাকে পূর্ণ বিকাশের পথ করে দেওয়া

হয়। আমরাই বা শিঙেনে থাকি কেন? বাঙলা ভাষার শিক্ষক চেষ্টা করলে সমগ্র বিভাগের পরিবেশটিকে নিঃশ্রুতি করে একে রস ও মনের, ভাব ও ভাবার অনন্ত উৎসে পরিণত করতে পারেন। আর শিশুর সংবেদনশীল রস-চেতনা একবার উষ্ম হলে সে অপূর্ব প্রতিভার ঐশ্বর্য সব চেয়ে ঘনীর করতে তোঁ তাঁকেই। এই ভাবে তাঁরাই বিভাগের ঐতিহ্য রচনার সত্যকার সাহায্য করতে পারেন।

পরিণেবে কবিগুরু জয়নিত্তে প্রার্থনা করি—
“এগুণ্ডে জয় গ্রহণ করে জয়রকে বেখেছি, যথকে পেখেছি, ভালবেসেছি ভালবাপার বনকে, এই কথাটি মাহুবেকে জানিয়ে বাবার অধিকার ও শক্তি মান করতে পারে এমন শিক্ষার সুযোগ পেলে যেন বড় হোক, যেনেব সুখ দুঃখ আদ্যা আকাক্যে অমুতে অভিনিষ্ঠ পীডলোকে অমর্যম লাভ করক।”

শিক্ষাব্রতীর আমেরিকা ভ্রমণ

[ত্রিভিনীপকুজার বিবাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি দুই চার কথা বলিমা একটা প্রস্তাব পেশ করিলাম :

“Resolved that the South Africa Government be asked to rescind all its discriminatory legislations against the settled Indians and aborigine of South Africa.”

প্রস্তাব উঠাইবার পর খুইভেন, হলান্ড, উকুভে, পেক, নিকারাগুয়া, চিলি, ফিলিপাইন ও পাকিস্তানের অস্ত্র সচা সমর্থন করিমা বক্তৃতা করিলেন। প্রস্তাবে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হইল।

কোরিয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আলোচনার পর আমাদের অধিবেশন তখনকার যত শেষ হইল।

সকাল প্রায় সাতটায় Bascom Hall-এ এলিটিন মহাপন United Nations Mission in the Field বিষয়ে আর এক বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার শেষে কয়েকটা প্রশ্নেরও জবাব দিলেন। একজন বাঙালী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন সে Indo-

China প্রস্তাব U. N. কেন আলোচনা করে না। উত্তরে তিনি বলিলেন যে কেহ যদি প্রশ্ন তোলে তবে U. N. আলোচনা করিবে।

দুপুরে খাইতে গেলাম। প্রকাণ্ড হল, বোধ হয় হাজার জন এক সাথে খাইতে পারে। খাইবার বদ কিছ একাধিক। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (তিনি আমার কিছুকাল ইউরোপে থাকাবের কাগজের রিপোর্টার ছিলেন) A Reporter Looks at Foreign Policy বলিমা বক্তৃতা দিলেন।

এইখানে সমতাজউদ্দীন নেগন নামে এক পাড়াবী ঐটান কল্লোলকের সাথে আলাপ হইল। তাঁহার বাবা কলিকাতার বর্ষভলার এক শীর্ষার Pastor; বলিতে গেলে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গের যেরেবের শারীরিক শিক্ষার অধিকারী; নিজে যিনিগান বাল্যেয় একটা ছোট কলেজে criminology বিষয়ে

M. A. পড়িতেছেন। এখানে পঞ্চম পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন।

দুপুর দুইটার General Assemblyর খস কালের এক অধিবেশন হইল। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা, বাহা বিগত লীগ অব নেশনস দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্টকে Mandated Territory হিসাবে শাসন করিতে দিয়াছিলেন, এবং বাহার উপর ইউনাইটেড নেশনস-এর ট্রাস্টিনিপ কাউন্সিল এখন কর্তৃত্ব করিতে চান, তাহা এখন দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্ট জোর করিয়া দাবী করিয়াছেন। আমি একটা প্রস্তাব তুলিয়া যে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্টকে বলা হউক, যেন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে ইউনাইটেড নেশনস-এর পতাকা ভোলা হয়। কেহই সমর্থন করিলেন না; সকলের ভয়, পাছে মালান সরকারকে চটান হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন ঐ কলেজের এক রাজাধী ছাত্র। তুমুল এক বৃষ্টি। তিনি বার বার বলিলেন যে ঐ অংশটা দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্তর্গত; ওখানে কিছুতেই অন্য পতাকা ভোলা যাইবে না। হাতিয়া গেলাম।

বিকালে সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন আরম্ভ হইল। পাকিস্তান এখন হইতে পূর্ণাঙ্গ সদস্য। গ্রেটব্রিটেন ও ইরিস্ট-এর মামলার বিষয় কিছু আলোচিত হইল; কোনও নিষ্পত্তি পৌছান গেল না। অনগ্রসর বেশে টেকনিকাল সাহায্য দিবার প্রস্তাব পাল হইল। ভারপর পর দিনের অস্ত্র আলোচনা মূলভূমী বহিল।

রাত্রে আবার জেনারেল এসেমবলীর অধিবেশন আরম্ভ হইল। লিখিতে তুলিয়া গিয়াছি যে জেনারেল এসেমবলীতে প্রত্যেকবারই প্রথমে প্রতি বৈশেষ নাম করিয়া হাজিরা তাকা হয়। প্রায় প্রত্যেক বেশে হয় ইংরাজীতে "প্রজেন্ট" বা ফরাসী ভাষায় "প্রোজ" বলিয়া উত্তর দেন। আমি পরিচার উদ্ভূত

"হাজির, অদ্য" বলিয়া কাক শেষ করি। সকলেই আমার দিকে সম্মুখদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন।

জেনারেল এসেমবলীতে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। এই প্রসঙ্গে বলিলাম যে, ভারতীয়রা সেখানে উপযাচক হইয়া যায় নাই; দক্ষিণ আফ্রিকা তাহাদিগকে বন্দ করিয়া সেখানে লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ধরে এবং চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতি হইয়াছে। তখন তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। ভারতীয়দের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘকাল বহিষ্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার সভ্যগ্রহের উৎপত্তি এই দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারতীয়দের আন্দোলনের নিছনে ভারতের মধ্যেই সাধায়া ছিল। এইজন্য পাকিস্তান দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনও পৃথক হাই কমিশনার বা রাষ্ট্রদূত পাঠায় নাই। সেখানে ভারতীয় অর্থে পাকিস্তানী ও ভারতীয় হিন্দু মসজিদ। আমার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া আর একজন পাকিস্তানী প্রতিনিধি বক্তৃতায় বলিলেন যে সেখানকার আদিম অধিবাসীরা "নিম্ন বাস্তব্যে পরগ্ৰেণী", তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছুই অবহেলিত। আমার "নোট" পাইয়া আরও বলিলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনারী মাইকেল স্টুট হানীর অধিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউনাইটেড নেশনস-এ আসিয়া অভিযোগ করিতে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্ট তাহার বেশে কিরিয়ান পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি উত্তরে বলিলেন যে, ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার স্বরাষ্ট্রা ব্যাপার, এখানে কিছুতেই আলোচিত হইতে পারেনা। দুইজন ভারতীয়কে দুইটি বিকল্প বেশের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া সকলেই বেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এবার কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সমর্থন পাইলেন না, সকলেই আমার পক্ষে ভোট দিলেন।

পর দিন সকালে সিকিউরিটি কাউন্সিলের
আধার অধিবেশন আরম্ভ হইল।

রাশিয়া বড়ই গোল বাধাইতে লাগিলেন।
প্রস্তাব হইল যে, দ্রুততম ভাবে ও সুস্থানের ব্যাপারে
সালিশী করিবার জন্য একটা কমিটি গঠন করা
হউক; কমিটিতে গ্রেট ব্রিটেন, ইজিপ্ট, ফ্রান্স,
ইরান, ইকোয়েটোরিয়াল গিনি, ও ইউনাইটেড স্টেটস
পাকিস্তান, এবং সুদান ইজিপ্টের অন্তর্ভুক্ত হইতে
ইচ্ছুক কিনা জানিবার জন্য সেখানে প্রত্যেক প্রা-
রক্ষকের ভোট লওয়া হউক। রাশিয়া বলেন যে এই
ইউনাইটেড স্টেটস কেন সব বিষয়ে থাকিবেন?
রাশিয়া কেন কমিটিতে থাকিবেন না? বাহা হউক,
এই কমিটি প্রস্তাব পাশ হইল; কিন্তু ভোটের প্রস্তাব
পাশ হইল না। বলা বাহুল্য, দুই চারিজন বিশেষী
ছাত্র ছাত্রী আর সকল প্রতিনিধিই আমেরিকান;
রাশিয়া যখন আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ বিধে
আলাদাভাবে ভাষ্য করতেন, তখন সকলেই
হাসেন।

তারপর পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম:
Resolved that a free and impartial
plebiscite be held in Kashmir immedi-
ately and India be asked to withdraw
her troops from Kashmir. আমি নাতিদীর্ঘ
এক বক্তৃতা দিলাম। হিন্দু মহারাজার অত্যাচারে
কাশ্মীরের মুসলমানগণ নিপীড়িত; অত্যাচারী
মহারাজার সহিত বড়তর করিয়া ভাষ্য লৈল
পাঠাইয়াছে; দেশজোড়ী শেখ আবদুল্লাহ পূর্ণবেশে
প্রতিনিধিত্বশূন্য নব ইত্যাদি অনেক কিছুই
বলিলাম। একজন হিন্দু যে পাকিস্তানের পক্ষে
বলিতে পারে, হোক না ভিয়েটিং ক্রাবে, তাহা
ইহাদের নিকট এতদিন অবিদ্যমান ছিল। এখানে
কয়েকজন বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমান ছাত্র
আছেন; তাঁহারা কিছু এসব ব্যাপারের বড় মাথা
ধারান না। নিজেদের নিরাই ব্যস্ত।

আমি ইহার পর এক কমিশন গঠনের প্রস্তাব
করিলাম, নেদারল্যান্ড, ইউনাইটেড স্টেটস, ইজিপ্ট,
ইরান ও পেরু এই কমিশনের সভ্য। এই কমিশন
ভোটের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতের প্রতিনিধিকে তাঁহার বক্তৃতা বলিবার
জন্ত তাকিয়া পাঠান হইল। তিনি এই প্রকার
কমিশন গঠনের পক্ষে অসম্মত করিলেন, লৈল
সবাই-
বার পক্ষেও অসম্মত করিলেন। পক্ষীয়ভাবে "India
has her vested interests and capital
in Kashmir. India cannot agree to
such a proposal" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুই
জানেন না; একটুও গড়াননা করেন নাই। গুণ
কল্যাণ আফগানিস্তানের এক প্রতিনিধি আমাকে
বলেন যে আফগানিস্তানের বিষয়ে তাঁহাকে কিছু
বলিয়া দিতে হইবে। হানি চাপিয়া বলিলাম, আফ-
গানিস্তানের সকল অধিবাসীই মুসলমান; আফগানি-
স্তান পাকিস্তানের প্রতীবেনী। আমেরিকান বা
ব্রিটিশ হইলেই যে সবস্বাক্ষর হইবে তাহা নহে।

ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া গেলে পর পেরুর
প্রতিনিধি নেলসন মহাপ্রম এক ঘোড়ালো বক্তৃতা
করিলেন। ভারতে দস্তা, গডার, বাগদুত, সাময়িক
এবং অসাময়িক বিভাগে উচ্চপদস্থ মুসলমান ও
খ্রীষ্টান আজও দলদলে কাজ করিতেছেন; এখনও
সংখ্যালঘিষ্ঠপন নির্ভয়ে আছেন এবং তাল তাল
চাকুরি করিতেছেন, এখনও দল কোটি মুসলমান
সেখানে রহিয়াছেন (আমি সংশোধন করিয়া
বলিলাম—পাঁচ কোটি মাত্র), এবং ভারত
বর্মসিংগেজ রাষ্ট্র। আমি বক্তৃতার মধ্যে বাবে
বারে "নোট" পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম যে, পেরু
কমিশনের সভ্য; পেরুর প্রতিনিধি কেন এসব কথা
বলিবেন? কিন্তু তিনি নিবৃত্ত হইলেন না।

ইহার পর আরও কিছু আলোচনা হইল।
আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু কেহই বলিলেন না।
গোল বাধাইলেন আমায় সঙ্গী, আর দুই জন

পাকিস্তানের প্রতিনিধি। তাঁহারাও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। একজন খাশেন তো আর একজন খাশেন না। "মহম্মদ গান্ধী" বলিয়া হাসির খোরাক জোগাইলেন, "মোহন গান্ধী" বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। আমি "নোট" পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম যে সময় চলিয়া বাইতেছে, এখন ভোট গণনা হইবে। কিন্তু এখন খামিলেন তখন সময় চলিয়া গিয়াছে; আমাদের বিতর্ক সভার অধিবেশন স্থগিত रहিল।

ছপুয়ে খাওয়া খাওয়া করিয়া আমরা আমাদের কলেজে ফিরিবার জন্য হওনা হইলাম। এইখানে এক বাঙালী মুসলমান 'ডক্টরলোকের কথা উল্লেখ না করিলে ভ্রম-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ডক্টরলোকের নাম করিব না—পাকিস্তান গভর্নমেন্টের এক পদস্থ কর্মচারী—আমাদের বয়সী। তিনি আগের দিন বিকালে আমাকে বক্তৃতা করিয়া তাঁহার বাড়ীতে নিয়া ভাল ডবকাহি বাঁধিয়া খাওয়াইলেন। বহুকাল পরে দেখি মতে রাজা খাইলাম। তিনি ট্রেনিং লইতে এখানে আসিয়াছেন। ঐ বাড়ীতে তিন খান। বরং তাঁহারা ছয়জন পাক-ভারতীয় আছেন; একটা রাজা বরং তিনটা উনান আছে; সেখানেই সকলের রাজা হয়। দক্ষিণ ভারত ও বোম্বাইয়ের বাঁহারা আছেন তাঁহারা নিয়ামিধানী, কিন্তু আমাকেই ভিন্ন খান। একই উমানে যদি মাসে রাজা হয় তাহাতে আপত্তির কারণ নাই।

ডক্টরলোক ছাড়া বক্তৃতা বলিলেন যে পূর্ববর্তে সম্রাট ও পদস্থ মুসলমান, সাধারণ মুসলমানের মাঝে একই হুঁকার ডাক থাকিবে না; এখন কি, খান বৈঠকখানায় বসিতে দিবে না। অথচ, ইঞ্জিনের মুসলমানের নিকট তুলিয়াছেন, সেখানে নিগ্রো ও আরবদের পরস্পর বিবাহ হয়। আমি যতদূর

করিলাম যে ইংলিশদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী হুঁজে পাওয়া; যেহেতু তাঁহাদের পূর্বপুরুষ অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।

সরকারী কর্মচারীদের চুরির কথা বলিলেন। রেলের বড় অফিসার সেলুনে চড়িলে পর বিল করিয়া T. A. এর টাকা লইতে পারেন, তাহা না করিয়া সেলুনখানা গাড়ীর মাঝে জুড়িয়া দিয়া খালি সেলুন কেবল আসিলে পর বিল করেন। রেলের বড় অফিসার যদি এই প্রকার পুঙ্খ হুঁজি করিতে পারেন তবে গার্ড, স্টেশনমাষ্টারই বা কেন মাছ চুরি করিবেন না? লালমণির হাতে এক গার্ডের মাছ চুরি করিয়া জেল হয়। আর একজন স্টেশন-মাষ্টার মাছের পেট কাটিয়া খানিকটা খাখিরা দেন; গল্পখা স্থানে পৌছিবার পর খান খান করিতে আসিলে পর মাছের অনিবার্য দেখানকার brother in-pro-
fession স্টেশন মাষ্টার বুঝান যে যদিও আছে 'A fish'; তোমাকে তো আমি একটা মাছ ছাড় করি। দিতেছি—কাটা ছুটা থাকিলে তাহার জন্য আমি দায়ী নই!

ফিরিবার সেই একই পথ। যদি কোনও কারণে গাড়ী খারাপ হয়, বা পথে ত্রুটি কাটা হইতে হয় তবে Motel এ সে ব্যবস্থা আছে। জরা যাকনী যেমন দুইটি আবগার আছে সেজে জোড়া দিয়া একটি আস্ত ছেলে পড়িয়াছিল তেমনি, Motor Hotel-এর Motel = Motor কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

রাত্রি নাড়ি এগারটার কার্বনফেল সহরে ফিরিলাম। কোনও প্রকার অস্থিবিধা বোধ করিলাম না। পরদিন সকালে যথাধীতি কাজকর্ম করিতে আরম্ভ করিলাম। এ দেশের জীবন বেশ সর্বদা সুখীয়মান।

পুস্তক-পরিচয়

[ত্রিপ্রবন্ধন সেন]

বঙ্গসাহিত্যে নারী ।

সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ।

ঐক্যব্রহ্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৩৪৭, মাঘ ও
ফাল্গুন । প্রত্যেকটি মূল্য ১০ কপিয়া । বিশ্বভারতী
প্রকাশন, ২ বঙ্কিম চৌধুরী ষ্ট্রিট, কলিকাতা ।

বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থের অন্তর্গত এই দুইটি পুস্তিকা
বর্তমান যুগের বাংলা নবোন্মত্তির ঐতিহাসিক
আলোচনার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা লেখক ঐক্যব্রহ্মনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা । মহিলা-পরিচালিত সাময়িক-
পত্রের ইতিহাস ১৮৭০ সাল হইতে আরম্ভ,

‘সাময়িকপত্রের সম্পাদনে বঙ্গনারী’ নামে কোনও
জ্ঞাপ্তি জন্মায় না ; ‘বঙ্গসাহিত্যে নারী’ নামে কিছু
জন্মাইতে পারে । কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও
বঙ্গনারীর সাহিত্য রচনা ইতিহাসে মগ্নোদবে স্থান
পাইয়াছে ।

পুস্তিকা দুইটির মধ্যে বহু তথ্য সম্মিলিতনে স্থান
পাইয়াছে । ইংলী সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ
কাছে লাগিবে, শিক্ষকেরও । বিশ্বভারতী প্রকাশনের
সম্পাদন ব্যাপারের মর্যাদা ইহাতে অস্বল্প আছে ।
দুস্ত্রাণা আলোকচিত্রসংযোগে পুস্তিকা দুইটির মূল্য
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

যেহেঁচকি শিক্ষার সঙ্গে যমের শিক্ষার, যেহেঁচকি সবলতার সঙ্গে
যমের সচলতার যোগ আছে, এই আশার দৃঢ় বিশ্বাস ।

—ব্রজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিক্ষা

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা

১০ম বর্ষ

ভাদ্র ১৩৫৯

১০ম সংখ্যা

আলোচনা

কুল কোড

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নূতন কুল কোড সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্প্রতি শিক্ষাপর্ষদ ২০ জন সদস্যকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি কুল কোড সম্বন্ধে আনৌত সংশোধনীয় প্রস্তাবগুলি ও জনসাধারণের মনের সংশয়জনক ধারাবাহিক সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সাধাতে কোডের প্রসঙ্গটি সহজে ঘেঁষিতে ও তাহার বিচার বিবেচনা করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা পর্ষদ হইতে করা হইবে। আগামী নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্ষদ কোডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষকের বেতন

ডাঃ বা স্প্রতি বিশ্ব শিক্ষাজীবী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিয়া কোপেনহেগেন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সম্মেলনে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি,

মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি ও বিশ্বশিক্ষাজীবী প্রতিষ্ঠান, এই তিনটি সংস্থাকে World Confederation of Teaching Profession নাম দিয়া একটি মিলিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হউক। এই মিলিত প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র শিক্ষাজীবীদের, সমগ্র জাতিসংঘ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিষদগুলির পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিবে।

বিগত ১০ই আগষ্ট মাধ্যমিকদের এক বৈঠকে ডাঃ অমরনাথ বা বলিয়াছেন যে, বিশেষ অগ্রাধিকারের তুলনায় ভারতের শিক্ষাজীবীদের গড় বেতন সব চেয়ে কম। আমেরিকার শিক্ষকগণ গড়ে বার্ষিক ৩,১০০ ডলার পান (১ ডলার = ৫ টাকা), আর দেখানে ভারতীয়দের তাগো মোটে মাত্র এক হাজার টাকা!

ডাঃ বা আরও বলেন যে, ডেনমার্কের শিক্ষক হার খুব উচ্চ, জীবনব্যায় মানও উচ্চ, এবং বর্তমান সময়ে সেখানে বেকারসংস্কার কোন অস্তিত্ব নাই। লোকের আর্থিক অবস্থাও মোটামুটি ভালো।

মালয়েশিয়া চীনা বিদ্যালয়

মালয়েশিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিঃসেক্টর মিঃ হুইটফিল্ড তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে বলিয়াছেন যে, মালয়েশিয়া চীনাধর্মের পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করিবার বা কর্তৃমান শিক্ষকদের বরোচিত বেতন দিবার ভর চেষ্টা নাই। তাঁহার মতে কোন বিদ্যালয়কেই সমান পরিচালনা করা ঠিক নয়। তবে এই ভাবে অব্যবহার্য মতো চালিত বিদ্যালয় দেশের কল্যাণ করিতে পারে না, বরং অকল্যাণের সৃষ্টি করে।

চীনা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মিঃ হুইটফিল্ড যথা বলিয়াছেন, বিদ্যালয়মাত্রেরই ক্ষেত্রে তাতা প্রযোজ্য। শিক্ষাপ্রণালী ভাল হইলেই শুধু চলে না, সেট প্রণালী বাহারা প্রয়োগ করিবেন তাঁহাদের দিকটাও তাহারা দেখিতে হইবে। শিক্ষকতার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে কিনা তাহা সর্বাঙ্গ দৃষ্টে দেখা দরকার, তাহা সবে সবে সমস্ত পাঠ্যক্রমিকের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

বেকার ম্যাট্রিকুলেট

নূতন জিল্লার এক বিবরণীতে দেখা গেল যে, ভারতে এক লক্ষেরও উপর ম্যাট্রিকুলেট বেকার বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে পুষ্টিমরমে ও বাত্স্যেই ইহাদের সংখ্যা সর্বাধিক। অধিক। ইহারা চাকুরির ক্ষুদ্র এম্প্লয়মেন্ট একচেত্রে নাম লেখাইয়াছে, আর তাহা করে নাই এমন লোকও নিশ্চয় অনেক আছে। এই প্রসঙ্গে আরও জানা গেল যে, বি. এ, বি. এসসি পাশ বেকারের সংখ্যাও কম কম নয়, হাজার গনন্যো হইবে।

এম্প্লয়মেন্ট একচেত্রে অবশ্য এই সব প্রার্থীদের কাজ খুঁজিয়া দিবার ক্ষমতা কিছুকিছু চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু চাকুরি কর্তৃকনের ক্ষমতা সত্ত্বেও দেশের দিল্লী ও বাণিজ্য প্রদেশের ক্ষুদ্র নূতন নূতন কর্ম-প্রতিষ্ঠানের পতন হইলে তবেই না এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই বিপুল কঠোরতার বাস্তব। দেশেরই

শিক্ষাব্যবহার বাহারা নিশ্চিত হইয়া কর্তৃকক্ষে প্রবেশের ক্ষমতা আত্ম প্রস্তুত, তাহাদের কর্তৃকক্ষে কাজে না লাগাইতে পারিলে যে আশাধর্ম আত্মীয় কতি হয়। শিক্ষাব্যবহারে পাণ্টাইতে হইবে, নতুবা ইহাদের কাজের পথ করিয়া দিতে হইবে। চাকুরির ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রতীকার বসিয়া বসিয়া ইহাদের শরীর-মনে যে বিকলতার সঞ্চার হইতেছে তাহাও পরিচালনা করা যায় না—দেশব্যাপী এই ব্যর্থতাবোধ ও নিরাশার অবদান ঘটানো আজ একান্তই প্রয়োজন।

কৃষি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ভ্রম বিবেচনা যাত্রা

কৃষিবিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভের ক্ষমতা ভারতবর্ষ হইতে ২২ জন সরকারি কর্মচারীকে আমেরিকা ও জাপানে পাঠানো হইয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এদেশে কৃষির উন্নতির মধ্যেই দেশের উন্নতির বীজ নিহিত আছে। জাপান ও আমেরিকা কৃষির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সফলতা অর্জন করিয়াছে। তাহাদের সফলতার মূল কি কি ভিন্নস্বাক্ষর কাজ করিতেছে, তাহা যদি ভারতীয় কর্মচারীরা শিখিয়া আনিতে পারেন, তবে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। ভারতের কৃষক কাজ থেকে; তাহাকে যদি উন্নততর উপায়ে অধিকতর লাভের সার্থক পথ দেখ বসিয়া দেয়, তাহা সে লাভে গ্রহণ করিবে। আর এই পথে আমাদের দেশের বেকার সমস্যারও সমাধান মিলিবে।

সৌরাষ্ট্রে গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়

সৌরাষ্ট্রের সরকার ও গঠনমূলক কর্মীরা একটি গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আলোচনার ব্যাপ্ত আছেন। শীঘ্রই তাঁহাদের পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হইবে আশা করা যাইতেছে। জানা গেল, সীনাছড়াই ৪০০ তাক সত্তাপতি করিয়া ২১ জনের একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে, এই সমিতি বুনিয়াবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তিস্তিতে খসড়া রচনা করিতেছেন।

কাকা কালেলকর, ভারতীয় পলিটেকনিক কলিগাছেন। যে কালে বাহার আদ্য আছে, সভাপতি শ্রীমৎলকর, সি. ডি. এল. মেহতা প্রমুখ ভারতীয় পক্ষেই দে কাম কবা সম্ভব। কাকা বিশিষ্ট গঠনকর্মীরা এই সমিতির সদস্য। ইতারা নাগেবেব মত সমস্ত থাকিলে এই সমিতি নিঃসন্দেহ গ্রামে গ্রামে আরও অনেক বুনিয়াদী বিভাগের বুনিয়াদী শিক্ষার কাজকে আগাটরা দিতে খোলাস মত অহুমোদন করিয়াছেন এবং সবকারকে গাইবেরন। আমরা এই সংখ্যার কাকাসাংগেবেব অনতিবিলম্বে গ্রামা বিশ্ববিদ্যালয়টি খুলিতে অহুবেব এ বিষয়ে মূল্যবান একটি বসনা উদ্ধৃত করিলাম।

নয়ী তালিমের নূতন দিন

[কাকাসাংগেব কালেলকর]

নয়ী তালিমের এখন শুভদিন আগতগ্রাম : তার আগল কারণ এই নব বে, লোকে ইহার সমস্ত কিছু গরীকা করিয়া লইয়াছে; কিন্তু শুভদিন আসিবে, কাজে আর পর্বত যে শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, তাহার মকল ঐটি লোকের কাছে থকা পড়িয়া গিয়াছে।

ভারতীয় শিক্ষার তার বাহাংগেব হাতে উদ্বিহা মন্দিরের পুণ্যার মত প্রাচীনগরী, কিন্তু মেন-ভোড়া শিক্ষার বার্ষতা তাহার মেনে নাই এতট: অহু নহেন। তাই নাচাব হইয়া নয়ী তালিমকে স্থান দিবার অস্ত, গ্রহণ করিবার অস্ত তাহার প্রকৃত। শুধু তব এই, পুণ্যনো দেবতার এই সং পুণ্যার হাতে নূতন দেবতার পুণ্য তার পড়িলে নূতন বিধি নষ্ট হইবে, দেবতার মহিমা ক্ষুদ্র হইবে। তাহা হইলেও নয়ী তালিমকে এই পর্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আর, এই সব পুণ্যারদের স্বপড়ার্বাটি, বোড়াবুজিব মধ্য দিয়া নূতন পর্বে প্রবেশ করিতে হইবে। খাদির পক্ষে যে আত্মকৃপা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এই নয়ী তালিমে ছুটিবে না। কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার দেখিতেছি না।

নয়ী তালিম জীবনে নব চেতনা সৃষ্টি করিবার শিক্ষা; শুধু তাই নয়, ইহার গুণ এই যে, এক নূতন

জীবন, এক পূর্ণাঙ্গ জীবন গঠন করিয়া জীবনের মাঝামে মে রাষ্ট্রকে নূতন শিক্ষা দিবার কথা ভাবিতেছে। নয়ী তালিমের মাধ্যমে দেশের নব যুগের নবীন নেতা পাওয়া যাইবে। এটমস্ত ইহাকে বলিয়াছি, Education for a new leadership, শুধু খাদি বিতা, শুধু গ্রাম-উন্নয়ন বিতা, শুধু আর্থিক সমতা স্থাপিত করিবে। সাক্ষীজিব বামবাজা প্রতিষ্ঠিত হইবার নয়। এখন এই বুনিয়াদী নয়ী তালিম এই সব ভাল ভাল বিনিময়ের বুনিয়াদে থাকিবে, তখন সমাজে মেগা যাইবে অনেক পরিবর্তন, আর্থিক পরিবর্তন, জীবনের পরিবর্তন। সর্বোপর্য স্থাপনের কাজ, অহিংসক সমাজ স্থাপনের কাজ, নয়ী তালিম ছাড়া পূর্ণ হইবে না।

আর্থিক সমতা। হা, আর্থিক সমতা অবস্ত এই যুগের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। বুঝা বুনিয়ার এখন আর কাহারও মূখ্যানে ডাকাইয়া থাকিলে চলিবে না—দে সর্বপ্রথমে আর্থিক সমতাই চাহিবে। কিন্তু প্রত্যেক দিচ্চিব অস্ত চাই সাধনা। আমাদের রাষ্ট্র আর্থিক সমতার অস্ত তখনই প্রকৃত হইবে, যখন দেখিব যে সামাজিক সাম্য স্থাপিত হইয়াছে। সামাজিক অস্ত্রাংকে দূর যদি না-ই করি, তবে আর্থিক সমতার সমস্ত চেটা একপেনে হইবে, বিপ্র

জাতিরা আনিবে এবং বিপ্লবের পথও আধিক সমতা স্থাপিত হইবে না। আজ আমাদের দেশের ক্ষমতা হ্রাসের মত উদার নয়; বাহাদুর মতে সমস্ত লোক এক, তাহাদের সংখ্যা অতি কম। চতুর্ভুজ, জাতিভেদ, একধর্মের প্রতি অস্ত্র ধর্মের বিরোধ-ভাব—বহুজন জাতির ও সমাজের মধ্যে এমন লক্ষণ আছে, উত্তম আধিক সমতা কি তাহা আনিবে? এ সমস্ত দোষ প্রথমে বাতিল চাই। আইন দিয়া এ সমস্ত দোষ দূর করা যাইবে না। আমরা অম্পৃক্ততাকে বে-আইনি করিয়াছি। কিন্তু বেশ হইতে কি অম্পৃক্ততা উঠিয়া গিয়াছে? প্রায়ে গিয়া দেখুন, অম্পৃক্ততায় কি দণ্ড। বেচারি হরিজন, আইনের সাহায্য লইতেও ভয় পায়। তাহাদের অধিকার লইয়া সমাজে সংগ্রাম করিবে এমন সংস্কারকে দেখিও ভয় পায়। আমরা জীবনের বাহা কিছু পরিবর্তন চাই, তাহা সামাজিক আন্দোলন ও আত্মবলির সাহায্যেই হওয়া সম্ভব।

এই জীবন পরিবর্তনের মত যে সব মূল কথা প্রয়োজন, গান্ধীজি সেই সমস্তই এই বুনিন্দী নিকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছেন। বাহাদুর অস্ত্রের পরিচয় হইতে লাগান হইয়া, অস্ত্রকে শোষণ করিয়া রাখিতে চায়, প্রায়ে জীবনের পরিবর্তে অঙ্গ জীবন দান করিতে চায়, তাহাদের মত মতই বৈষম্যিক হউক, তাহারা কার্যতঃ কখনও কিছু করিতে পারে না। তাই গান্ধীজি প্রায়ে জীবন ও বুদ্ধির উপাসনা এই দুইয়ের সমন্বয় করিয়া নির্দোষ এবং নতিমান জীবনব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নীতি তালিম প্রবর্তিত করেন।

এই নিকাকে নষ্ট করা সম্ভব, ইহার বিকৃত রূপ

চালান কঠিন নয়। পুণ্যনো নিকা-পদ্ধতির পুণ্যী এই বস্তু হাতে লইয়া ইহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে ও বলিবে, নীতি তালিম পরীক্ষা করিয়া দেখিবাছি, প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ইহা অচল; ইহাই তো আমাদের ভয়। আমেরিকান প্রোভেন্ট বাহাদুর উৎসাহে চালাইতে চাহেন, আমরা কখনও তাহাদের বিরোধিতা করি নাই। আর সংস্কৃতি বলে, যে নৃতন কর্মে তৃতী তাহাকে, নৃতন সত্যকে, নব্যত্ব করিতে হইবে, তাহাও ক্ষম লক্ষ প্রকারে অহঙ্কৃত্য করিতে হইবে। আমরা তাহাই করিতেছি। কিন্তু আমেরিকান প্রোভেন্ট বাহাদুর চালাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, “গান্ধীজির নীতি তালিমের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, প্রমাণ হইয়াছে যে ইহা অচলো, এখন আমরা শুধু আমেরিকান পদ্ধতিই সাহায্য লইতে পারি।” অস্ত্রের নিন্দা না করিয়া বাহাদুর নিজের মাল বিক্রি করিতে পারে না, তাহাওই একজন বলে।

অপেক্ষের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহাসিক ঋণ ও অচায়েব শুণ, সব বিক বিবেচনা করিয়া গান্ধীজি যে বাণী প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা হেলায় ছাড়িয়া দিই, তবে আমাদের অকর্মণ্যতাই প্রমাণিত হইবে। না, নীতি তালিম এক দুর্বল নয়। ইহার নিকট মৃত। এই ক্ষুদ্র চারা গাছটির মধ্যে প্রাণ আছে, আর আছে ইহার উপর গান্ধীজির আশীর্বাদ। এখন ইহার বৃক্ষ আনিয়াছে। পূর্ণ প্রকা লইয়া আমরা ইহাকে যেন অগ্রসর করিতে পারি।

• অনুবাদক—প্রিয়ব্রত মেন

ফ্রেবেল ও মন্টেসরী

[শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ২১শে জুন কিতাবগাটেন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবক ফ্রেবেল দেহবশ্য করেন। ঠিক একশত বৎসর পূর্বে গত ৬ই মে শিশুসমাজের জননী, মানাম মন্টেসরী ৭২ বৎসর বয়সে দেহ বশ্য করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এখন যে প্রাক্তন ব্রিটিশাধী শিক্ষার কথা ভাবিতেছি, তাহাতে এই দুই মনীষীর গান অকস্মৎ হইয়া থাকিবে। দুই তিন বৎসর হইতে ৬য় সাত বৎসরের শিশুদের অল্প কিতাবগাটেন বিদ্যালয় পৃথিবীতে অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশেও দুই মশটি আছে। সাধা বিধে ঐকশ শিশুদের অল্প মন্টেসরী বিদ্যালয়ও বহু স্থাপিত হইয়াছে, এদেশেও প্রধান প্রধান মহলে দুই একটি করিয়া আছে। মানাম মন্টেসরীর সহিত ইদানীং ভারতের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে ১৯০৯ সালে তিনি যাত্রাথে একটি মন্টেসরী ট্রেনিং কোর্স চালাইতে আসেন—যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ইনি এদেশেই অস্থায়ী হন। তিনিছিলেন ইতালী দেশের নাগরিক। কলে তিনি প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতীয় শিশুদের সেবার আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করেন।

ফ্রেবেল ছিলেন জার্মান। কিশোর বয়সে তিনি এক উদ্ভানপালকের অধীনে কিছুকাল কাজ করেন। এই সময়েই প্রকৃতির সহিত তিনি একান্ত হন; অরণ্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য কবি ও হার্মনিকের চিত্তকে ব্যাসবহু করে, সেই অরণ্যের বাসী তিনি প্রবণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, যাহাযের জীবন ও বৃক্ষলতার জীবনের মূলে একই নীতি। উভয়েই যব প্রকৃতি অল্পসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উদ্ভানপালকের কাজ হইতেছে বৃক্ষের নিজ প্রকৃতি

অল্পসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার মত অল্পকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। নিকবেরও কর্তব্য হইতেছে, শিশুর স্বীয় প্রকৃতি অল্পসারে বাড়িয়া উঠিবার পক্ষে অল্পকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। এই কারণেই তাহার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেন কিতাবগাটেন বা শিশু উদ্ভান।

ইতিপূর্বে কতালী শিক্ষাবিদ কলো শিক্ষাসমাজে তাহার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। জার্মানিতেও নেটোলন্দিনি তখন স্বীয় শিক্ষানীতি দ্বারা সমগ্র জগৎস্থর আন্দোলন কলো চিত্তা করিতেছিলেন। ফ্রেবেলের শিক্ষাপ্রণালী এই দুই জনের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তিনি নেটোলন্দিনির শিক্ষানীতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কারণ নেটোলন্দিনির শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, যুগ্ম করানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত, অথচ বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যে অজানী যোগ থাকা উচিত, তাহা উপেক্ষা করা হইত।

কিতাবগাটেনে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে ফ্রেবেল বৃদ্ধিলাভ, শিশুর প্রাথমিক জীবনই খুব মূল্যবান। অল্প বয়সে যে শিশুরা আসিত, তাহার স্মৃতির ভাবে পড়িয়া উঠিত, কিন্তু সাত আট বৎসর বয়সে যে শিশুরা আসিত তাহাদের প্রকৃতি বিকল পদ্ধতিতে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কলে পার্বেকার মধ্যেও যে ঐক্যমুদ্রা আছে—ঐ ঐক্যমুদ্রাই জীবনকে স্বন্দর ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারে—সেই ঐক্যের বোধ জাগ্রত করা দুরূহ হইয়া উঠে। তিনি বৃদ্ধিলাভিলেন, যাহাযের জীবন বাপে বাপে বিকলিত হয়, প্রথম বাপে যদি কোনও ভ্রুটি থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী বাপগুলি

ক্রটিপূর্ণ থাকিয়া হইবে। নিত্যকাল হইতে পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে মাতৃশব্দ প্রকৃতি পনেরো আনা গঠিত হইয়া যায়। সেজন্য একদিকে তিনি যেমন বলিলেন, পৃথক পৃথক প্রথম বিজ্ঞান, মাতৃক্রোড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ, অপরদিকে খুব অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কিতাবগাটেনে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা এমন ভাবে করিলেন, যাতে মাতৃক্রোড় হইতে তাঁহার বিজ্ঞানকে আগমনের মধ্যে পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু না থাকে, নিত্যচিত্ত যাতে আলোড়িত বা বিস্তৃত না হয়।

যাহা হউক, ফ্রোবেল এষ্ট শিশুদের লইয়া তদ্রূপ হইয়া গেলেন। কিন্তু শেষ জীবনে আনিয়ান বিপ্লবে তাঁহার কিতাবগাটেনে দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল। তাঁহাকে লোক-পালক বলিষ্ঠ ও উপহাস করিত। এই সময়ে লণ্ডনে গিয়া শিশুদের লইয়া 'পাগলামি' করিবার সময় অনেকগুলি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সেখানে কিতাবগাটেনে স্থাপন করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার পর তিনি যাত্রা চারি বৎসর কাল জীবিত থাকিলেন এবং এখানেই কিতাবগাটেনের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল।

ফ্রোবেলের মৃত্যু হয় ১৮৫২ সালে, আর মাধাম মন্ডেসরীও ১৮৭০ সালে। ইতালি দেশে তিনিই প্রথম মহিলা চিকিৎসক। জড়বুদ্ধি শিশুদের চিকিৎসার সুযোগ লাভ করার তিনি ক্রমশ তাঁহাদের বুদ্ধি বিকাশের জন্য নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং উদ্ভাতে খুব সাফল্য লাভ করিলেন। ক্রমে ৩৬ বৎসর বয়সে খুব দরিদ্র শিশুদের জন্য এক কিতাবগাটেনে স্থলিয়ার তিনি সুযোগ লাভ করেন। এইখানেই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রণালীর সূত্রপাত।

ফ্রোবেল ও মন্ডেসরী উভয়েই মূল নীতি—শিশুকে আত্মশক্তি অহুলাতে বিকাশলাভের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাও। ফ্রোবেল বলিতেন, শিশুর শিক্ষা হইবে অনক্ষা, বাস্তবিক ভাবে—তাঁর

প্রকৃতিকে বাবা দিয়া বা শিক্ষার জন্য নির্দেশ দিয়া নহে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর কিতাবগাটেনে তিনি এই নীতিকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই—ইহা আদর্শই থাকিয়া গিয়াছে। মন্ডেসরী এই নীতিকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। এমন কি, শ্রেণীকক্ষেও উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া ফিলিপে এই নীতিকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায় তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

ফ্রোবেলের কিতাবগাটেনে শিশুকে 'উপহার' (Gift) দেওয়া হয় এমন জিনিষ যাহা খেলনা অথচ শিক্ষামূলক। মন্ডেসরীও শিক্ষামূলক নানাবিধ উপকরণ (Didactic Apparatus) উদ্ভাবন করেন, ছোট ছোট শিশুর দল এইগুলি লইয়া খেলিলে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশের সহায়তা হয়।

ফ্রোবেল বলিতেন, শিক্ষাদাতা সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন যাতে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজ হয়; অথচ প্রকৃত পক্ষে তাঁহার শিক্ষা প্রণালীতে যেহেতু অনেক মানসিক শক্তির বিকাশের উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। মন্ডেসরী শৈশবের প্রাথমিক অবস্থার ইঞ্জিনসমূহ এবং পেলী দফাগনের যাবায়ে যে শিক্ষা তাহারই প্রতি সমর্থিত দৃষ্টি দেন। এই জন্যই ফ্রোবেলের নীতিতে শিশুর কাজ বলিতে প্রধানত স্বরমবর্ষী ও বাস্তবামূলক কাজই বুঝায় এবং এই উদ্দেশ্যে বহু প্রকারের নিকোপকরণ শিশুর হাতে দিয়া তাহাকে ইহাও মনে হইতে বাছিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হয়; কিন্তু মন্ডেসরী প্রণালীতে বিশেষ অবস্থার বিশেষ শিক্ষামূলক খেলনা দিয়া শিশুকে নিম্নের দ্বায়ে জুগ করিবার ও আক্সেটোর কুল সংশোধন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। কিতাবগাটেনে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ দেওয়া হয় এবং পরীক্ষাও লওয়া হয়। কিন্তু মন্ডেসরী কুলে শিশুর প্রকৃতি অহুলাতে তাকে আক্সেটোর শিক্ষা লাভ করিতে দাও, ফ্রোবেলের এই আদর্শই বাস্তব ভাবে অনুসরণ করা হয়। এখানে কাল অর্থাৎ

নিম্নের খেলা হয় ব্যক্তিগত ভাবে—দুইজন নিম্নের ব্যক্তিগত সমতা একজন হয় না—তাই প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষণকরণ লইয়া কাজ করে, যখন প্রয়োজন হয় পরিচালিকা (অর্থাৎ শিক্ষয়িত্রী) তাহাকে সাহায্য করেন। ইহাই পাঠ দেওয়া।

পুর্ববর্তী নামানুসারে এখন বহু কিণ্ডারগার্টেন ও মন্ডেলস্টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু একটি আপত্তি আছে। সর্বত্রই ঠিক স্বেচ্ছেন বা মন্ডেলস্টীৰ আদর্শ অনুসৃত হইতেছে কি না জানি না। পরি-

চালনার দোষ অনেকেরে উগা প্রাপ্তীন বয়ে পরিণত হইতে পারে। তিন্তেত কিণ্ডারগার্টেনের উপহার নামক খেলার সহতায় বা মন্ডেলস্টীৰ শিক্ষা-মূলক খেলায় উপকরণ (Didactic apparatus) কালক্রমে বৈচিত্র্যমীৰ হইয়া পড়িতে পারে। ইহাতে ঐ দুই মনীষীৰ শিক্ষাবর্ননের কুটি বৃদ্ধায় না, কিন্তু শিক্ষক বা পরিচালক যদি সত্যাই প্রাপ্তবয়স্ক ও সৃজন-ধর্মী হন, তবে নানা ক্ষেত্রে নূতননূতন উদ্ভাবন দ্বারা উভয়েই শিক্ষামৌতিক আদর্শ সমৃদ্ধ ও সফল করিবা ভূমিতে পাবেন।

“আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইচ্ছিম-মনের তৎপরতা প্রথম হইতেই অনুশীলিত হোক, এইভেই শিক্ষা-সাধনা সফলতর কর্তব্য বলে মনে করিতে হবে।”

—স্ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের উৎসব

[শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত]

[প্রকৃতির সঙ্গে শিশুদের সহজ পরিচয়ের দ্বারা আনন্দের সঞ্চার করিবার জন্য এই নাটিকাটি লেখা হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইহার অভিনয় খুবই সম্বোধনীয় হইয়াছিল। ব্যাপক উপযোগিতার জন্য ইহা এখানে প্রকাশিত হইল। —সম্পাদক]

পাত্র-পাত্রী

বেল	নিউলি
আম	কোবিল
তাম	টুন্টুনি
শাল	টিয়ে
হরিণ	কাঠুরে

রূপ-সজ্জা

বেল, আম, তাম, শাল* ও নিউলির হাতে থাকবে বেল, আম, তাম, শাল ও নিউলির একটা করে ডাল। বেলের পরিষ্কার হবে পেরুরা, আম, তাম ও শালের হবে সবুজ, শালের মাথায় থাকবে একটা বড় পাগড়ি। কোবিলের পরিষ্কার হবে কালো—টিয়ের খুব সবুজ ও শাল, টুন্টুনির সাদা ও কালো, হরিণের হবে চুটকাটা। নিউলির পরিষ্কার হবে সাদা ও শাল। কাঠুরের ঠাণ্ডে থাকবে কুকুল।

মঞ্চ

মঞ্চের মাঝখানে দশে বনের মত করে।

* যে দেশে শালসহ খাই সেদেশে শালের অভাবে বেবোরা প্রায়শই ডাল ব্যবহার করা হতে পারে।

[আম, তাম, বেল, শাল আর নিউলি মঞ্চে
দাঁড়িয়ে থাকবে, পরে পট উঠবে]

শাল

আঃ—বি আবার (হাত দুটো বিস্তার করে) !

আম

আঃ—বাঁচা গেল।

তাম

প্রাণ বেন কিরে পেলায়।

বেল

শীত গিরে বসন্ত এসেছে, তাই এত আনন্দ।

তালে তালে আবার কটি পাতা গাঝিয়েছে।

শাল

(আমাকে সন্ধান করবে) তুমি তো যেখানে
বেশ, মুকুলের সাথে তারি হৃদয় সেজেছে—তুমি
কে ?

আম

আমি হচ্ছি আম, নাম গোমোনি ? আমার
অনেকগুলো চাল নাম আছে, যেমন—শাল, চুত,
মহকাব ।

শাল

(আমকে সন্ধান করবে) আর তুমি ? তুমি
কে ?

আম

আমি হচ্ছি আম, আমারও অনেক নাম, একটা
মধু, আর একটা হচ্ছে তামলা ।

শাল

(বেগকে সন্ধান করবে) তোমার চেহারাটা কি
কোনক তখনো ! তুমি কে ?

বেগ

আমাকে কেউ বলে শ্রীকল, কেউ বলে বিহ,
তবে অনেকের কাছেই আমি বেশ বলে পরিচিত ।
যাইবেটা আমার বসুটা শুকনো যেখানে তিউবটা
সুত নর । এইবার তোমার পরিচয় দাও । তুমি কে ?

শাল

আমাকে চেন না ? আমি হচ্ছি শাল, আমার
চেয়ে উঁচু, আমার চেয়ে শক্ত গাছ আর নাই, আমি
হচ্ছি বনের রাজা ।

আম

(হো হো করে হেসে) তুমি বনের রাজা ! লম্বা
আর চওড়া হলেই রাজা হওয়া যায় বুঝি ? আমি
হচ্ছি বনের রাজা, আমার চেয়ে যিটি কল আর
পুখিখীতে নাই ।

আম

আমি আমার একটা কল—আমি আমার যিটি ।
যিটি কল পুখিখীতে একমাত্র আম, আমিই হচ্ছি
বনের রাজা ।

শাল

যিটি কলের আবার বড়াই করা চলে ! কল
তো খেলেই কুসিবে যায় কিছু আমার লোহার যত
শক্ত কাঠ যিবে বা তৈরি হয় তা হাজার বছরেও নষ্ট
হয় না । আমিই হচ্ছি রাজা ।

আম

না, আমি হচ্ছি বনের রাজা ।

তাম

না-না, আমি হচ্ছি বনের রাজা ।

শাল

(কৃক তাল টুক) আমি, আমি হচ্ছি বনের
রাজা ।

বেল

আহা, এত গোলমাল কেন ? রাজা বলেই কি
আমি রাজা হওয়া যায় ডাই ?

আম, তাম, শাল

(একসঙ্গে) তার মানে ? তার মানে ?

বেল

তার মানে নিজেদের নিজে বড় বার বড় হয় না,
মশমশে থাকে বড় বলে সেই বড় ।

(শাল, আম, তাম এ সব মূগ চাট)

বেল

বগড়া করে লাভ নাই, তোমরা সবাই বড়,
সবাই সমান । এম, একসঙ্গে মিলে বিশে আনন্দ
করি ।

নিউলি

আমিও চাই আনন্দ করতে ।

শাল

তুমি কে ? (হেসে) কত ছোট তুমি—
তোমাকে যে যেখানেই পাচ্ছি না ।

নিউলি

আমি যে সত্যিই ছোট । আমার নাম শেফালিকা,
তোমরা আমাকে নিউলি বলেই ডেকে ।

আম

তোমার ফল বেতে কেমন ?

নিউলি

আমার ফল নেই, ফুল আছে।

(আম, আম, নাল একসঙ্গে হেসে ওঠে)

বেল

আহা, হাসছে কেন—দেখতো ও কেমন লজ্জার
রূপে গড়ছে ! ওর ফুলের গন্ধ তারি মিষ্টি।

তাম

(সজীব ভাবে) তাতে লাভ !

বেল

লাভ অনেক, ফুলের গন্ধে ঘন ঘূনি হয়। পর-
কালে যখন নিউলি ফোটে তখন চারিদিক ঘূনিতে
ভরে যায়।

নিউলি

সবাইকে ঘূনি ভরেই আনি ঘূনি।

নাল

তুমি ছোটো কিনা তাই—আমরা অত লজ্জা
ঘূনি হই না।

নিউলি

আমি ছোটো বলে আমার ছুঃখ নাই।

আম

যে ছোট তার সুখটাও ছোট, দুঃখটাও ছোট।

বেল

যুব তো পণ্ডিত তুমি ! যে দেখতে ছোট
তার মনটাও বৃষ্টি ছোটো, আর যে দেখতে বড় তার
মনটাও বৃষ্টি বড়। নিউলি দেখতে ছোট কিন্তু
ওর মনটা যুব বড়।

নাল

আমার মত বড় কাজ নিউলি করতে পারে না।

বেল

হাস্তি যদি একটা বড় কল্যাণ ছেঁয়ে বলে
'আমি মনবড় কাজ করেছি', তাহলে কেমন হয় ?

তাম

তোমার গাধা যেমন ঝাঁটা, তোমার কণাও
তেমনি যেন এক একটা ঝাঁটা।

বেল

(হেসে) একটু-মাটু খোঁচা না দিলে তোমরা
যুববে কেন ?

(গান গাইতে গাইতে কোকিলের প্রবেশ)

[গান : বনফুল আজি ফুটেছে]

নিউলি

কি সুন্দর গান, কি সুন্দর গান।

নাল

দেখতে কালো, কিন্তু গলা কি মিষ্টি ! তুমি কে ?

কোকিল

আমার নাম কোকিল।

আম

তোমাকে যেন চিনি চিনি বলে মনে হচ্ছে ?

কোকিল

আমি যে প্রত্যেক বছর আসি। যখন আমের
ফালে ফুল ফালে তখন আমিও আসি।

আম

ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে, বনফুলের সঙ্গে তুমিও
এসে উপস্থিত হও আর বনে বনে লাড়া পড়ে যায়।

নাল

আজ্ঞা কোকিল, গান গাওয়াই কি তোমার
কাজ ?

কোকিল

গান গাওয়াই আমার কাজ, গান গেয়েই আমার
আনন্দ।

(নাল আর আম হেসে ওঠে)

বেল

তোমরা এত হাসছে কেন ?

নাল

তুলে না—ও বলছে গান গাওয়াই ওর কাজ।
গান গাওয়া মাঝে একটা কাজ ? (আবার হাসে)

বেল

(নালকে) তুমি গাইতে পার ? গাও তো
একটু ।

নাল

(নব্বুত হু) গান ? না—তা—গান তো আমি
গাইতে পারি না ।

বেল

(আমকে) জাম ডাই—তুমি একটা গাও ।

জাম

(মাঝা চুলকে) ওসব গল্প কাজ আমি করিনে ।
একটা বড় কাজ করতে বলে আমি করে দিচ্ছি ।

বেল

গান গাওগাটা মোটেই গল্প কাজ নয় ভাট,
ও মত বড় কাজ—সবাই ও কাজ পারে না ।

নিউলি

(কোকিলকে) কি স্বন্দর তোমার গান, তুমি
আমি একটা গান গাও না, আমবা শুনবো ।

কোকিল

আমাকে বলতে হয় না—আমি না বলতে
গান গেয়ে উঠি—গান গেয়েই আমার আনন্দ !

[গান : বাজো হে বাঁশী বাজো]

(গান গাইতে গাইতে কোকিলের আহ্বান)

বেল

কি স্বন্দর ! ও গান শুনে দুঃখী তার দুঃখ হুণে
যায় । কপের চেয়ে কপের আনন্দ বেশি ।

জাম

ঠিক কথা—ও যে কালো, সে কথা মনেই হয় না ।

(টিথের প্রবেশ)

নাল

হাঃ, কি স্বন্দর চেহারা ! গানের রং সবুজ,
চাঁটটি লাল, তুমি কে ?

টিথ

আমার নাম—টিথ ।

জাম

তোমাকেও কেন চিনি বলে মনে হচ্ছে ।

টিথ

চেনো বৈ কি । তোমার ডালে এখন আমি
পাকতে শুরু করে, আমবা এখন কাঁকে কাঁকে
এসে যে তোমার অতিথি হই ।

জাম

আমি আমার জাম তো কাঁচা থেকেই শুক করো;
আমাকে তুলে গেলে ?

টিথ

তুলবো কেন ? চিনি বলেই তো দেখা করতে
আসি ।

নিউলি

তুমি কতদূর থেকে আন ডাট ?

টিথ

অনেক, অনেক দূর থেকে, অনেক গ্রাম, অনেক
মাঠ, অনেক নদী পার হয়ে আমি আসি ।

নিউলি

তুমি তো আকাশে উড়ে উড়ে পার, সেখান
থেকে পৃথিবীটা কেন দেখায় ভাট ?

টিথ

ভাবি স্বন্দর দেখায়—বড় বড় গাছগুলো ছোট
ছোট আগছার মত দেখায় । নদী আকাশের
একগাছা স্রোতের মত দেখায়, আর বাড়ীঘর সব
ছোট খেলনার মত দেখায় ।

নিউলি

আহা, উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াতে কি আনন্দ !

নাল

ঘুরে বেড়াতে আনন্দ ! ঘেঁটেটা পাগলি নাকি ?
যারা হালুকা, বাঘের কিছু নাই তারাট ঘুরে বেড়ায় ;
যারা সারি বাঘের অনেক আছে তারা গভীর হয়ে
বনে থাকে ।

টিথ

বলে থাকলে বলে থাকতেই হচ্ছে কত, যে চলে
সে-ই জানে চলার আনন্দ ।

বেল

টিয়ে ঠিক কথাট বলেছে—এই বনটাই পৃথিবী
নহ—পৃথিবীটা যত বড়, সেখানে অনেক ঘিনিন
যেখবার আছে।

টিয়ে

যাতি থেকে অনেক, অনেক উপরে উঠতে পারি
আমি—নীল আকাশের খবর আমি জানি।

শাল

নীল আকাশটাই সা নহ—নাভাগ বলেও
একটা স্থান আছে—সেটার খবর তুমি রাখ ? সেটার
খবর আমি রাখি, আমার শিকড় মাটির অনেক
অনেক নীচে চলে যায়—মহাকার পাতালের খবর
আমি জানি।

টিয়ে

দরকার নাই আমারে পাতালের খবরে—
অভকারকে আমি বড় ভয় করি। এবার আমি
চলি, এক ভায়গার বেলিকণ আমি থাকতে পারিনে,
আবার আগবো, আবার দেখা হবে।

(প্রস্থান)

শিউলি

(টেঁচিয়ে) আবার যখন আসবে তখন অনেক
নতুন খবর নিয়ে এসে।

টিয়ে

নেপথ্য থেকে টেঁচিয়ে—আচ্ছা, আচ্ছা।
(অন্তিমক দিয়ে টুনটুনির প্রবেশ—)

জাম

যেখ, যেখ, ছোট্ট একটা কে ঘেন নেচে নেচে
দূরে বেড়াচ্ছে !

জাম

ওগো ছোট্ট নর্তকী, কে তুমি ?

টুনটুনি

আমি হচ্ছি টুনটুনি।

শাল

হেমন যজ্ঞার নাম, হেমনি যজ্ঞার চেহারা।
আচ্ছা টুনটুনি, তুমি এত ছোটো কি করে বলে ?

টুনটুনি

আগে আমাকে বলো, তুমি এত বড় কি করে
বলে ?

(সবাই হেসে ওঠে)

শিউলি

আমার কাছে এসো তাই টুনটুনি। ছোট হল
কি হয়—কি হৃদয় তুমি।

টুনটুনি

আমি ছোট, বড় লগে বন্ধুত্ব করতে আমার
ভয় হয়।

শিউলি

ভয় কি ? তোমাকে যে যেখানে সে-ই ভাল
বাসবে।

টুনটুনি

আমিও সবাইকে ভালবাসি।

বেল

ভালবেলে তুমি সবাইকে ভালবাসা পেরেছ।

শাল

টুনটুনি—অ টুনটুনি !

টুনটুনি

(শালের দিকে তাকিয়ে) কোথায় তুমি,
তোমার মাথাটা যে আমি যেখানেই পাজি
না—কত উচু তুমি। তুমি বুঝি সব চেয়ে বড় ?

শাল

ছোট্ট হল কি হয়—যেহেঁটার বুদ্ধি আছে।
তোমরা শুনে তো—ও আমাকেই সব চেয়ে বড়
বলছে। আমিই সব চেয়ে বড়।

বেল

তাই না কি ? তুমিই সব চেয়ে বড়। বটগাছের
নাম শোমনোনি বুঝি।

টুন্টুনি

বট গাছ বৃষ্টি খুব বড়—সব চেয়ে বড় ?

বেল

বটগাছও সব চেয়ে বড় নয়—আরো অনেক বড় গাছ আছে, আবার গাছের চেয়েও বড় আর উঁচু আর একজন আছে।

সবাই একসঙ্গে

কে নে ? কে নে ?

বেল

সে হচ্ছে গাছাড়—সে খুব উঁচু আর খুব বড়।

টুন্টুনি

আমি তাহলে চমুস গাছাড় যেতে।

(সবাই হেসে ওঠে)

নিউনি

ঐ ছোট ছোট না ফেলে তুমি কতদিনে গাছড়ে পৌছবে ?

টুন্টুনি

‘কেন পার ফাস্ত হও হেঁয় দীর্ঘ পথ ?

উত্তম বিহনে কার পুঁথি মনোরথ ?’

(নাচতে নাচতে টুন্টুনির প্রস্থান)

বেল

একমুষ্টি যেয়ে, অথচ কত উৎসাহ !

(হরিণের প্রবেশ)

শাল

তুমি আবার কে ?

হরিণ

আমার নাম হরিণ।

আম

তোমার গলাটি বেশ লম্বা, তুমি বৃষ্টি পান গাইতে পার ?

হরিণ

না, আমি পান গাইতে পারি নে—গলা আছে, কিন্তু পান নাই।

আম

তোমার গাগুলো কত সূক্ষ্ম, তবে তুমি নিশ্চয় নাচতে পার ?

হরিণ

আমি নাচতেও পারি না, আমি পারি ছুটতে।

নিউনি

তুমি খুব ছুটতে পার ?

হরিণ

হ্যাঁ—আমি খুব ছুটতে পারি, আবার সঙ্গে পাশা দিবে কেউ পারে না।

নিউনি

তা হলে তুমি অনেক বেশ বেবেছ—সেই গর বনো।

হরিণ

আমি অনেক বেশ মেরেছি, আমি বেবেছি গাছড়ের বেশ, বড় বড় গাছড় আকাশে মাথা তুলে ঝাড়িয়ে আছে, গাছড়ের গায়ে গভীর বন, সেই বনে থাকে কত পশু, কত পাখী, বাঘ, ভালুক, গুঁড়ি, হাতী, মগ, মনেক, বুনবুলি।

মেখানে গাছড়ের উপর দিবে স্বপ্না বয়ে বাঘ, কত কল ফলে, কত ফুল ফোটে।

নিউনি

তার পরে !

হরিণ

গাছড়ের শেষে সমস্তল বেশ, সেখানে বড় বড় ঘাট সবুজ ঘাসে ভরা, বড় বড় নদী জলে ভরা। মেখানে গাছড়ের বন—তারি ঘর বাঁধে, কেউ চরে।

আম

আচ্ছা হরিণ, তুমি অনেক বেশ বেবেছ, বনো তো সব চেয়ে সুন্দর বেশ কোনটা ?

হরিণ

সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে, যে বেশে আমার জন্ম।

আম

কেন ? আর কোন বেশ কি সুন্দর নয় !

হৃদয়

সব দেশই হৃদয়, এক এক দেশ এক এক বসন্ত
হৃদয়, কোন দেশ সাহায্য, কোন দেশ সমতল, কোন
দেশ বসন্তুসি, কোনটা বসন্তে ঢাকা। শীতের দেশ,
আবার কোনটা খুব গরমের দেশ, কিন্তু সব চেয়ে
হৃদয় হচ্ছে বসন্তুসি।

শিল্প

কেন ?

হৃদয়

সে দেশের ভূগোলভাষা, কলেমুলে, মলে বাতাসে
আবার জীবন, সে দেশের মাটিতে কল্প নিয়েছে
আমার বাণ মা, আমার পূর্বপুরুষ, সে দেশের ভাষায়
আমি মনের কথা বলি।

(সবাই একসঙ্গে)

ঠিক, ঠিক।

বেল

এই ভাষাই তো কবি পেয়েছেন, বসন্তুসি,
হৃদয় হৃদয়।

(সবাই একসঙ্গে গায়)

হৃদয়

(চাষিদের ঘুরে ঘুরে) বাঃ, এখানে তোমরা তো
বেশ আছ।

আমি

তুমিও থাক না আমাদের সঙ্গে।

হৃদয়

এক আশায় থাকতে আমি পারব না। তবে
যাবে যাবে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব।

(এমন সময় নৈশখ্যে বৃষ্টিতে আওয়াবে)

আমি

ঐরে, ঐ যে কাঠুরে কাঠ কাটতে এসেছে।

হৃদয়

তা হলে আমি পালাই। (প্রস্থান)

(আওয়াবে আবার কাছে আসে)

আমি

এই দিকেই আসুচে।

বেল

চুন, চুন, কথা কোটো না, মাহুদের সামনে বেন
কথা কোটো না।

(কাঠুরে প্রবেশ, গাছেবা গির হয়ে কাটার)

পটক্ষেপ

জার্মানীর বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা

[ক্রীতদাসকুমার বিশ্বাস]

প্রিয়পুত্র,

বাড়ির মশাই,

এবারকার শিক্ষার জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। এখানে এক জার্মান ছাত্র আছেন। তিনি নীচের মতো চলিয়া যাইবে। এইমত তাড়াতাড়ি লিখিয়া লইলাম।

জার্মানীর দুই চারিভাগে বিভক্ত, কোক্সলে (Volksschule) ৪+৫ইতে ১০ বৎসর; হোহেরস্কেলে (höhere schule) ১০+৫ইতে ১৮ বৎসর; উনিভারসিটি (Universität) ১৮+৫ইতে ২২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য। কিন্ডারগার্টেন (Kindergarten) ৩+৫ইতে ৬ বৎসর—দুই দিগ্ভায়ে দর্শন্য নয়, কারণ তাহা বাবাভাত্মক নয় এবং সেখানে অক্ষয়পরিচয় লেখান হয় না। ৬+৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা করা বাবাভাত্মক। হোহেরস্কেলে cohereschule বা gymnasiumও বলা হয়।

কোক্সলেতে চারিটি শ্রেণী, হোহেরস্কেলেতে আটটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি শ্রেণী। এই ৪ বৎসরের শেষে যে প্রথম ডিগ্রী পাওয়া যায় তাহাকে স্টাটস্‌একজামিন বলে কিন্তু তাহা নামের শেষে লেখা যায় না। তাহার পরের D. Phil ডিগ্রী প্রাপ্তির এবং তাহা নামের পরে লেখা যায়। কিন্তু যখন এই যে স্টাটস্‌একজামিন দিবার আগে ইচ্ছা করিলে Dr. phil পরীক্ষা দেওয়া যায়। যখন আরও এই যে, এই শেষ দুই পরীক্ষার পূর্বক পাঠ-ব্যবস্থা নাই, ইচ্ছামাফিক যে কোনও একটি পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং পান করিলে ডিগ্রী পাওয়া যায়; তবু শিক্ষক পরীক্ষা দিবার অগ্রমতি দিলেই হইল। বর্তমান স্কুলে পড়াইবেন তাঁহাদিগকে স্টাটস্‌একজামিন পরীক্ষা পান করিতে হইবে,

আর বর্তমান কলেজে পড়াইবেন তাঁহাদিগকে D. Phil পরীক্ষা পান করিয়া ডিগ্রী লইতে হইবে; নতুবা-কহাই পড়াইতে পারিবেন না।

পরীক্ষার খাতায় প্রথম দুই শ্রেণীর স্কুল নব্বু দিবার নিয়ম নাই; “গ্রেড” দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে “গ্রেড”কে A. B. C. D. E. বলে না, 1. 2. 3. 4. 5. চিহ্ন “গ্রেড”-এর ব্যবস্থা করা হয়, “5” কিন্তু ফেল করিবার লক্ষ্য। উনিভারসিটি-এ চারি বৎসরের মধ্যে কোনও পরীক্ষা হয় না; সুতরাং কোনও “গ্রেড” দিবার প্রয়োজন হয় না বা আমাদের দেশের মত প্রয়োজন নাই, তবে কোন ছাত্র কয় বৎসর পড়িল, সে কোন কোন “কোর্স” লইল, [সাধারণত সাত্তি তিন মাসে এক এক নির্দিষ্ট পাঠ্য সমগ্র; প্রতি বৎসরে দুইটি পাঠ্য সমগ্র Winter & Summer Semester; সাত্তি তিন মাসের এক পাঠ্য সমগ্রকে সিমেন্টার বলে। এতদ্বারা কিছু ১৭-১৮ মাসের পড়ান হইলে পর তাহাকে সিমেন্টার বলে; Summer Semester ও Winter Semesterএর মধ্যে তিন মাস দুটি থাকে এবং শীত ও গ্রীষ্মের দুই সিমেন্টারের মধ্যে দুই মাস দুটি থাকে] তাহার একটা খাতা ছাত্রের নিকট থাকে। প্রতি সিমেন্টারের শেষে ছাত্র কোন কোন কোর্স শেষ করিল তাহা শিক্ষক ঐ খাতায় লিখিয়া দেন। প্রতি সিমেন্টারের কী ১০০ মার্ক; ৪ বৎসরের শেষে যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহার জন্য ৪০ মার্ক; কিন্তু Dr. Phil পরীক্ষা দিতে হইলে অনেক বেশী কী দিতে হয়। চারি বৎসরের শেষে পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রকে আবেদন করিতে হয়; তাহার কোনও শিক্ষক অগ্রমোদন করিলে তবেই সে পরীক্ষায় ভাগ করিতে পারে। তাহা লক্ষ্যেও অনেক ছেলে

টোটুম্ একত্বাধিন পরীক্ষায় ফেল করে; কিন্তু অসুযোগের পাইবার পর Dr. Phil পরীক্ষায় খুব কম ছাত্রই ফেল করে। সুতরাং পরীক্ষার ব্যবস্থা বিহীন রাজ্য গভর্ণমেন্টের উপর বর্তাইগাছে। সর্বদাই কোকতুলিতে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা; কিন্তু বেশ ব্যাধি ভিন্ন আর আর সব ব্যাধিই ইওয়েন্তুলিতে মাড়িনা দিতে হয়। কিন্তু যে হেতু ১৪ বৎসর পর্যন্ত ২ শ্রেণী পড়া বাধ্যতামূলক এবং যে হেতু সকলের ইওয়েন্তুলিতে পরমা বিদ্যা পড়িবার সঙ্গতি নাই সেই হেতু কোকতুলিতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরও বিনা পরমা পড়াইবার ব্যবস্থা থাকে। বেশ ব্যাধি বিদ্যাবিস্তারের শিক্ষা পর্যন্ত অবৈতনিক।

ইওয়েন্তুলির শেষ পরীক্ষাকে আবিতুর (Abitur) বলে। আবিতুর পরীক্ষায় পাশ করিয়া আইন, ডাক্তারি, মাস্টারি বা ইঞ্জিনিয়ারী পড়িবার যন্ত্র অসুস্থতি পাওয়া যায়। আইন ৩-৪ বৎসর, মাস্টারি ৪ বৎসর, ডাক্তারি ৬ বৎসর, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে ৪-৬ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নাম কিন্তু Technical High School।

উনিটারিটেই-এ কোনও হাজিরা খাতা নাই; ছাত্রদের মূলে আদা বা না আসা ইচ্ছাধীন। তবে পড়াশুনা ভালভাবে না করিলে শিক্ষকের খুশী রাখা যায় না এবং পরীক্ষায় বসিবার যন্ত্র অসুস্থতি পাওয়া কঠিন হয়। এমেনে কিন্তু শিক্ষকের অসুস্থতি না লইয়া অসুস্থতি বাবিলে তিনি রাগিয়া থাকেন এবং যেহেতু শেষ পরীক্ষা (নিজের নিজের বিষয়) শিক্ষক লইয়া থাকেন সেই হেতু তিনি রাগিয়া নিরস্তর "গ্রেড" দিতে পারেন বা অসুস্থভাবে কতি কল্পিতে পারেন। আর্থানীতে চার বৎসরের শেষে যে পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে ৭৮ জন পরীক্ষক থাকেন এবং তাহারা সকলেই ছাত্রের শিক্ষক নন। পরীক্ষা বৌদ্ধিক ও লিখিত বিষয়ে—হুইই।

শিক্ষকের মাহিনা ১০০ মার্ক হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরের পর বাড়ী হইলে আর ৩০০ মার্ক মাসিক মাহিনা হয়; অল্প বৃদ্ধি পাইয়া আর ৪৫০ মার্ক হয়। প্রধান শিক্ষক সাধারণত মাসিক ৫০০ হইতে ৬৫০ মার্ক পর্যন্ত পান। কলেজের

শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের মাহিনা কিছু বেশী হয়। প্রধান শিক্ষককে সর্বত্রই—এমন কি কলেজেও, Rektor বলে। প্রাইভেট টিউনি সাধারণত একটু নিম্নবী হয়; বিশেষত নিম্নশ্রেণীতে এক-বারেই নিষিদ্ধ। ভালই ব্যবস্থা। ছাত্রদের কমতা থাকিলেই পুঙ্খনিপাত রাখা এবং অবদারিত পানের ব্যবস্থা যে নাই ইহাতে মাঝি সুখী।

এমেনে যেমন দৈনিক ৩৪ ঘণ্টা এবং গরমকালে তিন মাস কাজ করিতে পারিলেই যথেষ্ট অঙ্কনে পড়াশুনা চলিয়া যায় এবং অভিজ্ঞতার নিকট হাত পাতিতে হয় না—অভিজ্ঞতার কমতা থাকিলেও তিনি অনেক সময় পরে পেরে না—আর্থানীতে মে সুবিধা নাই।

আর্থান ছাত্রের নাম দেয় ৩টা মূল্য; আবিতুর পরীক্ষা দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যাবিস্তার হুই বৎসর পড়িয়া আমার মত এক বৃত্তি পাইয়া এখানে আর্থান ভাষা পড়াইতে এবং ইয়োজি পড়িতে আনিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসে এমেন হইতে কিহিয়া আবার দেখানকার বিদ্যাবিস্তার পড়িবেন। এখানে যে এক বৎসর পড়িলেন তাহা দেখানে যোগ হইবে। দেখানে আর এক বৎসর মাত্র পড়িলেই টোটুম্ একত্বাধিন বা Dr. Phil পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। আমাদের মেনে শিক্ষায় যেমন পাপ অপেক্ষা খোলসের উপর আর বেশী হয়, আর্থানীতে তাহা হয় না। ছাত্রদের দায়িত্ববোধ আগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা আমাদের বেশ ছাড়া বোধ হয় সকল পড়া মেনেই আছে।

মাস্টার মহাশয় বহুসে তরুণ; কিন্তু আঁদয়েল নয়। যোমা-বিল্লত আর্থান কোন মহতের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে করণ যথেষ্ট বলিলেন, নিঃ বিশ্বাস, তুমি তো তেমন কোনও মহত দেখ নাই, তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব? তাহার ঠিকানা,

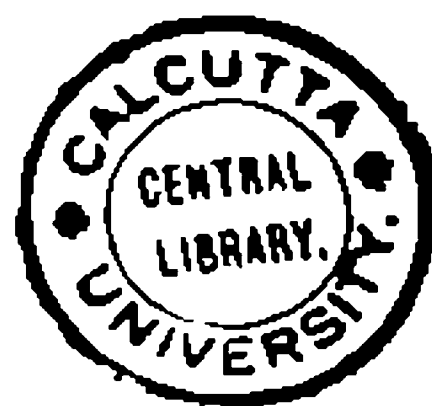
Mr Guother Muller,
Julianacast
16 Dillenburg, Germany.

ইতি

প্রণত

দিলীপ

শিক্ষা



এ হি কল্যাণকর কলিত্তি দুর্গতিঃ ভাও গচ্ছতি

১০ম বর্ষ

আশ্বিন ১৩৫৯

১১ম সংখ্যা

আলোচনা

শারদীয়া

শরৎ কাল আগিলেই বাঙলা দেশের আকাশে বাতালে শারদশস্যের শুভ আগমনের চিহ্ন ফুটিয়া ওঠে, বাঙালী মায়েগেই ক্রমে আনন্দের সঞ্চার হয়। বর্ষার মেঘ মাঠে ঘাটে বে সজীবনী সুস্বাদু ঢালিয়া দিয়া গেল, তাহারই ফলসম্ভাবনার শরৎ কালে আমাদের মন উৎসুক হইয়া ওঠে, আর সব চেয়ে বেশি আনন্দ দেখা যায় ছাত্র মহলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি কিছু দিনের বসন্ত বহু থাকিবে, ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত কর্মপ্রবাহে দিন কতকের জন্ত ছেদ পড়িবে, আনন্দে উৎসাহে তাহার পূজার আরোহণে ব্যাপ্ত হয়। শিক্ষকদেরও আনন্দ বে কব হয় তাহা নহ, অবকাশ তো সকলেই চায়। তাহা হাফা প্রকৃতিরও প্রয়োজন আছে। একটানা কর্মমোতে নিজের অধ্যয়ন, মনন, কিছুমাই সময় পাওয়া যায় না। দীর্ঘ অবকাশে সেই সুযোগ পাওয়া যায়।

বেশি দিনের কথা নহ, যখন পূজাবকালে সহরবাসী

গ্রামে ঘাইত, পূজাটা ছিল উপলক্ষ্য, কিন্তু উদ্দেশ্য আদলে ছিল দেশের সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে যোগ বন্ধ করা। এখন বাংলার ভিত্তি হাওয়া বদলাইতে আমরা বাড়িবে ঘাই, কিন্তু গ্রাম ও গ্রামবাসীর সঙ্গে মিলন আর হয় না। তাই, পূজার ছুটির আগে আমরা ছেলেমেয়েদের ও তাহারের অভিজ্ঞতাদের ঐ কথাটি মনে করাইতে চিতে চাই। শারদীয়া আমাদের দৃষ্টি গ্রামের দিকে ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন। স্বীকৃত্য তাহার অমূল্য ভাষায় বার বার আমাদের বলিচাছিলেন, শরৎের বাহিরে গল্পী অকলেই তাহার মন মুক্তি পাইত। গ্রামবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কতবার পূজার ছুটির আরম্ভে এই দিকে দেশের তরুণদের মনে প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন। শরৎের তো কর্মব্যস্ততা, অধ্যয়ন অধ্যাপনা আছেই, দীর্ঘ অবকাশের এই দিনগুলি যদি আমরা গ্রামের ও গ্রামবাসীর সংস্পর্শে কাটাই তবে গ্রামের উপকার তো হইবেই, যে সবসত্য ও সজীবতা লাভ হইবে তাহাতে আমাদেরও কল্যাণ হইবে।

শিক্ষাক্রমী বেনীমাধব দাস

আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বেনীমাধব দাস মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে বিগত ২৪ মেম্বের কলিকাতার তাঁহার নিজ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি আত্মজীবন শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। প্রথমে চট্টগ্রাম সরকারি বিদ্যালয়ে, পরে কটকে, কক্সবাজারে, অবশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে তাঁহার কর্মজীবন ব্যয়িত হয়। কটকে স্নাতকোত্তর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যাপন কালে নেতাজী স্বতন্ত্র ইংল্যান্ড সংস্পর্শে আসেন। স্বতন্ত্র আত্ম-জীবনীতে পঞ্চম শ্রেণীর এই মহাশয় শিক্ষকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বেনীমাধব আত্ম-জীবনে দীর্ঘ জীবনে বহু চাতুর্যের প্রকাশ অর্থ পাইয়া গিয়াছেন। বহু চাতুর্যের উদ্যম প্রকৃতি তাঁহার স্বেচ্ছা বর্ণনা দায় হইয়াছে।

অবশ্য শুধু শিক্ষক বলিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিতাম না। আত্ম-বর্ণনায় গৃহস্থ, একান্ত বৈ-প্লব্য পিতা, পঞ্চম বিনয়ী, ভগবানে অটল বিশ্বাসী, যাহার মহত্ব আত্মবিশ্বাস, পরহঃস্বাক্ষর, মধুর-প্রকৃতি, বরজাতি, অপূর্ণ গুণগ্রাহী, অতি উদার-হৃদয় বিশিষ্ট সজ্জন রূপে, নানা ভাবে তাঁহাকে জানিবার আমাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। ইংল্যান্ডের মহত্বই বলা যায় অস্বাভাবিক গৃহস্থ, আত্ম-বর্ণনায় কথ, আর হাত তাঁহার কাজে লিপ্ত। এমন নিরহকার লোক বুঝি কম চোখে পড়ে। সুদীর্ঘ কালের শিক্ষকতার তাঁহার জীবনের প্রত্যক্ষ অনেকের উপর পড়িয়াছিল, সেই সব কৃতী শিষ্যেরা এই মহৎ শিক্ষকের গুণের কথা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিলে ছাত্রগণ, শুধু ছাত্রগণ কেন, সমগ্র পুরুষ সমাজ উপকৃত হইবে।

আমরা প্রত্যেকের তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি ও ন্যাকসমস্ত পরিবার-বর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।

অন্ধ বালিকার কৃতিত্ব

শ্রীমতী প্রতিভা বাগচি এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চাইতে বি. এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অস্বাভাবিক এই বালিকার কৃতিত্ব আমরা আনন্দ বোধ করিতেছি। শ্রীমতী জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি করুন, এই কামনা করি।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী

শ্রীমতীনাথানন্দ মন্ডোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিম বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষক সংসদেও একজন প্রতিনিধি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশ্যামলাল বসুর সঙ্গে তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁহাদের আলোচনা হইয়াছিল; (১) স্কুল বোর্ড বিগত বৎসরে শিক্ষকের বাবদ যে অর্থ প্রদান করিয়াছিল তাহা হইতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাপাঙ্গি ভাতা দেওয়া হউক; (২) শিক্ষকের ও স্বামীর বিরূপ হওয়া উচিত; (৩) শিক্ষকদের বেতনের হার; (৪) প্রাথমিক শিক্ষা বিধির সংস্কার; (৫) বিদ্যালয় গৃহের সংস্কার ও উন্নতি বিধান; (৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বিভাগের স্ট্রিক্টারের অধ্যক্ষের তালিকা অস্থায়ী সরকার প্রদান; (৭) সরকারি কাজে আহৃত হইলে বাতায়নের ব্যয়; (৮) মিলেবানের সংস্কার ও পরিবর্তন; (৯) শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কৃতিত্বেরে তাঁহাদের কথা শুনিয়া-ছেন, কিন্তু কতদূর কি করা সম্ভব হইবে তাঁহার কোন আশাস দেন নাই। আমরা কলিকাতার প্রতি চাহিয়া আছি।

পরীক্ষার অন্ততকার্যতার দাবী

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা আজকাল এত বেশি ক্লেশ করিতেছে কেন, এই বিষয়ে তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডে জন সমাজের একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। তাইল চাচেলার এই কমিটির সভাপতি।

আগামী ১৪ই মেম্বের মধ্যে সমস্ত গণকে

তাহাদের বক্তব্য জানাইতে অন্তরোধ করা হইয়াছে ;
আগামী পূজার ছুটির পর কলকাতা খুলিলেই যেন
এতদ্বারা অসুবিধা কাল করা সম্ভব হয়। বিচারপতি
শ্রীমানপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক পি. এন্.
খান্নাভি, ডাঃ জে. পি. নিরোগী, ডাঃ শ্রীধর
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কে. ডি. ঘোষ, ডাঃ অসীম।

চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ডাঃ চন্দা চৌধুরী, অধ্যাপক পি. কে.
সহ প্রত্নতত্ত্ব এই কমিটিতে সমস্ত নিযুক্ত হইয়াছেন।
আমরা আশা করি, প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও
তাহার প্রতিকাণ্ডের উপায় নির্দেশ করিয়া কমিটি
দেশের যুব সমাজের বার্ষিক প্রতিবন্ধ করিয়া
দেশের উপকার করিবেন।

নয়ী তালিম

[আচার্য বিনোবা ভাষে]

(শিক্ষাদানের ধারা কেমন হইবে, বাহাতে যুবক-
যুবতীরা দেশসেবার প্রেরণা পাষ্টতে পারে? এই
প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া আচার্য বলিতেছেন :)

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেই আলোচনা করা
হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, আজকার শিক্ষা
এখনই বদলানো উচিত; কিন্তু আজ আমাদের
লোকমত ব্যগ্রত নাই, আর সরকারের মনও
উদ্বেগনার পরিপূর্ণ। কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে
আমার আলোচন হইয়াছে; তাহারা বলেন যে,
আমাদের চিন্তা করিবার বা বই পড়িবার সময়ই
নাই। আমি কিন্তু বলি, যে চিন্তা করে না সে মন্ত্রী
নয়, সে তারগ্রাণ্ড তন্ত্রী মাত্র। আজ যদি আমরা
মোটর গাড়ি আর হাওরাই তাহাদের ব্যবহার কম
করিয়া করি, তাহা হইলে খোলা আকাশের নীচে
চলিতে চলিতে তাবিবার প্রচুর সময় পাওয়া বাইতে
পারে।

যখন আমরা গ্রামবর্ষের কথা বলি তখন মন্ত্রীরা
বলেন, আন্তে আন্তে করিব; শিক্ষাসংস্কারের কথা
যদি বলি তো বলেন, আন্তে আন্তে করিব। এভাবে
বিগ্রহ হয় না। বৈষম্যিক চেষ্টা যদি করিতে হয়
তাহা হইলে চিন্তাশক্তি চাই, চিন্তা করা চাই।

শিক্ষার যে প্রকার ব্যবস্থা আজ চলিতেছে তাচা
অধিলম্বে বদলানো উচিত, না হইলে উন্নতি হইতে
পারে না। শিক্ষার সহিত কর্মের যোগ চাই, সঙ্গে
সঙ্গে শরীর ও চরিত্র সংস্কারের জন্য শিক্ষা হওয়া
চাই। এসব তখনই হইতে পারে, যখন বিদ্যার্থী সাহস
করিয়া কাজ করিবার প্ররোচনা পায়। সঙ্গে সঙ্গে
শ্রীতা ও স্বাধীনতার দাবীসহ আলোচনার পরিচয়
বিদ্যার্থীদের হওয়া চাই। তাহাদের বিজ্ঞানও
শিক্ষাইতে হইবে; অহিংসার বিকাশের জন্য এবং
গ্রামবর্ষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের বড়ই প্রয়োজন।

এইভাবে শিক্ষা হইবে চতুর্বিধ—(১) গ্রামবর্ষের
জ্ঞান, (২) বিজ্ঞানের জ্ঞান, (৩) দল সাহিত্য
পাঠ, (৪) সমাজ সেবার অভ্যাস, বাহা হইতে
চরিত্র গঠিত হইবে।

যখন গ্রামের লোকে এখনকার পদ্ধতি ফলে
বাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তখন আমি খুশি হই,
কারণ আজকার স্কুল গ্রামের প্রতি, পেশানকার
কাষের প্রতি ও শ্রমের প্রতি শুধু ঘৃণার ভাব সৃষ্টি
করে, আর উহা যে জ্ঞান বিতরণ করে তাহা একে-
বারেই অকাজ। যদি সরকার কোথাও অসুবিধার
নয়ী তালিমের কাজ শুরু করে, তাহা হইলে শিব

গড়িতে গড়িতে যানর গড়িটা ফেলে। এখানে উত্তর প্রদেশে সুনিয়মিত শিক্ষার নামে যে চঃ চলিয়া আসিতেছে, তাহা বড় ভাড়াভাড়ি বড় করা দার ভর্তুকি মতল। আমরা বাহাই নিখাই না কম, চাষের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ ঘেন না ঘটে। ইহাতে প্রফুল্লতা, উৎসাহ, বাহা ইত্যাদি তো বাড়িয়াই থাকে, ফল মনও বড় হইতে থাকে। চাষের কিছু কার্যকর করিলে বিচারকও সমমুগ্ধ নইরা এবং কঃসমস্ত ভাবে নিজের কথা বিচারমুক্ত হইয়া বলিতে পারেন। অধ্যাপকও যেতে কিছু পরিচয় করিলে তাহার মন বড় ও তাহা হইবে। আমি নিজের জাহগাফ হই চার ঘণ্টা যেতের কাজ না করিয়া আর কিছুতে হাত দিতাম না। সেখিতাম, তাহাতে বাহা, স্বতি, তের ও বুদ্ধির সর্বদা বিকাশ

হয়। আসল কথা, শরীর যেমন জীর্ণ হইতে থাকে, বুদ্ধিও তেমনি সতেজ হওয়া চাই। পাকা কল যেমন বেশি থাকিলে গড়িতে ভুল করে, কিন্তু তাহার বীজ বেশি মজবুত ও পাকা হয়, তেমনি শরীর তো জীর্ণ হইবেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও সতেজ হইবে, সুত্বাকালে পুণিমাও চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হইবে। এইজন্য আমাদের নবী তালীমের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

• ২৩ এপ্রিল তারিখে আকবরপুরে প্রদত্ত বক্তৃতার অঙ্কন : অঙ্কনকার—প্রিন্সিপাল মেন। নবী তালিম, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। শিক্ষার ভিত্তি সংখ্যার কাক। সাহেবের লেখাও এখন হইতেই লওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তন

[প্রিন্সিপাল মেন]

(১)

অন্তরে অন্তরে শিক্ষায়তনকে আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করি। এদেশের ঐতিহ্য, ‘অন্তরের কথাই সত্য’। দেশের ঐতিহ্যের বুলিই আমাদের বড় ভর্তুকি। শরীর বড়, তাহাই বড়বড় সমস্ত থাকে। আমরা নিষ্ঠার কলগতি উপস্থাপন করে বই। এইখানেই বোধ হয় আমাদের ব্যর্থতা।

ঐতিহ্যের মধ্যে আমাদের একটা কাল-ই বাবা পড়ে আছে। সেখানে বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আছে কেবল অতীত। বর্তমান আর ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রেরণা আনে। এ-কাল দুটোকে আমরা বর্জন করেছি, কারণ লজ্জাকে নির্দেশ করে আমরা কাজ করতে পারিনি। দুহুর্ভেদে মাহুদ আমরা। দুহুর্ভেদে ধরতে-না-ধরতেই পে এতিয়ে যায়। অতএব

নিছনের কালের মিকে আমরা তাকিয়ে থাকি। চিত্তাকর্ষকের এ বৈশিষ্ট্য দুগুণের বাস্তবতাই অসম্ভব বুলিয়েছে। দুগ-টা ইজিনের। সুইচ-টা টিপবার সঙ্গে সঙ্গে সে চলল, সুইচ-টা নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়; আগে-নিছনে গতি বা জীবনের চিহ্নও থাকে না। আমাদের জীবনটাও ইজিনের আদর্শে। কাজ আমরা খুব করি, কিন্তু জীবনের লক্ষণ নেই। আমাদের পেশীতে সক্রিয়তা আছে, মন-টা ঘণ্টাইক-দেয় খাঁড়ার কায়াগারে অসাড় হয়ে পড়ে।

শিক্ষার প্রসঙ্গেও আমাদের এই মনোভাব। শিক্ষা যেবার সুবিধের ভিত্তি শিক্ষায়তন। তাহাই বাব-কর্ম করে একটা ইন্সল বাড়ী করা দরকার। ইন্সল বাড়ী করা দরকার, কারণ ছেলেরা এসে

বণবে। কিন্তু কতকগুলি বা বণবে! বাড়ী ছোঁ
যাবেই। অতএব পাঠশালা—পাঠশালা। আমাদের
বেশের অলম্যটিতে যদি পোড়া-মাটি সাজানো যায়,
তবে তার আবু অখখামার সঙ্গে পাল্লা দেয়। অতএব
কোনক্রমে দালান তৈরী চলে ও বিবরে আর কেউ
কোন দিন তাবে না। ইদুল বাড়ী বাদব চক্রবর্তীর
অঙ্কের বইয়ের সঙ্গে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মফলন
পুস্তকের সঙ্গে যুক্ত নয়। ইদুল বাড়ীটা কর্তৃপক্ষের
ফুই-ফোড় সম্মান।

বাংলাদেশের শিক্ষায়তন দেখে সমাজের
মাহুদের এই অসামাজিক শূন্য-বৃত্তের ব্যক্তিগতবর্গী
মাহুদের কথা মনে পড়ল।

(২)

পশ্চিমবঙ্গের এক মফঃস্বলের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত
হলাম। নিমন্ত্রণ বন্ধা করতে গিয়ে বিদ্যুতের ক্ষুদ্র
উজ্জ্বলিত প্রাঙ্গণ করা উচিত; কিন্তু সংসারের
অনেক ধর্মই মন সব সময় মানে না।

একটা নম সামনে দিগে বসে চলেছে। ইদুলটা
কিন্তু ঘোমটা টেনে নদের দিকে মূগ করে। ইদুলের
চেহারাও সমুখভাগ নদটির দিকে বটে, কিন্তু ইদুলের
কাণকর্ম সবই পিছন দিকে। সামনে আসবারই
যো নেই; ওটা একটা পুত্র মাত্র। ইদুল বাড়ীর
ছাদ উল্টে-পড়া দোণারা টেবিলের মতো। বরফলো
জাঙা, মড়কড়ে। চূণের অস্তাবে ঘোমালের ইট
পাঁজর ঘের করে প্রতিবেশী মদের জাটিখানার
সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ইটগুলো ঘোষ
নয়, কাজেই গলে-গলে নরম হয়ে গলে যাওয়ার
যোগ্য। পিছনে ইদুলের সম্পাদকের তৈরী ছবি-
ঘর। ইদুলের ঘরের সঙ্গে একদিকে পর্দা-জাঙির
প্রধান শিক্ষকের ঘর, অন্য দিকে ছাত্র আর 'বাঘাবর'
শিক্ষকের ছাত্রাবাস। রীতিগত এক পাঠশালা
একটি আছে, তবে প্রয়োজন ছিল না, কারণ পল্লী-
রীতি প্রাধান্য। ঘোমালে চূণকাম নেই বলে
ছবিবে হুয়েছে, ছেলেরা আগড়ম-বাগড়ম লিখে

পারে না। ইদুলটা 'ক' শ্রেণীরূপে হতে চলেছে।
প্রতি বছরই একজন করে শিক্ষক এখান থেকে
কলকাতা বি-টি পড়তে যান। কর্তৃপক্ষেরা ইদুল
সবচেয়ে সন্দাহিত। এখানকার ছেলেরা 'মিষ্টি'
করে না, তবু ফেল করে—কারণ মদের জাটিখানা,
ছবিঘর, চায়ের কুঁড়েঘর, গ্রামোফোনের দোকান,
কাঠের গোলা, ইট্টমান, তারের মনকে টেনে নেয়।
এখানকার কাঠের ব্যবসা বিখ্যাত। ব্যবসায়ী
হুশচুর, টাকাও। পরকারের দিলেবমতো এখানকার
অধিবাসী অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু।

এখানকার ব্যবসায়ীরা ইদুল করেছে, কারণ
এতে স্থানের পরমার্থনা বৃদ্ধি পায়। এখানকার
অধিবাসীরা ইদুলে ছেলে পাঠায়, কারণ লেখাপড়া
নিখে কাঠের-গোলায় কুলিগিরি ছাড়তে চায়।
বস্ত্র কাঠের হলো, নূনের মতো এই-ই। এই
কম্পই শিক্ষায়তন সবচেয়ে বেঁটে পিছু তাবে না।

(৩)

খাস কলকাতার কথাই বলি।

বড় ইদুল। বাংলাদেশের সৎজনমানুষেরা এ
ইদুলের কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ-চক্রের পরিচালনাঃ
পাশাপাশি আরও বয়েকটা ইদুল আছে। এই
কর্তৃপক্ষ-চক্র বাংলা দেশের একচেটে শিক্ষাবিদ।
খুব আশা নিয়ে দোতলাতে উঠলাম। আলো নেই,
তানয়। হুন্দর ইটের গাঁপুনি। বহু তিগ্রীধারী
পকাশ টাকা থেকে একশ' টাকা নিয়ে এখানে কাজ
করে সমাজের মানবুদ্ধি করে চলেছেন। ইদুল-
বাড়ীর দোতলা 'টায়' বিয়েটারের ধরণে। চারিদিকে
ঘুরিয়ে ক্রাস, মাস্তানটা রসাতল। রেলিঙ থেকে
নীচের দিক তাকিয়ে মনে হল, ঠাণ্ডা 'শান্তি-
নিকেতন' নিয়ে অতিমাত্রায় চিংকার করেন, ঠাণ্ডা
উপযুক্ত মনের পরিচয়ই দিয়েছেন বটে। বাংলা
দেশের মেয়েরা আত্মহত্যা করে, কিন্তু ইদুলের
ছাত্রছাত্রীরা বড় ধার্মিক, তারা সবচেয়ে
অস্বাভাবিক বড় মুক্ত করে বেবেছে। কোন অস্তায়

তাঁদের স্মরণ করে না : নতুনা মাঝখানকার ঐ ফোকর দিয়ে তারা কেউ কেউ আশ্রয়ত্যাগ করতই।

উত্তর কলকাতার এক নামকর ইন্সুলে এলাম। একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত এগুটি মাত্র পকীর্ণ সিঁড়ি নিয়ে টঙ্কলঘর 'ভোজনালয়' অবস্থান করেছে। ছেলেদের গড়ে দাওয়া তর নেই, ফাল দিয়ে ঘেঁরা। বিরাঘের সমরশিককেয়া প্রধান শিককের হুঁস মতে পালা করে ছেলেদের নাহাণা ঘেন, বাঁতে কেউ ফাল ভেঙে সিঁড়ি দিয়ে না গড়ে যায়। আলো জ্বলে ঘরের মধ্যে পড়ানো হয়। বাতাসের অভাব নেই, কারণ বৈজ্ঞানিক পাখার বন্দোবস্ত আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শমতো নীচ-তলার বাইরের দিকে মসলা-পাতি আর ডাঙের ঢোকান।

পূর্ব-কলকাতার নাম করা ইন্সুলটির ব্যবস্থাটি বড় ভালো। চার পাশে হস্তশিল্পীদের বাসস্থান, ইন্সুলের দিকে মুগ করে। সোতলার উঠলে ঘরের তিত্তরকার সব বাপারাই দেখা যায়; অবশ্য ঐ সময় শু সব বাড়ীতে পর্দা টেনে দেওয়া থাকে। কিন্তু রেজিও গান, কলের গানের সুর, বিয়ের কলহর, জ্ঞান কণ্ঠার সমস্ত কানের পাশে টেঁচিয়ে কেটে গড়ে। বোধ হয়, এ ইন্সুলে শিকক মনোনিভব করবার সময় তাঁর পলা দেবে নেওয়া হয়।

(৪)

কলকাতা থাক। উত্তরঘরে বাই।

সেদিন উত্তরঘরের এক জেলা-সহরের ইন্সুলের সম্পাদক হস্তাক্ষর হয়ে এলেন।

—চাপার কি ?

—অনুক আইনজীবীর কাছে যেতে হবে।

—কেন ?

—আজ দুবছর ধরে শিক-অধিকারের সঙ্গে মনোবিবোধ চলছে। ইন্সুলের ছাত্রাবাসে কলেক করতে দিতে হবে। অথচ দেখুন তো, বরষ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্ক (কচি-কচি) ছেলেদের

। 'অধিকার' বলছেন, টঙ্কলের দালালটা কলেজের সম্পত্তি! কি পর্বনাশ!

তিনি বিখ্যাত আইনজীবীর নির্দেশ পত্র নিয়ে গেছেন নিশ্চয়। কিন্তু স্নোকেব প্রথমভাগ দুই নিয়ে 'মা কলেবু কদাচন'-টুকুই ফুটে উঠবে কলে আবার বাঁধনা। আঠার বায়ের মন যা অস্তিত্ব যুক্ত পেতে দিতে হবেই।

তালিকা আর বাড়াই না। সোয়াল-বর কলে বিশেষণও ছুড়ব না। কারণ, এ সবই পুরানো কথা। কিন্তু পুরানো কথা পুরানোই থাকবে কেন, সেই প্রশ্নই স্বভাবত আসে।

(৫)

এই সব শিকারতন দাবারপত-উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তির উৎসাহে নির্মিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তির সহরে সাজ পোতে।

উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তির ইংরেজকে দ্বন্দ্ব করবার কাজে আকস্মিকভাবে করেছিলেন। ভালো হোক মন্দ হোক তাঁদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তির সে আদর্শ হারিয়েছে। বর্তমান তোটের দৃশ্য। নির্বাচন আর বাচন এই দুপের বৈলিষ্ট্য, কর্ম নয়। এই অতাই যা আছে তাঁকেই বজার রাখা, কিংবা তাঁকেই নিষ্ঠা চাপড়ে দেওয়া, আঘাতের গীতি। বরীজ উৎসব থেকে কাটিক পুজো পর্যন্ত আমাদের এই মনোভাবই কাজ করছে।

তা ছাড়া আছে দুপের মণ্ডকা। মণ্ডকা শাকিক কাজ করা বহুতাত্ত্বিকতার অহমিকা। উন্নাদ উন্নদ হবে অহমিকা প্রকাশ করে। আমাদের সেই উন্নততাই ব্যাপক। আমরা স্টাটার্ড নিয়ে রাখা বাঘাই, মেনবোর্ণ থেকে প্রমাণ-পত্র পঞ্জের কচি, কিন্তু হনটা আমাদের ধাঁধা রাখ-কাটবার।

যেদের শিকার উন্নতি করতে হলে, শিকারতনের উন্নতি করতেই হবে। গ্রাম বা সহরের মণ্ডকার অস্ত্র ইন্সুল ঘর ঘেঁদন তেমন ভাবে করতে দেওয়া যেতে পারে না। 'টাকা' নেই কলে

দেশের ছেলেরা পড়াশুনা করতে পারবে না ?—
অভুতি নাকি কান্না উপেক্ষা করতে হবে।

দেশে টাকা আছে। লরেটো-হাউসে কাদের
যেহেতু মোটাবে করে যায় ? কিণ্ডারগার্টেনে ছেলে
পড়াবার জন্যে কাগজ ভীড় বেশী করে ? এক একটি
ছেলের পেছনে কত টাকা গুণা খরচ করেন ?
সাহেবের ইচ্ছা ভালো, কিন্তু কেন ভালো হল ?
পরিবেশ সৃষ্টিই তাগের মূল লক্ষ্য। কলকাতার
যে কোন পল্লীস্থ সকলে একযোগে চেষ্টা করলে
অমনি বহু ইচ্ছা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। কেন
করা হয় না ?

এ কেবল ঐহানীত। জনগণও যেমন দাখী,

সরকারও তেমনি। এত লোকজন নিয়ে শিক্ষা
অধিকার, অথচ তাঁরা কেবল খাতাপত্রে টাকার
লেনদেন করেই কার্য সমাপন করেন। এ শিক্ষা-
বৃত্তি আর মানসজ্ঞ ব্যাবস্থা বহু রকমে কতকগুলো
সরকার পরিচালিত আদর্শ ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা করুন না
কেন ? এক হাতে যেমন খাদ্যাদ ইচ্ছা চাঙতে হবে,
আর এক হাতে তেমনি ভাল ইচ্ছা গড়তেও হবে।

অনেক কান্নাকাটি হয়েছে, অনেক মুক্তিযুদ্ধও
ব্যবহার করা হয়েছে। দার্শনিকদের, চিকিৎসিক
নরহরিদের মুখ চাপা দিয়ে কান্ডিডের মতো
আমাদের দলবার দিন এসেছে, 'চেন চহেছে, এখন
এস, একটু কাজ কর দেখি।'

প্রেটোর শিক্ষানীতি

[প্রীজীবেন বে]

যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়,
একথা সত্য। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে
যেখানে নূতন চিন্তা পুরাতন মাটির নূতন কলস।
আদি সৃষ্টিতে নূতন সারি দিয়া তাহার উৎপাদিক
শক্তি বাড়ান যায়, উন্নততর বীজ বপনে উন্নততর
কলস কলান যায়, কিন্তু সৃষ্টির স্বকীয়তা অস্বীকার
করা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রেও এমন কতকগুলি
তাবধার আছে যেগুলিকে আমরা সনাতন বলিতে
পারি। কেন বলি, তাহা আর সৃষ্টি দিয়া বুঝাইতে
হইবে না। কারণ সেগুলি এমনই স্পষ্ট যে সৃষ্টি
নিষ্পন্নোক্ত। যেমন খরা পাক, চরিত্র গঠন। শিক্ষা
যে শেষ পর্যন্ত চরিত্র গঠনে সহায়তা করিবে, একথা
কে অস্বীকার করিবে ? আবার চরিত্র জিনিগটাও
নিরন্তর পরিবর্তনশীল কোন তাবসমষ্টি নয়। উন্নত
চরিত্র বলিতে আমরা আশা যাঁহা বৃষ্টি, হাজার বৎসর
পূর্বে লোকে তাহাই বৃষ্টি। স্বতরাং আমরা

যেহেতুছি, শিক্ষার যেমন একটা পরিবর্তনশীল দিক
আছে, তেমনি একটি অপরিবর্তনীয় দিকও আছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যখন আমরা গ্রীক চিন্তাবিদদের
কথা ভাবি, তখন শিক্ষার এই শাস্ত দিকটাই
আমাদের বেশী মনে আসে। গ্রীক চিন্তাবিদ্যার
বৈশিষ্ট্য ইহার মৌলিকতা ও বিশ্বকের দার্বণতানীতি।
গ্রীক চিন্তা যে দার্বণতানীতি, তাহার একটি বিশেষ
কাণ্ড আছে। মানব সম্বন্ধে (Human
relations) গোড়ার কথা লইয়া এমন বিস্তারিত
ও সুদৃষ্টান্তসম্বলিত আলোচনা গ্রীক পণ্ডিতগণ
করিয়াছেন যে, কোন দেশেই চিকিৎসিক মানব
তাহার দেশ, জাতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার
সমাধানের জন্যে গ্রীক চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া
পারেন নাই। শুধু আদর্শ অথবা তত্ত্বের দিক দিয়া
নহে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়েও গ্রীক শিক্ষাবিদগণ
সমাগ ছিলেন। দিপাবলিক নামক গ্রন্থে প্রেটো

শিক্ষার বিভিন্ন দিক এমন হইয়াছে আলোচনা করিয়াছেন যে, এ দু'গুণে ও তাঁহার মতামত আধুনিক শিক্ষাবিশেষ মতামতের তুলনামূল্যে তাই বটেই, এবং অনেকাংশে আরও অগ্রগামী। তেমনি এন্টিস্টটলের পলিটেকনিক নামক গ্রন্থে এ দু'গুণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়।

আমরা এখানে আপাততঃ গ্রেটোর শিক্ষানবস্তীর মতামতগুলিই মোটামুটি আলোচনা করিবে। গ্রেটো তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনার দুইটি মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। একটি মনোভূমি, অপরটি বাহ্যিক—অর্থাৎ এই দুইটি পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীকে একই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিবে—উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি।

গ্রেটোর কথাঃ—I believe that the teachers of both have in view chiefly the improvement of the soul.

মনোভূমি অর্থে গ্রেটো কেবল গমন করেন নাই, মানব জগতের বাহ্যিক কিছু স্বন্দর ও বঙ্গীয়, মন ও চিত্তকে বাহ্যিক স্পর্শ করে, যাঁহা অন্তঃকরণে কোমল বৃত্তিগুলিকে জাগাইতে তোলে, তাহাকেই তিনি মনোভূমি বলিয়া ধরিয়াছেন। এই অর্থে গমনও মনোভূমি পথ্য-ভুক্ত। তিনি বলিতেছেন, “না এবং খাজী যেমন তাঁহারের নিজেদের হাতে আলো করিয়া বিভিন্ন ভূমিতে শিল্পের মত গঠন করেন, তেমনি তাঁহারা শিল্পের নিকট এমন গম্বুজ বলিবেন যাঁহাতে তাঁহারের মনও গড়িয়া ওঠে।”

শিল্পের জীবন গঠনে পরিবেশের প্রভাব যে বিষয়কর, তাহা গ্রেটোর পূর্বে আর কোন ইউরোপীয় চিন্তানায়ক দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। জীবনপথে পর্যাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যের পরিবেশে শিল্প বাহ্যিক পায়, বিভিন্ন টেম্পের মাধ্যমে তাহা সে নিজ অন্তরে গ্রহণ করিয়া লয়। এ কাজটি শিল্পের অন্যান্যতেই অগ্রসর হয়। মনস্তত্ত্বের ভাষায় ইহাকে বলা চলে—Unconscious assimilation. শিল্পের

অজ্ঞাতে পরিবেশের বিভিন্ন অস্তিত্বতা যে তাহার মনকে গঠন করে সে মনকে গ্রেটো বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন বলিয়াই মনোভূমির উপর এত গুরুত্ব দিয়াছেন—মনোভূমি অস্তিত্বকে স্বন্দর করিয়া দেহকে স্বন্দর করিবে, জগতকে বিকশিত করিয়া জগতের আদর্শ দেহকেও লাবণ্যমণ্ডিত করিবে, ইহাই ছিল গ্রেটোর বক্তব্য।

দেহগঠন বিষয়ে যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রেটো-করিয়াছেন, তাহা পেনাদারী বা পেনাদারদের ব্যাখ্যায় নহে। বাহ্যিকতার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মানিয়া চলা, কয়েকটি সহজ ব্যাখ্যায় অঙ্গশীলন করা, দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি অঙ্গশীলন ইত্যাদি। মাধ্যমকে কেবলমাত্র মনোভূমির দিকে মনোযোগ দেওয়া চলিবে না, কারণ তাহাতে মন শক্তি হ্রাস পায়। The whole life is not to be given up to gymnastics, for any one who does nothing else ends by becoming uncivilised.

মহাশয়ের সে উক্ত আদর্শ গ্রেটো তাঁহার শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন তাহা এই বিশ্ব-বিশ্বের বাস্তব চিন্তা ও কর্মের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাউবে না, শিল্পকে ধীরে ধীরে ভাব-বিশ্বের দিকে পরিচালিত করিবে। বিজ্ঞা জাগতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন সমস্তার সমাধানে বাহ্যিক সহায়তা তো করিবেই, উপরন্তু তাহা আত্ম-উপলব্ধির গ্রহণ লোকেও লইতে সাহায্য করিবে, ইহাই গ্রেটোর শিক্ষানীতির মূল ভাব। আগলে আত্মোন্নতিই গ্রেটোর মতে শিক্ষার শেষ লক্ষ্য।

আত্ম-বিস্তার-রূপ উচ্চতম জ্ঞান লাভ যেমন একদিকে সকলের সাধারণতঃ নহে, তেমনি অপর দিকে ইহা লাভ করিতে হইলে কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। অধ্যয়ন, ব্যায়াম, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনোভূমি ইত্যাদির অঙ্গশীলন, অধ্যয়ন ও উপলব্ধির ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি

পর্যায়তম গ্রন্থের সাধারণ অর্থন করে। প্রথমেই
আমি অবস্থা অগতঃ বহুস্তর নিগূঢ় তথ্য চায়ে
অপরিসৃত বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করা হয় না।
বিভিন্ন শাস্ত্র সূত্রভাবে অহীনলন করিলে বুদ্ধির
যে তীক্ষ্ণতা ও শৈথিল্য দেখা দেয়, তাহাই পরমতত্ত্বের
অহীনলনের উপযোগী। Through mathe-
matics to metaphysics, ইহাই সংক্ষেপে
প্লেটোর উচ্চতম শিক্ষার পরিকল্পনা।

যদিও প্লেটো শিক্ষার শেষ তরে আত্মোপলব্ধির
কথা ঘোষণা করিয়াছেন, তথাপি তিনি কখনও
নৈকর্যের সমর্থন করেন নাই। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই
হইবে বিশেষভাবে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন। শুধু
তাহাই নহে, শিক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্যই হইল, সমাজ
তথা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বচন করা। অবশ্য সকলকেই এট
কাজে জ্ঞাত হইবে না। বাহাদিসকে যোগ্য মনে
করা হইবে, তাহাই বিশেষ শিক্ষার মাধ্যমে
বিশেষ কাজের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিবে।
ইহাই Guardians অথবা Magistrates.

একথা ঠিক, প্লেটো তাঁহার শিক্ষা পরিকল্পনা
সকলের জন্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।
সমাজকে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া ছিলেন—

উৎপাদক, নৈমিত্তিক এবং শাসক। ইহার মধ্যে
রাষ্ট্রের সমস্ত শ্রেণীকে দুই শ্রেণীর শিক্ষা দরকার ;
রাষ্ট্রের সকল ইচ্ছার বুদ্ধি বিবেচনা দাফন ও
বৈধের উপর বিশেষ নির্ভর করে। উৎপাদক শ্রেণীর
শিক্ষার কথা প্লেটোর চিন্তাধারায় পাওয়া যায় না,
কারণ প্লেটো তাঁহার মূলধর্মকে কাটাতে পারেন
নাই। এ মূগে মনস্তত্ত্বের আবহাওয়ার মাহাত্ম্য হইয়া
আমরা যাই। তাহা প্লেটো না ভাবিলেও
কোন্দের কারণ নাই, কারণ, আমরা প্রাচীন গ্রীক
মূগে এখন বসিয়া নাই।

তথাপি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্লেটোর মূলনীতিগুলি
আজও শিক্ষাবিশ্বের বিশেষ প্রিয়। কাহারও
কাহারও মতে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্যের কথা ভাবিলে
প্লেটো হইতে আমরা আরও অগ্রসর হই নাই।
প্লেটোর শিক্ষানীতি যে অনন্তের সুরে বাধা, তাহার
সাধনতা পরিবর্তনশীল মূগের পরিবর্তনশীল দাবী
ঘিটাইয়াও অক্ষর রহিয়া যায়। প্লেটো কখনও
সেকালের গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রের দাবী দাওয়া
অস্বীকার করেন নাই। তবুও তাঁহার শিক্ষা-
নীতি প্রণয়নোপায়, এখানেই প্লেটোর প্রতিভার
বৈশিষ্ট্য।

বুনিয়াদী শিক্ষায় চারু ও কারু শিল্প

[প্রগৌরী সেন]

বুনিয়াদী মূলগুলির উদ্দেশ্য অপরিসৃত ও অপর-
িসৃত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদিগকে সমাজ ও জাতিগত
উত্তরাধিকার লব্ধে অবস্থিত করা, এবং বাহিত
উপায়ে এই উত্তরাধিকারের মাধ্যমেই শিশুকে
এককভাবে এবং সামাজিক জীব হিসাবে গড়ে
তোলার। শিশুর জীবনকে পূর্ণ মর্যাদা দান

করতে হলে তার যেটুকু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য,
তা কাকে কড়ায় গণ্ডায় বন্ধিয়ে দিতে হবে। কিন্তু
কি করে সে প্রাপ্য বন্ধিয়ে দেয়া যাবে? হয়তো
অনেক উপায় আছে; কিন্তু মানসিক বিবেচনা করে
দেখা যায়, চারু ও কারু শিল্পের মাধ্যমেই শিশুর
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিকাশ বিশেষ করে সম্ভব।

ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিকাশের উদ্দেশ্যে কিংবা একক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণও যদি করা হয়, তাহলেও শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, চন্দ্রাঙ্গণা খেলাধুলা, অভিনয় ইত্যাদি শিল্পকে তার অন্তর্ভুক্তি অগ্রসর হতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এখন চাক শিল্পের সাহায্যে শিল্পের উত্তর বর্ধন বিকাশ কি করে সম্ভব তা বিশ্লেষণ করে দেখা চলতে পারে। সুবিধার মাত্র সময় বিকাশকে গুটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে।

ব্যক্তিগত বিকাশের রূপ, ও শিল্পক কি পরিমাণে বিকাশে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে সর্বাঙ্গে আলোচনা করি।

ব্যক্তি বলতে একটি নির্দিষ্ট লোককে বোঝায়, এবং বিচ্ছিন্নভাবেই তাকে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। ব্যক্তি হোল একান্ত তাইই স্বয়ং তার অন্তর্ভুক্তি, তা সে যে কোন প্রকৃতিই হোক না কেন। কিন্তু কর্মের শক্তি হচ্ছে প্রকাশ, অতএব কর্মের সাহায্যেই ব্যক্তির স্বয়ং প্রকাশিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্যক্তির বুদ্ধি নিভর করে তিনটি জিনিষের উপর—প্রকৃতি, পোষণ ও স্বাধীন ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ। বংশাঙ্কুরে শিল্প পাশ্চাত্য, বুদ্ধি, চরিত্র। আবেষ্টনীর প্রভাবে এবং পোষণের ফলে শিল্প বংশাঙ্কুরকে বৃদ্ধি করে বা প্রতিহত করে। এমনিভাবে বংশাঙ্কুর ও শিল্প আবেষ্টনী উভয়ে উভয়কে সাহায্য করে, শিল্প বুদ্ধির সহায়তা করে। কিন্তু শিল্প ব্যক্তির প্রকাশে আরও একটি ভাবনাগার প্রত্যয় কম নয়, বরং সুদৃশ্যমণ্ডলী বলেই মনে হয়।

শিল্প অপরিণত বুদ্ধিমত্তার ফলেও তার বেছে নেবার ক্ষমতা কিছু হয়েছে, ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রত্যয় তার কাছে কোন ক্রমেই কম নয়। স্বীয় অন্তর্গত গুণাবলীর মধ্যে যেগুলি তার মনকে প্রভাবিত করে, সেগুলি সে সম্বন্ধে তক্ষা করতে পেরে, আর সেখানে আবেষ্টনীর মধ্যে স্থিতির

অবস্থাকে গ্রহণ করতে বা অগ্রসর করতে। অতএব সে তার নিজের চরিত্রের স্রষ্টা হয়ে থাকে। তা যদি হয়, তাহলে বৃদ্ধিতে হবে শিল্প কাজ করে তার জীবনামর্শ অগ্রসর, এবং না শিল্পক না শিল্প না অভিত্যক কেউই পূর্বাঙ্কে জানতে পারেন না শিল্প জীবনের রূপ কি হবে। এই যদি শিল্পের প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহলে শিল্পের সেখানে কাজ হোল শিল্প স্বীয় শক্তিকে বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করা, আর কিছু নয়।

শিল্প যদি কোন কাজ বা খেলার মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করে, তাহলে আমরা কিভাবে তার ব্যক্তির বুদ্ধির সহায়তা করতে পারি? খেলার মধ্যে সে নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে, এবং তারই মধ্যে তার কাছে যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা বেছে নেয়। ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা ব্যক্তিগত খেলা করার মত। ব্যক্তিগত খেলা করে, কিন্তু তার ঐ খেলার মধ্যেই শিল্পের ধরার শিল্প আপন আপন চরিত্র বাহ! মানবশক্তি ও তার খেলা ও কাজের মধ্যেই নিজেকে জীবনের রূপ প্রকাশ করে তোলে। শিল্পের কাজ করতে দিলে দেখতে পাওয়া যায়, শিল্প পছন্দমত মালমশলায় সাহায্যে নিজের মত করে জিনিস গড়ে তোলে; পছন্দ আনন্দে সে উৎসাহ হয় এবং পরিণেবে তৈরী জিনিসকে চেঁচো আবার নতুন করে জিনিস তৈরী করে। বেশির ভাগ শিল্প প্রকাশ করে। ফলের মধ্যে অল্প কয়েকজন হস্ত কর্মের অন্তর্নিহিত ভাবনার মত পরিচিত হতে চাইবে, এবং তাও ত্যাগ চাইবে কর্মকে বর্ধা অগ্রসর করেই। শিল্পের ভাবনাগড়া, এ বেশ তার কাছে খেলা। কিন্তু খেলা ফলেও এই ভাবনাগড়ার মধ্যে একটা ছন্দ বর্তমানে রয়েছে। এই ভাবনাগড়ার মধ্যে যিহে শিল্পের নিজেদের জীবনকে তৈরী করে। যে উত্তরাধিকার ভাবে প্রাপ্য, সেই উত্তরাধিকারকে আংশিকভাবে

তাঁরা গ্রহণ করে যাত্রা। তারা তাদের আবেষ্টনী হতে বহু বেছে নেয়, কর্ম বেছে নেয়। কতকগুলি সহজাত প্রকৃতির অঙ্গীকরণ হয়, এবং তারা কর্মকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করে; তাহলেও এগুলিই সমগ্র কর্মের মধ্যে বড় কথা নয়। জিনিস তৈরী করার মধ্যে সে ভবিষ্যৎ কর্মস্বার চাতছানি অঙ্কিত করে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে নৃতন ছাঁচে জিনিসগুলি মনোমত করে তৈরী করতে চেষ্টা করে। এরকম ছোটখাট কাজের মধ্যে দ্বিগুণে শক্তির আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, এবং সে নিজের তৈরী জিনিস সমালোচকের দৃষ্টিতে বিতীক্ষণ করে। কলে তাকে বসন্তের কাছে সাচাযাগ্রাণী হতে হয় এবং তাদের সাহায্যে নিজের কাজ বা অতীত বস্তুকে আরও সুন্দর রূপ দিতে চায়।

শিশুর মন যখন এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন শিককের কাজ হচ্ছে, শিশুকে প্রয়োজনমত শিল্পকলায় পাত্রণী করতে চেষ্টা করা। কিন্তু শিল্পে কুশলী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে না। শিল্পের মাধ্যমে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা পাতে হয়, সে বিষয়েও অবহিত হতে হবে।

নানা শিল্প ও সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে শিশুর কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, এবং বুদ্ধিশক্তিও বিকাশ লাভ করে। Prof. Cizek বলেন, "নানা ধরনের শিল্পকাজ ও কলাশিল্প শিশুর মনে উৎসাহের ইচ্ছা সৃষ্টি করে, এবং বুদ্ধিজনিত নৈপুণ্য প্রকাশে সাহায্য করে। শিল্পকলা অহসরণে প্রয়োজন হয় নক্ষি-সামগ্রী, মনন ও স্বাধীন মনোভাব, এবং এই কাজ চরিত্রগঠনে ও জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অহসরণে ক্ষেপ্ত্র সাহায্য করে।"

বস্তুত: যে কর্মের মধ্যে সৃজনী শক্তি প্রকাশ পায়, সেই কর্ম শিশুর ব্যক্তিকে ছুটিয়ে তুলে তার জীবনকে লক্ষ্যের পথে নিয়ে ধাবে, এতে আর বিচিহ্ন কি? কর্মের সঙ্গে তাদের সংযোগ দে,

অপরিণত ও অপরিণত বুদ্ধি পরিণত হয়, জীবন একটি গঠনমূলক কাজের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে আসে।

যে সময় বিদ্যালয়ে নানা একম সৃজনাত্মক কর্মের ও চাকরলা শিল্পের ব্যবস্থা আছে, সেখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সৃজনাত্মক কর্ম শিশুকে কিতাবে গড়ে তোলে। সঙ্গীতশিক্ষার মধ্যে গেছে যে শিশু সঙ্গীত শিল্পে সঙ্গীত হতে শুধু আনন্দ আহরণই করতে না, সঙ্গীত তাকে কোন বিষয়ে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করতে ও পরিচয়-জনিত কাজ করতেও অহুপ্রাণিত করেছে। হুন্সারব্রী শিক্ষারও দেখা গেছে অহুতরকম ফল—যে বালিকাকে বিশেষভাবে আশ্বিনশ্রুতন আশ্বিনশ্রুতিক দেখা গেছে সে ঐচ্ছন শিকার ফলে আশ্বিনশ্রুতন ভাব হতে মুক্তি পেয়েছে। যে শিশু ছিল বাচনশীল সে কুক্ষীভাব অহুপ্রন করেছে, স্বাধীন গোপনা কমে গিয়ে তার আশ্বিনশ্রুতন কমেছে, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষার ফলে শিশু বেছে ও মনে একটা বৈধ আনন্দনে সাহায্য করেছে। দরচেয়ে বড় কথা এই যে, ঐ বিষয়েই শুধু শিশু তার উৎকর্ষের পরিচয় দেয়নি, প্রেরণ অহুপ্রাণ কাজেও সে সম্পূর্ণ নৃতন জীবনের আভাস দিয়েছে।

চাকরলা অহুপ্ররণেও একই ফল দেখা গেছে। অনেক শিশুকে দেখা যায় যে, প্রেরণ কাজে আগ্রহশীল নয়, সকলের অবাধা, কোন কাজেই মন বসাতে পারে না, অথচ কিছুদিনের মধ্যেই সে চাকরলা শিল্পে এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে তার জীবন একেবারে সেল বহলে। সে মনঃসংযোগ করতে শিখল, তার ব্যবহার হল সৃজনশ্রাণী, তার জীবন হল উন্নত।

অহিনয়ের ক্ষেত্রেও অহুপ্ররণ ফল পাওয়া গেছে। একটি মেয়ের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। মেয়েটি ব্যক্ত অহুপ্রাণ অপরিচ্ছন্ন হয়ে, বিদ্যালয়ে সকলকে আলাতন করে যাবত। দল বহুপ্র বহুপ্র সময় সে প্রথম অহিনয় করতে হুযোগ পায়, কিন্তু

যে পরিচয় সে অভিনয়ে দিল, তাতে তার জীবনের রূপ মেল খললে, সে ক্রমশঃ জীবনকে উন্নত করে তুলল।

বেলাধুলায় কথা সবচেয়ে বিশেষ আলোচনা নিম্নরোজন। সমগ্র পৃথিবীতে এর প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বেলাধুলায় মানুষের নকীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হই, শিশু প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

নানা শিল্প ও কলায় ব্যবসায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যে সুষ্ঠু হয় সে কথা আলোচনা করা গেল। কিন্তু নানারূপ কর্মের মাধ্যমে সমষ্টিগত জীবনও যে উন্নত হয়, সার্থকতা লাভ করে, সে কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা প্রত্যেকে সামাজিক জীব, মানুষ চায় যে, সে য কবে বা কলে তার শুধু ব্যক্তিগত মূল্যই থাকবে না, তার সামাজিক মূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। এই সামাজিক জীবনের মূল গোণার? মূল হচ্ছে সকলের একত্র হয়ে কাজ করার মধ্যে। সকলেই যে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে তা নয়, কিন্তু সমাজজীবনের নিষ্ক্রিয়ভাবে অঙ্গসম্পাদনেরও প্রয়োজন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে নকীত সংগঠনে পাঠক সক্রিয়, কিন্তু তার সামাজিক অঙ্গসম্পাদন থাকবেই না, যদি তার স্রোতার নিষ্ক্রিয়ভাবে তার সহযোগিতা না করে। তাহলেই দেখা যাবে কয়েকজন লোকের সমষ্টিই সমাজ নয়, সমাজ প্রতিষ্ঠিত বহুলোকের সহযোগিতার ভিত্তিতে। সমাজ গড়ে কি ভাবে? যে যে লোকের মনোবৃত্তি, আদর্শ ও কচিবোধ একই রকমের, সেই লোকদের নিয়েই সমাজের সৃষ্টি। শিশুর মধ্যেও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ প্রায় একই ভাবে বর্তমান।

আমরা এখানে দেখতে চেষ্টা করব, প্রথমে কি করে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিল্পকাজ ও চাকরলা-

শিল্প শিল্পের মধ্যে সহযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার, এবং দ্বিতীয়ত ঐক্যভাবে আহৃত অভিজ্ঞতার ফলে শিশুরা কি করে জাতিগত আদর্শ ও নীতিকে জীবনে গ্রহণ করে থাকে।

প্রথমে নৃত্যের কথাই ধরা যাক। সমগ্র নৃত্যের মধ্যে একটা একত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়, মনে হয়, যেন যারা নাচেছে সকলে একই তালে, একই লয়ে চলেছে, একই ভাবে বিস্তার হয়ে আছে। যে শিশু সমগ্র শ্রেণীর সাথে নৃত্য করছে, সে নৃত্যের মধ্যে সমগ্র শ্রেণীর সাথে তালে বেধে চলতে চেষ্টা করছে, এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যে তার চারিত্রিক উন্নতি এবং ইচ্ছাশক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ ধরে মেওয়া যেতে পারে। সমবেত নকীত একটা বিশেষ সুখ লাভ তালমেনে চলে, এই অবস্থায় যে সমবেত নকীতে যোগ দেয়, তাকে মলের সাথে চলতে হয়, নিজেকে মলের প্রয়োজনে বিলিয়ে দিতে হয়।

দলীয় বেলা বার্ষিক সহযোগিতার শিক্ষাক্রম, এবং ও থেকে যে আনন্দও প্রচুর পাওয়া যায়, তাও সকলেই জানেন। কিন্তু তার যে একটা নীতিগত মূল্যও আছে, সে কথা সকলে অঙ্গবোধন করতে পারেন না। মলের কাগজে বার্ষিকাগ করতে দেখা শিশুর সচেতন মনে দান্য বেধে ওঠে।

নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই। অভিনয় সম্পর্কে বলা যায় যে অভিনয়ে সহযোগিতা শিক্ষাধানে বিশেষ সহায়ক। একটি শ্রেণীতে নাটক অভিনয় সম্পর্কে যখন বিভিন্ন চরিত্রের অন্ত শিল্পের নির্বাচন করা হয়, তখন দেখা যায় যে শিশুরা নাটক অভিনয় থেকে যাদ বিতে হয়, কিংবা যাদ অভিনয়ে অপেক্ষাকৃত পটু তাদেরও দামাত কৃষিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ও অভিনয় না করতে গেলেও সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব। যাদ অভিনয় করবে না, তাদ অভিনয় সংক্রান্ত নানা কাজে—যাদ পোষাক তৈরী, স্টেজ তৈরী ইত্যাদি সমবেত প্রচেষ্টায়—অভিনয়কে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করবে। শিল্পক সেই শিল্পের

বুঝিয়ে দেবেন যে অভিনয় বাবা করবে তাদের অপেক্ষা ভাড়াও কোন অংশেই কম নয়। প্রথম অবস্থায় একথা বুঝিয়ে দিলে পরে আর বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। শিশুরা আপনা আপনি সহযোগী মনোভাব নিয়ে কাজগুলো করে ফেলে।

যদিও প্রথমে খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না, তবু বলা যেতে পারে যে কলাশিল্প ও শিল্পকাণ্ডের মারফৎ শিশুদের মধ্যে সহযোগিতা প্রবৃত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যালয়ের কোন উৎসবে বিদ্যালয়ের সকল শিশুরা একই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়ে কাজ করে—কেউ 'ফ্রিজ' তৈরী করে, কেউ কেউ শ্রেণীকক্ষ সাজায়, কেউ নৃত্য শিল্পকাণ্ডের পরিচর প্রদান করে সমগ্র উৎসবটিকে সুন্দর করে তোলে। সমবেত প্রচেষ্টায় শিশুরা বীর স্বার্থ কুলে গিয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। শিশুর জীবনের সময় কাজে এই স্বার্থহীনতা প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে।

সংক্ষেপে যে কাজগুলির কথা বলা হোল সেগুলো শুধু শিশুদের মধ্যে সহযোগিতামূলক অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি করায় না, এ অভিজ্ঞতাকে তারা জীবন দিয়ে উপভোগ করে। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা তারা বাড়ীতে গিয়ে কাজে লাগাবে। শিশুদের

শিক্ষামাত্রাও শিশুদের কাণ্ড ও মনোবৃত্তি মধ্যে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া, শিশু যে শুধু সেই বিভাগের শাকা কানীনই চাক ও কাক শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা নয়। বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হবার পরও সেই প্রচাৰ শিশুর উপরে বর্তমান থাকে। তারাও আবার দুটি দিক আছে; যে যে শিল্পকলা শিশু শিক্ষা করেছে বেশি বয়সে সে অবলম্বন সময়ে সেগুলির অনুসরণ করে, আর যে সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তির সে অধিকারী হয়েছে, তা বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগে আসে।

শিশু বিদ্যালয়ে এনে নানারকম কাজ করে, কাকশিল্প, চাকশিল্প তাকে অভ্যস্ত করিতে হয়। শিশুর ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবন যে ঐসব শিক্ষার কতটা সংহত, সংবদ্ধ, উন্নত হবে ওঠে, তা আমরা দেখেছি। সমাজে বাস করিতে গেলে যে সব গুণ অর্জন করা প্রয়োজন, সে সমস্তই শিশু চাক ও কাকশিল্পের সাহায্যে অর্জন করে। চাক ও কাকশিল্পের তৌলনই সে শুধু আকর্ষ করে না, দৃঢ়নাস্তক কর্মের মারফৎ তার ব্যক্তির বিকাশ হয়, নানারকম সামাজিক গুণের সে অধিকারী হয়, আভিগত উত্তরাধিকার বা তার প্রাপ্য সে তা সহজেই কর্তব্য মারফৎ অর্জন করে।

আমাদের ইতিহাস-পাঠনা

[প্রিন্সিপাল মুখোপাধ্যায়]

ইতিহাস তার ভাব-গৌরব, ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-দুটীর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। কার্কেই এমন একটা ভাব-সমৃদ্ধ বিনয় পড়তে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে—ইতিহাসের বর্ষাৰ্থ বরূপ কি? কী এর পাঠন-বৈচিত্র্য? ছাত্রদের কাছে এর আবেদন কোন্ পথে সার্থকতা লাভ

করতে পারবে? প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করে না নিলে আমার আলোচা বিষয়ের নির্যো-নাশাটির অর্থ পরিষ্কার হবে না। তাই সূচিকা স্বরূপে দু একটি কথা বলে নেব।

ইতিহাসের মূল সংজ্ঞা—‘ইতিহাস মানব-সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের ঘটনা-পটী’। এ ঘটনা-পটীর নীচস প্রাণহীন কংকাল নিয়ে কিছ ইতিহাসের

কারবার নয়, বর্তমানের বাস্তবতা আর অতীতের অনতিবাস্তবতার অগূহ সমন্বয় দৃষ্ট হয়ে উঠেছে ইতিহাসের প্রাণ-স্বরূপ। মিস্ কনসিট, ডাঃ ওয়াটস বা ওয়েল্টনের মত ছাত্রদের মনে ইতিহাসের অত-নিহিত দেশকালাতীত সেই সার্বজনীন বাস্তবতা যদি না আগাতে পারি, যদি অতীত আর বর্তমানের সমন্বিত গতিচ্ছন্দে তাদের চলা-বলার ছন্দকে না পারি ছন্দায়িত করতে—তা হলে বার্ষিকই হবে ইতিহাস-পাঠনা। ছাত্রের সাথে বীকার করতে হয় যে, আমাদের অধিকাংশের ইতিহাস শিক্ষার ঐতিহাসিক আবেগনের বর্ষা পরিচয় অস্থায়ীভাবেই রয়ে গেছে। ইতিহাস আমরা পড়েছি, কিন্তু ইতিহাসোক্ত পাত্র-পাত্রী বা ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা-প্রবাহের সাথে একাত্ম হয়ে তার ভাব, রস বা রোমাঞ্চের অংশীদার হতে পারিনি, অধিক কি, আমাদের ইতিহাস-অধ্যাপনাত্তেও আজও সেই ভুলের, সেই মর্যাদ্বিক ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তির ঘটতে দেখছি—আমরা ইতিহাসের শিক্ষকেরা সেই অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছি। দেখা যাক, এক দিনের এ স্কুলের কোন প্রাধান্তিক আছে কি না।

আজও ছাত্রেরা ইতিহাস পড়ে—কিন্তু তার সাথে অধিকাংশেরই নব্বয় যোগ একাত্ত হয়ে উঠতে পারে নি। যে চরিত্রগুলির কংকাল তাদের সামনে তুলে বসে হয়, তারা অতীতের বিজ্ঞোহী সাক্ষীরূপে অদৃষ্ট রূপ নিয়ে শিশু মনের আকর্ষণ তীক্ষ্ণ সমাতে থাকে। কিন্তু তাদের বাণীহীন আবেগন নিফলতার বোঝায় তারগ্রস্ত হবে মাথা কুটতে থাকে অসব্ধ বেৎনায়। ইতিহাস ও শিশু-জীবনের মাঝে এই যে ব্যবধান—বৈচিত্র্যের সেতুঘাড়ে এ কঁাক পূরণ করার উদ্যোগ অব্যাহত হলো দেশ-বিদেশে। মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিদদের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হলো বৈচিত্র্য-সকারী সবস্তর গঠন-পদ্ধতি। লাল-তাম্র-ঘটনা কণ্টকিত ইতিহাসের প্রাণ-সত্তার মর্যম্পর্নী আকৃতি একদিন নবজন্মের পথে এক সার্বক অতিবাঞ্ছিত লাভ করল।

এই বিশ্বকর পাঠন-পদ্ধতির মতো নাটকের মাধ্যমে পড়ানো একটি।

নাটকের মাধ্যমে এই বাস্তব-ইতিহাসের তথ্যের কংকালে বৈচিত্র্য আর সবস্তর ছোঁয়াচ লাগল, নতুন প্রাণের সত্তাবনী ধারায় অতিথিকৃত হল ইতিহাস, শুধু শুধু মাঝে লাগল নব জীবনের অতর স্পর্শ। ইতিহাসের এই নবস্তর জয়যাত্রার প্রথম লগ্নি যাত্রার জীবন-নাট্যে। বর্ণপ্রহ সত্তাবনা-ময় এক নতুন দৃষ্ট বোধনা করেছে।

এতদিন ছাত্রেরা শুধু নীরব আগ্রহহীন শ্রোতার মত নির্বিকার ভাবে শুনত শিক্ষকের সুখোচ্ছায়িত অনর্গল ঘটনা-ব্যাখ্যান, দেখত হুদু অতীতের কোন মহাকবর থেকে উঠে আসা কংকালদের বিকল প্রকাশ, শুনত অনতিশ্রুত অতীতের শৌর্যবীর্যের কাহিনী। তাদের ছবির উত্তেজনার অধীত হয়ে উঠত না, নিরাপদ নিরাপদ বসে না উক শোণিত-বস্ত্র। নিঃশব্দ মেনের কথাই তারা শুনত ঠিক পঞ্চদশী শ্রোতার মত। হুদুদের সেই অজানা যাত্রার কংকালগুলো তাদের ছবিরে শুভখানি নাড়া দিতে পারেনি—ঘটটা পারল সেই প্রাণহীন কংকালদের নাটকের পাত্রপাত্রীরূপে প্রকাশের মধ্য থেকে। নাটকীয়রূপে মাধ্যমে তারা জানল যে ইতিহাসের কাহিনী পড়ে উঠেছে তাদেরই পূর্বতনদের জীবন ও দুঃখ্যাণী সাধনার কলে। ছাত্রের কথা, আমাদের ছেলেমা এ সব দেখত শুনত না—আজও ‘দেখে শোনে না।’ আজও বুদ্ধ, অশোক, শিবাজী, প্রতাপ আমাদের ছাত্রদের কাছে পরীকার V. V. Imp’ ট্রেড মার্কেড অতিথিকৃত কোন সার্বকতা বহন করে না—আজও তারা নিখেছে যে, শিবাজীর চরিত্র নয়, শালন-শৃংখলা জানতে হবে, প্রতাপের দেশপ্রেম নয়, আকবরের সমন্বিতা বেশি বরকারি, তারতের প্রথম বাণীমতা আন্দোলন নয়, সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি জানলেই হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকে, সেগুলি যেহেতু পরীকা-পাণে কাজে লাগবে

না, কাজেই পান কাটিয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ইতিহাসের মত একটি তথ্য-সমৃদ্ধ বিষয়ে এই যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, এর ফল মারাত্মক হতে বাধ্য হয়েছে। তাই, বিদেশীয় শাসন ও শোষণের ছেঁদহীন অসুস্থতিতেও স্বাধীন দেশপ্রেম বাতবের কৃষিতে রূপ নিতে পারেনি, ইতিহাস-শিল্পকের দেশপ্রেম আগানোর কোন শার্বক উদ্বেগ ছন্দে বহুদূর না থাকায় 'শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল'র বা ইংরাজের রাশি রাশি নির্ণাতনের দৃষ্টান্ত এড়িয়ে তাঁরা অপরের মূখে কাল খেয়েই কাট ছিলেন। ইতিহাস শিল্পের এক উদ্বেগ যদি দেশাস্থবোধের উদ্বোধন হয়, তা হলে বলতেই হয় যে, নাটকের মারকম একান্ত সহজসাধ্য হবেই। যে ভারতীয় বীর, ভারতীয় মহাসম্রাটের ছন্দ-টেরিষ্টা ও কর্মইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় মাহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাঁদেরই অংশে অভিনয় করে ছেলেবা মেয়েদের আবেগশীল অস্তরের সুগোপন অসুস্থতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটতে শিববে। নাট্যরূপের বাহুস্পর্শ তাদের দেহে ও মনে আনবে লোকোত্তর অসুস্থতির রোমাঞ্চ। এ ব্যাপারে নাটকের লক্ষ্য সম্বন্ধে শিল্পকের একটি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে চলে না। নাটকের কাব্যসম্পাদ ও অভিনয়ে উপযোগিতা এই দুটি দিক সম্বন্ধে অবদিত থাকতে হবে। তাবপর লক্ষ্যে ঐ বাস্তবিকতা ও সূর্য না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। ইতিহাস পাঠনার যে নাটকরূপ দেবার কথা বলা হয়, তার মূল রয়েছে ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে আশ্রয় করে ইতিহাসোক্ত পাত্র পাত্রীয় ব্যক্তি-চরিত্রের তথ্য ভাবমূর্ত্তির যে আলিখন, তাই ঐতিহাসিক নাটক। অবশ্য একথা ঠিক, শ্রেণী-পাঠনার ক্ষেত্রে নাটকের বর্ধার্ব নাট্যমূল্য বক্ষা করা কিংবা নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ মেনে চলা সম্ভব নয়।

এ নাট্যিকরূপ সম্বন্ধে একটি সাবধান বাণী

সব সময় স্মরণ রাখতে হয়, সব সময় এক লক্ষ্যে অসুস্থরণ করা উচিত নয়। আর নাট্যরূপ দেওয়ার পর বক্ষ্য কবায় সময় মনে রাখতে চবে যে, দেশাদায়ী পোষাক বা স্টেজের ঐক্যতো যেন আসল লক্ষ্যটি দৃষ্টি-ভ্রষ্ট না হয়।

পাঠ্যপুস্তকের কোন এক বিশেষ নাট্য-গুণ-সম্পন্ন অংশ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হবার পর ছাত্রদের সাহায্যে তথোপকথন ও 'স্বপ্নতোক্তি' রচনার চেষ্টা করাতে হবে। সব সময়ে যে নাট্য রূপ দিতে হবে তা নয়, প্রসিদ্ধ নাটকের অংশবিশেষও ছাত্রদের দ্বারা রূপায়িত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে 'মেসার পতন', 'হারাঠা মোগল', 'ছত্রপতি শিগাজী', 'নৈরিক পতাকা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মাহমুদান', 'মালমগীর', 'শিহাভক্ষোদা', 'মহারাজ নন্দমুন্দার' ইত্যাদি নাটকের নাম উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নাট্যো রূপায়নের পূর্বে শিল্পক বিভিন্ন পুস্তক হতে তথ্য বা উপাদান জোগাওয়ে, পরে সকলকেই নাটক রচনার উৎসাহ দেবেন। নাটকগুলির যে যে অংশ শিল্প বা বাল্যস্বীর্ণ বলে মনে হবে, সেই সেই অংশের সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করে প্রথমে শ্রেণীতেই ছাত্রদের সাহায্যে তাঁকে অভিনীত করাতে হবে, পরে বিভাগের কোন একটি উৎসব উপলক্ষ্যে সাদারূপের সম্মুখে নাটকটি বক্ষ্য করতে হবে। এই নাটক রচনাকালে সাহিত্যের সাথে ইতিহাসকে অসুস্থর প্রণালীর মাধ্যমে একান্ত করার সুবিধা থাকে। সে ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পকের সক্রিয় সহযোগিতার কাজটির সাক্ষ্য অনেকখানিই নিশ্চিত।

আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের ইতিহাসকে যেমন চলে সাজার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, তেমনি পাঠন লক্ষ্যেরও পরিবর্তন অপরিহার্য। আজ সময় এসেছে, দেশকে জাতিকে দেশের অতীত

ঐতিহ্যকে বখাৰ্জভাবে দেখায় ও জানায়। তাই এখন ইংলণ্ডের ইতিহাসকে বিদ্যায় জানাবার সময় এসেছে, তখন নিজেই দেখতেই সময় অন্তর দিয়ে আবাদন না জানালে চলবে কেন? নাট্যরূপের মধ্যেই উপাধান আমাদের আত্মীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে দেবে। দেশের নৌ-বীৰ, জ্ঞান-পরিমা, দেশপ্রেম ইত্যাদির সার্থক উপাধান ছাত্রদের সামনে তুলে ধরে দেখতে পড়ীর ভাবে জানার কাজে তাদের উৎসাহ করতে পারলে তবেই ইতিহাস পাঠমাত্র বিদ্যার সম্ভাবনা ভীষণ হ্রাস উঠতে পারবে।

—

শিক্ষা: আশ্বিন, ১৩৫৯

সূচী

আলোচনা	১৬১
নবী তালীম	১৬৩
[আচার্য বিনোবা ভাবে]	
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তন	১৬৪
[শ্রীহরীচন্দ্র দাস]	
মেটোর শিক্ষানীতি	১৬৭
[শ্রীকীৰ্ত্তন দে]	
বুনিয়াদী শিক্ষার চাক ও বাক নিয়ম	১৬৯
[শ্রীমৌরী দে]	
আমাদের ইতিহাস পাঠনা	১৭০
[শ্রীহরীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]	

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক (শিল্প বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত (বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি. ২০১১৪০ তত্ব)

কিডমাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন শুক্ল প্রণীত

কথা-শেখা

শেখা বা বখাৰ্জকৃত পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দিতে বখোটে সময় অপব্যয় হয়। অথচ বাক্যাত্মক পদ্ধতি অনুসারে ছবি ও বস্তুর সাহায্যে অতি অল্প সময়েই বর্ণপরিচয় ও বাক্যগঠন প্রণালী শিখানো বাইতে পারে।

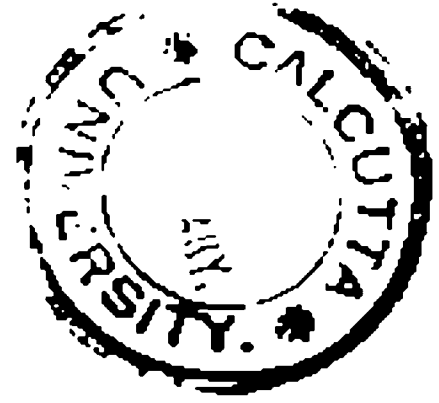
‘কথা-শেখা’ বইখানিতে তিনরঙা চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয় ও বাক্য গঠনের অল্প অল্পের পরস্পর সাহায্যকে স্তিতি করিয়া স্থূললিখিত ছন্দে বর্ণবোজন করা হইয়াছে। কলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুরা অল্প চিনিয়া সহজ বই পড়িতে পারিবে। প্ৰত্যক্ষপদ্ধতি ভাবে বেখানে ৬৪ মাসের শিশুদের কিছু শিখানো যায় না সেখানে ছই মাসেই শিশু নিজে নিজে সহজ বই পড়িতে পারিবে।

বুকের বর্জিত মজার গল্প, মন তোলাই ছড়া ও গাভার গাভার গল্পিন ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য। দাম দ্বাত্র চৌক আনা।

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

শিক্ষা



ম হি কল্যাণকর कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति

১০ম বর্ষ

কার্তিক ১৩৫৯

১২ম সংখ্যা

আলোচনা

মূল্য বৃদ্ধি

এতদিন আমরা কাস্তেব ও মুদ্রণ ব্যাপারের দুর্ভাগ্যে সন্তোষ প্রাপ্তকণকে বার্ষিক ২০ আড়াই টাকা হারে 'শিক্ষা' জোগাইয়া আসিতেছি। কিন্তু কুঃখের বিষয়, বর্তমানে তাহা আর সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। তাই ভবিষ্যতে বার্ষিক টানা তিন টাকা দাও কয়ই স্থির করিয়াছি। আশা করি, শিক্ষার গ্রাহক ও অগ্রগ্রাহকেরা ইহাতে সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন, এবং শিক্ষার মূল্য বৃদ্ধি দাবি পৌঁছাব করিয়া লইবেন, শিক্ষার এই সামান্য পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধিতে কাহারও অসন্তোষ হওয়া উচিত নয়।

মুদ্রণ পরিবেশে শিক্ষার ইংরাজির স্থান

সম্প্রতি নূতন পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজির স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কোথাও সরাসরি ইংরাজি সরাইয়া লইয়া কাগজে হিন্দী বলাইয়া হইয়াছে, কোথাও বা ইংরাজির স্থান পূর্ববৎ এখনও রহিয়াছে। এ অবস্থায় শিক্ষার ইংরাজি কতদূর চলিবে, তাহা ভাবিয়া শিক্ষাক্রমীরা বিভ্রত হইয়া

পড়িয়াছেন। ছাত্রশ্রমণ শিক্ষাক্রমী তাহাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি শিক্ষার স্থান করিয়া বাইতেছে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট কুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন— শিক্ষার বাহন পরিবর্তন করিতে সক্ষম চাই। পরিবর্তনের জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত কি! এ বিষয়ে হরিজন পত্রিকায় গত ১ নভেম্বর তারিখে বাহা লেখা হইয়াছে, তাহা খুবই সঙ্গীতময়। ইংরাজি যে কুস্তি বাড়ি চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহা ধীরে নামাইলে চলিবে না—এ বিষয়ে শিক্ষাঙ্গণের ক্ষমতা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি পাঠক্রমের স্থান

আমরা যেখান দূরী হইলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই এ, আই এন্স সি পরীক্ষার অন্তর্নিবিষ্ট ইংরাজি পাঠক্রম যথেষ্ট পরিমাণে কয়ইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শক্তকরা সত্তর জন যদি ইংরাজিতেই অকৃতকার্য হইয়া থাকে, তবে এ বিষয়ে উদ্বেগ করা আর

চলে না। যেটুকু লিখিতে হইবে সেটুকু অবশ্যই ভাল করিয়া লিখিতে হইবে, এবং লেখার পরীক্ষার ইংরাজি লেখা বাহাতে শুধু ভাষার দৃষ্ট, তাহার অন্তঃ বিষয়বিজ্ঞানও দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। আমরা বলি, প্রয়োজন হইলে প্রথম বার্ষিক স্নেহিতে পাঠ দান বা lecture দেওয়া কমাইয়া ইংরাজি শুদ্ধভাবে লিখিতে ও লিখিতে লিখাইবার ব্যয়বাহী বেশি করিয়া থাকা সরকার।

ইংরাজি পাঠক্রম পূর্বের তুলনায় কতখানি কমিল, তাহার হিণ্ডার ভাল করিয়া অবশ্য দেখা উচিত।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মহাবর্ষে। সেখানে নাগরিক জীবনে যে সব বিজ্ঞান প্রয়োজন হয় তাহাদেরই চর্চা হয়, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের নাজীরা যদি গ্রামের সঙ্গেই বেশি সম্বন্ধ হয় তবে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া বহু পূর্বে উচিত ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচ বৎসরের পক্ষেও সে দিকে প্রথমে কিছু করা হইল, ইহা উল্লেখযোগ্য। ওদ্যাপাতে গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হইল। স্বল্প পণ্ডিত নেহেরু ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। কৃষিকর্ম, পশুশালা, পুষ্টি-বিজ্ঞান, প্রাচ্যোত্তর, গ্রামের পথঘাট, সাধারণের ঘরবাড়ি যন্ত্রের মলমল প্রকৃতি নির্মাণের ক্ষমতা যে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান প্রয়োজন তাহা—এই সমস্ত লিখাইবার ব্যয় নূতন থাকিবে।

কমিউনিস্ট শিক্ষা

বাহার প্রতিক্রমের হিতসাহসের ক্ষমতা কমিউনিস্ট শিক্ষা যে কতখানি প্রয়োজন তাহা মেডিক্যাল বুদ্ধিতে পাইয়া যতদিন হইতেই অল্পক্ষণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত এই নভেম্বর তারিখে কলিকাতাও উপকণ্ঠে তাহারই চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, ট্রেড ইউনিয়ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কর্মক্ষেত্র বিশাল—সমগ্র এশিয়ার ক্ষমতা প্রসারিত। জাপান হইতে সিঙ্গেল পণ্ডিত নানা দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার এই ব্যাপক দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

বঙ্গীয় শিক্ষার উন্নয়ন

গত ১লা নভেম্বর তারিখে দেশের সর্বত্র বঙ্গীয় শিক্ষার উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে যে এ বিষয়ে কত বেশি করিবার আছে তাহা আমাদের পণ্ডিতেরা ভাবিলে বেশেয় মঙ্গল। সরকারের সঙ্গে দেশের অধিবাসীদের যোগ থাকিলে তবে এ পথে অগ্রগতি হওয়া ঘাইবে। আমরা চাই ক্ষমতা পক্ষপাতি দেশের নবনারী লোককে শিক্ষার পথে অগ্রগতি করিতে। বাঙ্গলা দেশের লোকেরা এক ল জনেরই বাহাতে বই পড়িয়া বুদ্ধিবার ক্ষমতা পাবে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

শিশুদের মন

[কাকাসাহেব কালেলকর]

মহাদেবতাই মেনাইয়ের পিতা শ্রী হরিভাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন; বিদ্যাহুয়ামী, গভীর ও বদিক। পাঠানদের মত দীর্ঘ বেল ও টাটকা লেবুর মত তেজস্বী কান্তি, সে অল্পও সর্বত্র তাঁহার খুব প্রভাব ছিল।

আরম্ভে বহন বিদ্যালয় খোলা হইল তখন নিজের ছোট মেয়েটিকে ভতি করিবার জন্য তিনি সর্বসম্মতি আসিলেন। মহাদেবতাই এই মেয়েটিকে আদর করিয়া 'বাঘ' বলিয়া ডাকিতেন, তাহার চেহারা বা বডাবে বদিক এতটুকু উন্নত ছিল না। মেয়েটির বডাব বড়ই মিষ্ট ও সৌম্য ভাবের ছিল।

তাহার ভতি হওয়ার পরের দিন আমি ভূগোল পড়াইতেছিলাম এবং নিজের বিবরণ লিখিয়া কবিতার জন্য বখাখা চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আহারের পরে সন্ধ্যার সময় কথাবার্তা চলিতেছিল। হরিভাই বলিতে শুরু করিলেন। কাকাসাহেব, আপনার বিগ্নে আমি অনেক কিছু শুনিয়াছি, কিন্তু মাঝ আপনার ক্রমে আমার মেয়ে একটুকু মন দেয় নাট, অথচ আপনি তাহাকে কিছু বলেন নাই পর্যন্ত, এ বড় আশ্চর্যের কথা।

আপনি কি করিয়া জানিলেন যে নির্মলা ক্রমে মন দেয় নাই, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমি লুকাইয়া একপাশ হইতে সব দেখিতেছিলাম; চুপি স্বীকার করা উচিত, তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনি ইহাও নিশ্চয় দেখিয়াছেন যে নির্মলা মন পড়ানোর দিকে ছিল না বটে কিন্তু আমার মন বখাখা নির্মলার দিকে ছিল।

তাহাই তো আশ্চর্যের কথা, আপনি দেখিতে-

ছিলেন যে মেয়েটি এদিক ওদিক তাকাইতেছে, পড়ানোর দিকে তাহার মনই নাই, তা আপনি একটা কথাও বলেন নাই।

এ তো ঠিকই হইয়াছে। আমি শিক্ষক। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকে এটা আমার ধর্ম। কিন্তু ঐ ছোট মেয়েটির এতদূর কোন ধর্মের বন্ধন ছিল না। তবু আমার বলা উচিত যে উহার ভূগোল পড়া ভাল মতই চলিতেছিল।

মেয়েটি এক নূতন জায়গার আনিয়াছিল। নূতন শিশুদের মাঝে বসিয়াছিল। ঘরটিও উহার পক্ষে নূতন। নিজের এষ্ট সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা দেখিয়া বুকিয়া নেওয়া এবং দীরে দীরে উহার সহিত নিজের সমস্ত স্থানান্তর করা, ইহাই তো উহার প্রথম কাজ। চঞ্চল জীবনই উহার পক্ষে সর্বত্র ছিল। শ্রেণীর কথাবার্তা উহার পক্ষে শুধু গৌণ ছিল না, মূর্খের ছিল। বডাবের দিক হইতে এবং অল্প সব দিক হইতে উহার বাহ্যে ইষ্ট তাহা কেন বন্ধ করিবেন।

সে বিদ্যালয়ে আসিয়াই দেখিয়া লইল সকল ছাত্রেরা কেমন করিয়া বসিয়া আছে, আর সবে সবে নিজের জন্য একটি জায়গা বাছিয়া লইল। তাহার পরে দেখিল, ঘরের কোণায় কোণায় বসিয়া আছে। তাহার পরে মেয়েদের ছবির দিকে তাহার নজর পেল। ছবি যদি শিশুদের মন না টানিতে পারে, তাহা হইলে উহা মেয়েদের টাড়াইয়া রাখা হইয়াছে কেন? তাহার পরে মেয়েটি শ্রেণীর সমস্ত শিশুদের, তাহারের কাপড় চোপড়, তাহারের বলায় ধরণ, সব কিছু নিজের মত করিয়া দেখিয়া লইল। এই ভাবে লক্ষ্য দিকের অবস্থাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে উহার আর সমস্ত সমস্ত চলিয়া গেল। সে আরও দেখিল যে আমার দৃষ্টি উহার উপর থাকিলেও

আমি উদ্যকে ধমক দেই নাই। আমার দৃষ্টিতে অলঙ্ঘ্যের ডাবও ছিল না। আমার দিক হইতে সে অস্তর পাইয়া গিয়াছিল যে, এই লোকটিকে তবু কবিতার কারণ নাই।

মিষ্টের পারিপার্শ্বিক বুদ্ধিগা লগুটাই কি কুপোল বিভার আসল কথা নহা? যেহেটি খাতাবিক বুদ্ধিতে তাহাই কবিতাছিল। আর আমার বিশ্বের ভিত্তিও পাকা হইতেছিল। শিক্ষক যখন শিক্দের ধমক দিয়া তাঁহার পড়ানোর দিকে তাহাধের মনোযোগী হইতে আদেশ করেন, তখন তো তিনি শিক্ষকলার ভিত্তিই ভাবিয়া ফেলেন।”

হৃদিতাইয়ের সন্তোষ হইল। তিনি বলিতে

লাগিলেন, “এ দৃষ্টি নূতন, এবং ইহা জানিলে ভূপ্তিও হয়।” ছুই তিন দিন পরে কোনও পর্ব আসিল, আমরা পর্বের ছুটির কথা বলিলাম। নির্ধনা চট করিয়া বলিয়া উঠিল “আমার ছুটি চাই না। পড়িতে মজা লাগে।” যখন সে দেখিল যে ছুটি হইবেই, তখন বলিতে লাগিল, আচ্ছা ছুটি না হয় হোক, কিন্তু কুপোলের ক্লাস তো আগুনাকে নিতেই হইবে।

হৃদিতাই যেহের শিক্ষায় অহুবাগ দেখিয়া খুব খুশি হইলেন, এবং আমরা একই কাতের কাজী বলিয়া তাঁহার লকে আমার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইল।

অহুবাদক—খ্রিষ্টিয়ান সেন

মেলবোর্ণের চিঠি

[খ্রিষ্টিয়ান সেন]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলবোর্ণ থেকে চিঠি এসেছে। এখানকার ছাত্রদের আর মুখ থাকল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদেয়া এতকাল যে কথা প্রচার করছিলেন দেশের সামনে, বিশেষ থেকে তার সমর্থন এল। এখন যদি পানের অন্তকরা হার দেশের নিচেও নামিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেশের লোকের আর বলবাহ কিছু নেই। মেলবোর্ণের চিঠি হাতে।

কিন্তু অতিভাবক আর ছাত্রদের কি করণীয়? কর্তব্যের মধ্যে তো দেখতে পাচ্ছি, পানের হার বাড়ানো। ব্যক্তিগতভাবে লোককে পানের হারের দিকে ফুঁকে গড়তে হবে। মেলবোর্ণ-কে অসত্য প্রমাণ করতে হলে পরীক্ষার মান বাড়াতে হবে। ততদিনে অধ্যাপক অধ্যাপক মিলে একটা কমিশন বসুক। প্রাপ্ত কেমন করতে হবে, খাতাপত্র

কিতাবে দেখতে হবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে কত নবর থাকবে, তারও একটা পরিকল্পনা করা হোক।

আজকালকার নামনকারে কমিশন বসানো একটা বড় চাল। কিছু হোক বা না হোক, কথার তুবড়ী সত্য ছাড়তে চোব কি! ‘পান করা’ কথাটার বাতুলত অর্থ কি, বৌগিক ক্রিয়া কি না, ‘ছাত্র’ কথাটা নামবাতুল কি না, ‘বিভাগ্য’ কথাটির সন্ধি ভাঙলে কি হয়, ‘স্ট্যাণ্ডার্ড’ কথার খাটি বাঙলা হ’তে পারে কি না, এইসব হিসেব সত্য বলে করলে কেউ আপত্তি করবে না।

কিন্তু আপত্তি করবার অধিকার কারও থাকুক আর নাই থাকুক, সমস্যার সমাধান এতে হয় না। তার অনেক কারণ আছে।

ছেলেবেলার ইচ্ছার একটা অভিজ্ঞতা মনে পড়ল। এই ইচ্ছা থেকে পর পর তিনবার

সংক্ষেপে কেউ 'আই'র উপর নব্বই পেন না। প্রধান শিক্ষক হিসেবে কলে পণ্ডিত মশাইকে ডাকিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ, এই পণ্ডিত মশাইয়ের হাত থেকে গড় দশ বৎসর ছেলেরা ভালো কল দেখিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, নতুন পণ্ডিত নিযুক্ত হলেও কিছু করতে পারেন নি।

সমস্যা এই একটা কোণে চেপে ধরবার পৌরোহিত্য আছে, 'শিক্ষা' সম্বন্ধে অজ্ঞতার দৃষ্টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় তরফা থাকলেই বা বহুদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলেই শিক্ষাবিদ হওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে, শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টির মতো পড়াশুনা করতে হয়। উচ্চশিক্ষার শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা গেছে, বি. টি. সম্বন্ধে উদাসীনতা, সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনোবিজ্ঞান আর শিক্ষানীতির বিষয়েও। জীবনে তারা কোনোদিন এইসব পুঁথির পড়বার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাদের ধারণা, শিক্ষা বস্তুটা আপনাকে থেকে গড়িয়ে চলে, একটা ঘর আর কিছু সংখ্যক শিক্ষাব্যাপ্ত। থাকলেই ও কাজটা এমনভাবেই হয়ে যায়। এঁদের পেছনে যে দূর শিক্ষাবিজ্ঞান-পড়ুয়া ব্যক্তি থাকেন, তাদের একমাত্র কথুবা 'তা বটেই তো, তা বটেই তো' বলা; বৈষয়িকতার দৃষ্টি এই ধরনের কথা বলায় খোঁজ এসে যায়।

কথাটা শুনেও কণ্ঠে হলও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আইন না কেনেও মেলবোনের চিঠি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যায়। অগত্যা আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন মানুষ পড়া এল না কেন? যে দেশে জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কড়াফড়ি ধারণা রেখেছে, তার চিঠিকে এমন সম্মান দেবার অর্থই বা কি? বিশেষে ফের ছেলেদের পাঠানো হয়, তাদের কতখানি বাছাই করে পাঠানো হয়? অগত্যা অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার মানের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার মানের কতখানি ঐক্য আছে? উপাখ্যক মশায়ের মনোভিলাষের সঙ্গে

মেলবোনের চিঠির এতখানি মিল চলো কি করে? কল্যাণের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, এসব সমস্যা অনুসন্ধান।

কিন্তু একটা বড় অর্থোক্তিক কথা মনে চালু করা হয়েছে, সে কথাটিই এই প্রবন্ধে বলতে চেষ্টা করি। 'স্ট্যাণ্ডার্ড' বা মান নিয়ে কথাটা।

দেখি বাংলাদেশে শিক্ষাব্যাপারে অস্তিত্ব এক বিশেষ ব্যক্তির ঘূর থেকে শুনলাম তারতবর্ষের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিচে। তার উক্তির প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না, শুধু 'কবি উবাচ' বলে ধরে নিতে হবে। মনে বড় আপত্তি এল।

আমরা শিক্ষার মান কাকে বলছি? এ দেশের শিক্ষার লক্ষ্য বা নীতিটাই বা কি? শিক্ষার মান এবং লক্ষ্য বলতে আমরা চাকরী পাওয়া বলে মনে করি। তা, কোনক্রমে ইংরেজি শিখে এবং যোগ-বিয়োগ কেনে যেসব অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছেন, সেখানে তারা অল্পপূজ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন বলে তো মনে হয় না। বিশেষ থেকে ভালো শিক্ষা দারা নিয়ে এসেছেন তারাও ফিরে এসে দেশে নতুন কিছু দিচ্ছেন বলে পরিচয় পাচ্ছি নে। যে দেশে সুযোগ কম, আর এক পরমাণ 'কন্সটিটু-করণ' শুনেও চায়, সে দেশের পক্ষে শিক্ষার মান নিয়ে কচকচি খুব শোভা পায় না। দারা লেখাপড়া শিখতে পারল না, তারা দারোগাগিরি সুষ্ঠুভাবেই করতে পারছে, দারা বিশেষ পাড়ি দিয়ে শিক্ষাবির হয়ে ফিরে এলেন, তারা কলেজের দাতাকলে 'গ্রামোফোন' বেশ ভালোই বনে গেছেন। দারা কিছুই করতে পারলে না তারা খবরের কাগজের সংবাদ কেটে জুড়ে দিয়ে সাহিত্য করছে, বই বিক্রি করছে। শুধু মান নিয়ে এত আপত্তি কোথায়? আপত্তির মধ্যে এই দেখতে পারছি, বাঙালীরা মাত্রাতির কাছে হিসেব-নিবেশে হেরে যায়, আর চীনে মিত্রির মতো জুতো তৈরী করতে পারে না, কিংবা

মাড়োমাড়োর ঘরে। বাবসাহে লাভ করতে পারে না। বিকলতা। যা কিছু এটোপানে। কিন্তু এই অসাকল্যের ক্ষুদ্র দাটী ছাত্রদের দেখা নয়, শিক্ষা-মানব নয়, দাটী শিক্ষাবিত্তাদের পাঠ্যদ্রষ্টা আর কার্যক্রম। বাবাক্ষর কহিনন বাবসাহিত্য ভগ্নতের এই দিক লক্ষ্য করেই শিক্ষার বুদ্ধিমূলক পাঠ্যদ্রষ্টার এক ব্যবস্থা করেছিলেন, যেন ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকেই হিসেব নিবেশ আর অন্তিম ব্যবহারিক ভগ্নতের আবহক বিবরণ পড়ার অন্তিম হয়ে আসবে। কিন্তু তা ছেঁড়া বস্তুর আর মূল্যবোধ যাই বাবানো মোকামে পড়ে থাকল, কাজে লাগানো গেল না। যে বিবরণ আবহা ছাত্রদের হাতে বিদ্যমানতা তুলে দিচ্ছে, সেই বিবরণ তো তারা পড়েই চলেছে। তবে তাদের ক্রটি কোথায়?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি এই গতাবস্থা-পতিকতা বা পণ্ডিতের জীবনদাপন না চায়, তবে আমাদের শিক্ষার মান এত লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। কোন রকম ভালো ইংরেজি শব্দ খুঁড়ে কিংবা দার্শনিকতার ধোঁয়া দিতে সেই লক্ষ্য স্থির করা চলবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে, জনসাধারণ তেমন মান বা লক্ষ্য চায় কি না। তারা যদি না চায়, যদি তাদের চিন্তা বিকৃত হয়, তবে তাদের সামনে রাজাপালকে খাড়া না করে তাদের এই ক্রটির কারণ কি, সমাজের কোন নিষিদ্ধি তাদের এমন কিস্তি করতে, সেই দিকটা ভেবে দেখতে হবে। সমাজনিষিদ্ধির দ্বারা ছাত্রদের চিন্তাব্যবস্থা ভগ্ন নেয়। বিজ্ঞানগুরু স্বীকৃতি এই জনসাধারণের মধ্যে থেকে আসে। ফলেই জনসাধারণের লক্ষ্যের মধ্যে তেমন মন পাওয়া যায় না। পুলিশের গুলিতে জনতা চৌকান যায়, কিন্তু তখু ভালো ভালো কথা দিয়েই জনতার চিন্তাকে বদলানো যায় না।

কিন্তু এ-তো গেল ভবিষ্যতের কথা।

বর্তমানে শিক্ষার মাননেমে গেছে বলতে আমরা

এটো বুঝছি যে, বেশি সংখ্যক ছেলে বৃত্তি পায়। এই অকৃতকার্যতাটো ভগ্ন দাটী ছেলেদের নিষিদ্ধি দ্বারা যেখানে ক্ষতি বলে কর্মকর্তা বা স্থির করেছেন।

নিষিদ্ধি দ্বারা যেখানে ক্ষতি বা নিষিদ্ধি মান পড়েছে কিভাবে জানা যায়? আত্মকাল কোন দেশে মান নিষিদ্ধি করতে অকৃতকার্যতার উৎস নির্ভর করা হয় না। এ বিষয়ে অল্প দেশের শিক্ষাবিবেচনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মান স্থির করতে হলে, সে সময়ে পরীক্ষা করতে হলে, অতীতের থেকে বর্তমানের ছাত্রেরা নেমে যাচ্ছে কি উঁচুতে উঠছে জানতে হলে, কয়েকটি বিষয়ের সাহায্য নেওয়া হয়। প্রথমত, ছেলেদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার ভগ্ন মনোবিজ্ঞানমূলক বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, কয়েক বছর অন্তর সেই বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ করে, তাদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সমস্ত ব্যাখ্যা করতে হয়। তৃতীয়ত, পাঠ্য-বিষয়ে অভীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। ইংলিশ যে সমাজে অবস্থিত, যে অকলে স্থাপিত, সেইসব সমাজ ও অকলেও নানাবিধ দ্বিধে পরিসংখ্যান করে করে দেখতে হবে, সমাজের কোন পক্ষ ইংলিশ ছেলেদের প্রভাবিত করেছে।

বিজ্ঞান-গত, শ্রেণী-গত, দেশ-গত, কাল-গত নানাবিধ অভীক্ষা প্রয়োগ করলে শুধে আনন্ড বলতে পারি, ছেলেদের শিক্ষামান নেমে যাচ্ছে কি উঁচুতে উঠছে। একমাত্র সেই সময়েই বিচার চলতে পারে।

ইংলিশ বা কলেজের শিক্ষকের পড়ার ক্রটি করতে হলেও ইংলিশ বা কলেজের একটা নিজস্ব মান অব্যক্ত কাছাকাছি উচিত। অল্প শিক্ষক ভালো পড়াতে পারছেন না, বলাই প্রমাণ নয়, গুরুত্ব যদি মানতেই হয়, সর্বক্ষেত্রেই মানতে হবে। কেবল শিক্ষকের শ্রেণীকে সর্বজন নিষিদ্ধি রাখতে পারলেই কর্তব্য সমাধা হয় না।

এইসব অতীকা-প্রয়োগ করার পর আমরা
কিছুটা ঠিক যতো পরতে পারি। অতি না খরচে
পায়লে সমাধানের কোন প্রদর্শই ওঠে না। অন-
ভিজের বিচার বর্ম-পনী হলেনও অন্যতর বা অগ্রাণ।

এই অনভিজতা ইচ্ছাপ্রসূত। বারা শিক্ষা
চায়, তারা শুধু কাজ করে খাবার খোঁসাতা অর্জনই
করতে চায়। বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাঁরা
চান ছেলেবা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করুক।
সমাধের কথাটা তাঁরা সঙ্গ-মেল বলে ধরে
রাখেন। ফলে এই হঠ, বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ
সাধন মৈবক্রমে করে ফেলেন, তাঁরা সঙ্গী ব্যক্তিতে
পরিণত হন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা
বুঝে নিয়েছি, কলেজে উঁচু নবর পাওয়া, আর
আপিলে দায়েবো কাজ পাওয়া। সমাধের প্রতি
সহায়কৃতি এঁদের আসে না। নিজেদের সন্তান
সন্ততিকে ইংরেজী ইংলিশ কিরিন্সি পাড়ার পাঠিছে
শিক্ষা দান করেন, আর বক্তৃতার সময় বলেন, বাংলা
তারা চর্চা করা মহৎগণ। এই অগ্রাই দেখি ইংলিশ
সব বিষয় বাংলায় পড়ানো হয়, আর ইংরেজী বা
শিখল না, বলল না, সেই ইংরেজী সঙ্কলনে থাকে
মেকলে সুপার প্রস্তুতির পরিপুষ্ট লেখা। এমন
অনিয়ম দান আতিশেয় যথোই থাকে, আর
সমাধকে বারা দালালদান করে রাখতে চায়,
তাদেরই মনের এই প্রবৃত্তি।

বিশ্ববিভাগের পাঠ-সঙ্কলনের বাংলা বইটা
এখনও ইংরেজী মলাট বিধে ছাপা হয়।

এই অগ্রতা শিক্ষাবিষয়ের অদ্যাদিক নীতি
থেকে আসে। বীকার করুন আর নাই করুন,
শিক্ষাবিদদের এই এড়িয়ে যাওয়া নীতি বা সুবিধা
কোন করার দুনিবার আকাঙ্ক্ষা মেনকে ধ্বংসের
মিকে টেনে আনছে। বাক্যনীতির ক্ষেত্র হল
এঁদের অপদায়ণ ঘটত, কিন্তু শিক্ষাজগতে আস-
বায়নাই তাবের বিকল্পে বলবার কেউ নেই।

বাংলাদেশের ঘরে আগুন লেগে গেছে, এই

কাকে এঁরা তামাক খেয়ে নিচ্ছেন। এ সকল
কথা বখন ডাবি, আর ববয়ের কান্ধের পুঠায়
বাগী বখন পড়ি তখন নিগ্রান হয়ে প্রাক্টে নিয়ে
ববীজন্য প্রকৃচ্ছন্ন গাভীজীর আশ্রকে ভেবে
এনে বলতে ইচ্ছা হয়, “ভাঙ্গিল তোমরা ঘরে
গেছ, নতুবা মাঝহত্যা করতে হত।” বেশ
অতিশয়কল্প। এমন দুঃসময় জাতির জীবনে আর
আসে নি। একটি মাহুদ নেই, যে এই কপটতার
বিকল্পে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

আচ্ছ! ধরুন, যে ছেলে বি-এ ক্লাস অবধি
বাংলাতে পড়ে গেল, সে এন-এ স্তরে ইংরেজি
শিখতে যাবে কেন? এন-এ পড়ে সে কি করবে,
দেশের কাজ করবে, না বিদেশ পাড়ি দেবে, না
ইংরেজি কান্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লিখবে? এ
অনিয়ম কেন? এর কারণ, শিক্ষাটা যে কি তাই
আমরা জানিনে।

বুদ্ধিবৃত্তি বর্ষ হয়ে দাড় বলে বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষা
আমরা বান নিয়েছি। কোন কিছু বান বেগদা বুদ্ধির
পরিচয়। আমরা বান নিয়েছি, কান্ধ বুদ্ধিবৃত্তি
শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে ডাকবি করা যায় না।

দুটো বেলি বাড়ির সরকার নেই। আমি
বলতে চাইছি, যে পদস্থ না বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে
‘মান’ পাড় করতে পারি, যে পদস্থ পদীক্ষার পাঠা
বিষয়ের উদ্দেশ্য ঠিকমতো ছকে না নিতে পারি,
সে পদস্থ শিক্ষার মান বা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে
আমাদের বলবার কোন অধিকার নেই। আর
এই ব্যাপক অতীকা-প্রয়োগ সরকারী ব্যবস্থা ছাড়া
হতে পারে না। সরকারের যদি এই লাখ কয়েক
টাকা মাত্র শিক্ষার খাতে ব্যয় করবার সুবিধে না
ঘোটে, তবে যথোই মেনবানী, তোমরা আর বাগী
দিত না, পরস্রবায়ের কথা ‘বাগী তগাযি মাজ’।
দেশকে পোন্নায় বেতে লাও, তোমরা বর্তমান পুঙ্খ,
যোটা বেতন নিয়ে মরবার চেষ্টা কর। কারণ
তবিত্ত পুঙ্খের, তোমার বংশবের এ সুযোগ
আমি আদবে না।

একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র

[শ্রীমন্তনামাথ দাস]

হাওড়া জেলার রাজীবপুর শিক্ষাকেন্দ্র দেখে মনে বেশ আনন্দ এবং আশার সঞ্চার হল। সাত মাসে প্রায় চল্লিশ জন নিরক্ষর বয়স্ক লিখতে পড়তে এবং সাধারণ জ্ঞান কবতে শিখেছে। কয়েকজন লক্ষ্যাকর বয়স্ক মহাভারত পড়ে শোনালে, বেশ দুন্দর জ্বর করে সহজ নিতুলভাবে পড়ে গেল। তাহের পড়া শুনে বেশ আনন্দ হয়েছে, একথা একান্তে তাহের জানিবে দেওয়ার, তারা আমার জানালে যে পড়তে শিখে তাহেরও আনন্দ কম হয় নি, এখন অবশ্য পেনেট তার! রানায়ণ মহাভারত পড়ে, তাতে কত সব ভাল ভাল কথা রয়েছে! কত সব উপদেশ রয়েছে! এখন তারা পড়তে বসে যায়, পাড়ার কত লোক তাহের ঘিরে বসে। তাহের কত খাতির করে।

তাহের নিতুল পড়া শুনে আমার মনে একটু সন্দেহ হয়েছিল, তাহের কেউখা আগে থেকেই অল্পত কিছুটা পড়তে জানত। সত্য নির্ধারণ করব বলে তাহের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা জানালে যে সাত মাস আগে এ কেন্দ্রেই তাহের পড়া শুরু হয়েছিল। অতিজা শিক্ষক আমার সন্দেহের কথা অহুমান করে বললেন, “সর, আজ হতে সাত মাস আগে এদের বধন অনেক বোনাঘুদি করে তেকে এনে নাম। কণার পর পড়ার কথা বলতে গেলাম, তখন এদেরই একজন তার পার্বর্তীর নিকট আমি শুনে পাই এমন ভাবে আনাকে যে প্রাক্তীকতা-জ্ঞাপক বিশেষণে বিশেষিত করেছিল, তা শুনে আপনি বুঝতে পারবেন এরা তখন কেবল নিরক্ষর ছিল না, বেশ অস্ত্রও ছিল।” বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল, “শুভমশাই, একথা বলে এখন কেন আর আনার লক্ষ্য দিচ্ছেন?

আমি শু অনেক বার আপনার কাছে কথা চেয়েছি।” বুঝলাম, এরা কেবল লিখতে পড়তে শেখে নি, ভয়ও হয়েছে।

সাইরে এনে শিক্ষক মশাইকে তাঁর লাকলোর অল্প অভিনন্দন জানালাম। উত্তরে তিনি বললেন, “সর, আমাদের কাচটা খুব শক্ত। কিছু বৈধ ঘরে চলতে পারলে আর মনে দুট সতর খাফলে বল আমরা পাবই। এদের নিয়ে প্রথমটা আমারই কি কম বেগ পেতে হয়েছিল?” তার পর তিনি কি ভাবে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন এবং কেমস করে এগিয়ে গেলেন সংক্ষেপে তা বলে গেলেন। বয়স্ক-শিক্ষণ-শিক্ষা লাভ করে গ্রামে ফিরে এলে গ্রামেও নিরক্ষর লোকদের তেকে এনে নানা কথার পর তিনি বধন পড়ার কথা পাড়তে গেলেন, তখন তাঁর তামো যে কি বিশেষণ জুটেছিল তা তিনি আগেই বলেছিলেন। তিনি তাতে গাপ করেন নি। বিচলিত হন নি। পড়াবার কথা তখন স্থগিত রাখলেন। তাহের কাছে পৌরাসিক গল্প বলতে লাগলেন। বেশ আগ্রহ সহকারে তারা শুনে গেল। শিক্ষক মশাই বললেন তারা যদি বোজ সেখানে সমবেত হয় তা হলে তিনি আরও ভাল ভাল গল্প শোনাবেন। মশাই সম্মতি জানালে। বোজ সভায় এনে মশাই গল্প শুনে শুনে বলে যায়, শিক্ষক মশাই গল্প বলে চলেন। গল্পের আগর জমে ওঠে। সুযোগ বুঝে শিক্ষক মশাই তাহের একদিন বললেন, “আমার গল্পের সুনি গ্রাম তো ফুরিয়ে এল, এখন এক কাণ করা বাক, আমি তোমাদের গল্প পড়ে শোনাবো।” খোঁতারা রাতি হল। শিক্ষক মশাই মহাভারত থেকে উপাখ্যান পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। গল্প চলে হুৎ

এক সূর্যের মধ্য দিয়ে। স্রোতাদের নেশার পেয়ে বসল। যোজ লজ্জার এখন বেজার ডিক। এবার একদিন শিকক মশাই বললেন, "দেখ, আমি আর কত স্রোতাদের পড়ে শোনাও? মিছেই একটু একটু পড়তে শিখলে বখন ইচ্ছে তখনই তো পড়তে পারবে।" উৎসাহ তাদের প্রাণ চরমে উঠেছে। তারা জানার শিখতে তাদের প্রবল ইচ্ছা, তারা জানতে চায় শিখতে তাদের কতদিন লাগবে। শিকক মশাই দেখলেন তাঁর চেষ্টা এত দিনে সফল হতে চলেছে। তাই তিনি তাদের আশ্বাস দিলেন তারা যদি শিখতে চায় তবে তিনি চার মাসে তাদের বামায়ণ মহাভারত পড়তে শিখিয়ে দিবেন। ঠিক হল পর দিন থেকে গল্পের ঠাঁকে ঠাঁকে পড়া চলবে।

পর দিন প্রথমটা শানিক গল্প পড়া হল। তার পর স্রোতাদের মধ্য হতে দাবি উঠল, এবার একটু পড়া শেখানো হোক। সেদিন শিকক মশাই প্রথম পাঠ দিলেন। সপূর্ণ আকাবের কয়েকটা

অবস্থার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটায় সেগুলো দিয়ে বিচিত্র লম্বা রচনা করে তাদের শিখালেন। স্রোতারা পড়ুয়া হয়ে গেল। প্রথম দিনেই বেশ সহজে তারা পনেরো বিলটা লম্বা আরত করে কেললে। মনে তাদের বিশ্বাস এল তারা শিখতে পারবে। আগ্রহ আর বিশ্বাস নিয়ে তারা সেদিন ব্যক্তি গেল। যোজ পড়া চলতে লাগল। এবার থেকে গল্পের গতি এল শিখিল হয়ে, পড়া চলল ক্ষুদ্র তালে। শিকক মশাই-এর উদ্দেশ্যে ছাড়িয়ে পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য। সাক্ষ্য তাদের মনে এনে দিয়েছে নূতন বল। চার মাসে কয়েকজন পড়ুয়া বেশ পড়তে শিখে গেল। তারা এখন একটু একটু করে বামায়ণ মহাভারত পড়ে। চেষ্টায় তাদের বাবা পড়ে নি। আজ লাভ মূল পরে তাদের সাক্ষ্যের পরিচয় আমার কাছে দিতে গেবে তারা আজ পবিত্র। এখন তারা পড়ে অপরকে পড়ে শোনাও। কেবল তাই নয়, অপরকে পড়াতেও চেষ্টা করে।

বাংলা ব্যাকরণের উপাদান

[প্রবন্ধমাধ গাল]

বাংলা ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত অপরিহার্য অংশ অবিকার করে আছে। এটি ভাষাতত্ত্ব বিত্তমতাবে বলার অর্থ যে বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, তা যোগদয় বুদ্ধিতে বলার প্রয়োজন নাই। এখন কথা হলো, এই ব্যাকরণ শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত? বর্তমানে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেই ভাবেই চলবে, না এর পরিবর্তন করতে হবে?

'ব্যাকরণের বেতনো শুধু সূত্রের মধ্যেই পড়ে, সেগুলো খে নীচু ক্রমে শেখানো হবে, 'আবোস্তো

প্রণালীতে ব্যাকরণের পাঠ দিতে হবে', 'প্রচুর দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাকরণের নিয়মগুলো মনে রাখতে হবে' প্রভৃতি বিষয় কাহ্নন আমাদের দেশে শিক্ষক এবং ভাবী শিক্ষক অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগে শিখছেন। ঐগুলো অবশ্য খুবই প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষা সম্বন্ধে ঐটুকুই সব নয়। এ তো শুধু গেল প্রণালী (method) সম্বন্ধে বক্তব্য, কিন্তু বিষয়-বস্তু (contents) সম্বন্ধে চিন্তা করারও যথেষ্ট পোশাক আছে।

বর্তমানে আমরা দেখছি, যেভাবে বাংলা ব্যাকরণের বিষয়ে প্রাচীন হয়েছে, তাতে ছাত্রছাত্রীদের মস্তিষ্কের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে। যেমন মতঃ বাক—ব্যাকরণের প্রথম দিকে ‘নব’ শব্দে পাঠ দেওয়ার সময় “মৌলিক নব” ও “সামান্য নব” বলে তার শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়, আবার “মৌলিক”, “কৃৎ”, “যোগকৃৎ” ধরনের তার শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়। ‘নব’ শব্দে পাঠ দিতে গিয়ে তার বিশেষ্য, বিশেষণ, প্রকৃতি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে অব্যয়কে গণনা করা হয়েছে। আবার ব্যাকরণ প্রয়োগনীর অংশ শব্দে পাঠ দিতে গিয়ে কৃত্য এবং ক্রিয়ার কথাও বলা হয়, এবং যোগ্যতা, আসক্তি ও আকাজ্জব কথাও বলা হয়।

এখন আলোচ্য বিষয় হলো—এই রকম শিক্ষণানের ক্রটি কোথায় ?

বর্তমান বাংলা ব্যাকরণে আমরা দেখছি যে পদের শ্রেণীবিভাগের সময়—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে অব্যয়কে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য বেশ ভাল করে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিশেষ্য বিশেষণাদির সঙ্গে “অব্যয়” নামটি ব্যবহার করা উচিত নয়, বরঞ্চ ‘অব্যয়’ নাম দ্বারা যে পদগুলোকে বোঝানো হয় সেগুলো বাক্যের প্রয়োজন আছে। কার্যপদও বলা যেতে পারে, পদের কাজ হিসেবে বিশেষ্য, বিশেষণ প্রকৃতির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে; অর্থাৎ যে পদের কাজ হলো কোনও প্রাণী বা অপ্রাণীর নাম প্রকাশ করা তাকে বিশেষ্য; যে পদের কাজ হলো অন্য পদের ওপর বা বাক্য প্রকাশ করা, তাকে বিশেষণ, আর কাজ হলো অন্য বিশেষ্যের বদলে বলা—তাকে সর্বনাম, আর বাক্যের কাজ হলো কোনও কাজ করা বোঝানো তাকে ক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।

এই কাজের দিক দিয়ে বিচার করলে প্র

থেকে, ‘অব্যয়’ নামটা কোন কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে ? এর কোনও পদটির পাওয়া যায় না; কারণ কোনও কাজের জন্য ‘অব্যয়’ নামটা রাখা হয় নাই, অথচ নাম দেওয়া হয়েছে এই অংশে যে, বিভিন্ন অবস্থায় এর গঠনের কোনও ‘ব্যয়’ অর্থাৎ পরিবর্তন হয় না।

সংক্ষেপে বলা হয়েছে—

“সপ্তমঃ ত্রিষু নিম্নেষু সর্বাঙ্ক চ বিচক্ষিত্ব
বচনেষু চ সর্বেষু গুণ বোত্তি তদব্যয়ম্।”

তা হলেই প্রব উঠলো, গঠনের ওপর নির্ভর করেই এখন এর নামকরণ হয়েছে—কাজের ওপর নির্ভর করে নয়, তখন পদের কার্যবুলক শ্রেণীবিভাগে তার স্থান কেন ? গঠনমূলক শ্রেণী বিভাগেই এর স্থান হওয়া উচিত। অর্থাৎ যখন গঠনের ওপর নির্ভর করে পদের শ্রেণী বিভাগ করা হবে তখনই পদকে “অব্যয়” ও “পব্যয়” এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে। যে সব পদে বিচক্ষিত্য আদির যোগে কোনও পরিবর্তন হবে না, তাদের ‘অব্যয়’ এবং তাদের পরিবর্তন হবে তাদের ‘পব্যয়’ বলা হবে।

খেন, প্রব উঠতে পারে—অব্যয় বলতে যে পদগুলোকে বোঝানো হয়, তাদের কি ব্যবস্থা হবে ?

আমরা দেখতে পাই বাংলা ব্যাকরণের অব্যয় বলতে যে ক’টা পদকে বোঝান হয়েছে, কাজের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করলে তাদের তিনটে ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথমতঃ বেজলোর কাজ হলো যে কোনও দুটো নব, পদ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রকৃতিকে সংযুক্ত করা, তাদের বলা যেতে পারে ‘সংযোগক’—যেমন, ও, এবং, বা, অথবা প্রকৃতি। দ্বিতীয় কাজ হলো যনের বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা, তাদের বলা যেতে পারে “অব্যক্তক”। যেমন, আঃ, উঃ, বাহবা, বেশ, প্রকৃতি; আর দ্বিতীয় কাজ হলো অন্য পদের পাশে বসে তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা, তাদের বলা যেতে পারে “অনুসঙ্গক” যেমন—দিকে, দন্ত দ্বারা, চেয়ে প্রকৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাজ অশুভাচারী পক্ষে মোট সাতটা ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন— বিশেষজ্ঞ, বিশেষণ, সর্বসাধারণ, ক্রিয়া, সৎসাধারণ, অসৎসাধারণ ও অসৎসাধারণ।

আবার, মৌলিক এবং সাধিত বলে শব্দের যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এটা শব্দের গঠনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে করা হয়েছে। যেমন, যা, খা, পা প্রকৃতিকে আমরা মৌলিক শব্দ বলি এইজন্যে যে এদের গঠনের সময় কোনও প্রত্যয়াদির প্রয়োজন হয়নি। আর ‘বিশ্বালয়’, ‘বিশ্বপত্র’ প্রকৃতি শব্দকে ‘সাধিত’ বলি এই কারণে যে, এদের গঠনের সময় বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু শব্দকে যখন আমরা যৌগিক, রূঢ় এবং যৌগরূঢ় হিসেবে শ্রেণী ভাগ করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা এদের গঠনের ওপর নির্ভর করি না, এই বস্তু শ্রেণী বিভাগের সময় আমরা এদের অর্থের ওপর নির্ভর করি। যেমন—‘পাঞ্জাবী’ এই শব্দটাকে কখনও আমরা ‘যৌগিক’ বলি আবার কখনও ‘রূঢ়’ বলি। কারণ, যখন পাঞ্জাবী অর্থে পাঞ্জাবের অধিবাসী বোঝায় অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ যখন বলবৎ থাকে, তখনই একে আমরা যৌগিক বলি; কিন্তু পাঞ্জাবী অর্থে যখন ‘জামা’ বোঝায়, তখন এর প্রকৃতি প্রত্যয়ের আসল অর্থ বলবৎ থাকে না বলেই একে আর যৌগিক বলা হয় না, তখন একে বলা হয় ‘রূঢ়’।

প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে না থেকে কিছুটা থাকলে, অর্থাৎ একই শব্দ খানিকটা যৌগিকের প্রত্যয় আর খানিকটা রূঢ়ের প্রত্যয় থাকলে, তাকে আমরা বলি যৌগরূঢ় শব্দ। যেমন, জলদ। জল বান করে যে, তাকে বলা হয় জলদ। এটা হল প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ। কিন্তু যে-ই জলদান করে তাকে কি আমরা জলদ বলি? তা হলে তো জলের কলকেও জলদ বলাতে হয়।

জলদ অর্থে আমরা দেখতেই বুঝি। তবে যেহেতু জল বান করতেই হবে, তা না হলে কিছু যেহেতু জলদ হবে না।

তাহলে আমরা দেখছি জলদ এই শব্দটিতে প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ খানিকটা আছে, খানিকটা নাই, তাই এই শব্দকে যৌগরূঢ় বলা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তুকে অক্ষর, শব্দ, পদ, বাক্য—এইভাবে সাজান হয় হোক, কতি নেই, তবে তাহলে তিনটে করে ভাগ করতে হবে—কার্যমূলক, গঠনমূলক এবং অর্থমূলক।

এখন দেখা যাক, তাহলে কি তাই তিনটে করে ভাগ করা যায়।

বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য প্রকৃতির যখন কাজ দ্বারা বিচার করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহলে নাম-করণ হবে—তখনই তাহলে কার্যমূলক শব্দের মধ্যে পণ্য করা হবে।

এই শব্দের মধ্যে পড়বে—বর্ণের শ্রেণী বিভাগ, বর্ণের উচ্চারণ স্থান, কাজ অশুভাচারী শব্দের শ্রেণী বিভাগ, কাজ অশুভাচারী পদের শ্রেণী বিভাগ প্রকৃতি।

আবার এই বর্ণ, শব্দ প্রকৃতির গঠন সম্বন্ধে যখন বিচার করা হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে তাহলে নামকরণ হবে তখন তাহলে গঠনমূলক শব্দের মধ্যে পণ্য করা হবে।

এই শব্দের মধ্যে আসবে—বানান, বানান-পরিবর্তন, শব্দ ও বস্তু বিধান, সন্ধি, শব্দভাণ্ডার, বিশুদ্ধি, কারক, পদের গঠন অশুভাচারী শ্রেণী বিভাগ, প্রত্যয়, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, বাচক ও ক্রিয়ায় গঠন-মূলক শ্রেণী বিভাগ, বাক্যের গঠনমূলক শ্রেণী বিভাগ, উপসর্গ, কর্মপ্রসঙ্গীক, উপপদ, উক্তি, কালাহুতি, ছন্দ প্রকরণ প্রকৃতি।

আর, অর্থ সম্বন্ধে বিচার করে যখন তাহলে

নামকরণ করা হবে এখন তাহাদের অর্থমূলক তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করা হবে।

এই তত্ত্বের মধ্যে পড়বে—পঞ্চম অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ, পঞ্চম অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ, ব্যাকরণ অর্থমূলক শ্রেণী বিভাগ, বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ, শব্দার্থ প্রকরণ; ভাষা, শুদ্ধ, বীতি, ধর্ম, অলংকার প্রভৃতি।

এখন কথা হল—কোন তার আগে দেখানো হবে, আর কোন তার পরে দেখানো হবে?

আমাদের মনে হল, বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভাগ করা উচিত।

ব্যাকরণের প্রথম শিক্ষার্থীকে পড়তে গিয়ে দেখা গেছে যে, কার্যমূলক ব্যাকরণ (তত্ত্ব) তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে, তার চেয়ে চেয়ে বেশি সময় নেয় তারা গঠনমূলক ব্যাকরণ (তত্ত্ব) বুঝতে; আর অর্থমূলক ব্যাকরণ তো তাহাদের মাঝে চোকে না বললেই হল। তার কারণ, কার্যমূলক ব্যাকরণের অপেক্ষা গঠনমূলক ব্যাকরণ বুঝতে বেশি চিন্তাশক্তি এবং বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হল; আর তার চেয়ে

আরও বেশি চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন হয় অর্থমূলক ব্যাকরণ বুঝতে।

তাই নিম্নের চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ যখন খুব বেশি হয়নি, তখন গঠনের খুঁটিমাটি বা অর্থের ক্ষমতা তত্ত্বের অবতারণা না করে তাকে কার্যমূলক ব্যাকরণই শিক্ষা দেওয়া হয়কার।

তার পর যখন তার চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির বিকাশের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাবে, তখন তাকে গঠনমূলক ব্যাকরণ দেখানো হবে। এই ভাবে কিছুদিন চললে পর যখন দেখা যাবে যে, অর্থের ক্ষমতাস্বতন্ত্র ভেতর প্রবেশ করার মত তার চিন্তা-শক্তি ও বিচারবুদ্ধির বিকাশ হ'য়েছে—তখনই তাকে অর্থমূলক ব্যাকরণ (তত্ত্ব) দেখানো যেতে পারে।

মাসামিক বিজ্ঞানসম্মেলন পঞ্চম শ্রেণীতে কার্যমূলক তত্ত্বের, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে গঠনমূলক তত্ত্বের, এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে অর্থমূলক তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া হলে, ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রতি সুবিচার করা হয় বলে আমরা মনে কর।

প্রাথমিক শিক্ষার দাবি

[ত্রিমাসিকমাস চক্রবর্তী]

জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি তাহার আদর্শ ও মানোবৃত্তির উপরই নির্ভর করে। মনঃলব্ধ হইলেই শৃঙ্খলা আসে; আদর্শ যহান হইলেই জাতি উন্নত হয়। কোন দেশে প্রত্যেক ও জন লোকের একখানি মোটর গাড়ি; কোন দেশে শতকরা ৯৭ জন চলচ্চিত্র দেখেন। আমেরিকার শিক্ষকগণ গড়ে বার্ষিক ৩,১০০ ডলার (১ ডলার = ৫ টাকা) পান, সেখানে ভায়তীয়দের ভাগ্য

ছোটো মাত্র ১০০০ টাকা। আলজীরিয়ার আদর্শ প্রণীতির মহিমার একবাজের মধ্যে লগুন সহর এখানে আলিরা উপস্থিত হইবে, সরকারের এই কর্তব্যপ্রসূত পরিকল্পনাগুলি অকালে ব্যর্থতার পর্ববসিত হয়। কেবল টাকার ভ্রান্ত আদর্শ গঠনের দরপ; যথা, উলিতে মাদ্র পরিবার ব্যবস্থা করিয়া মৎস্তের মূল্য হ্রাস করা; এখানেই কয়লানেবু সরবরাহ করিয়া কয়লানেবু দত্তা করা,

underground railway করিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, ইত্যাদি। স্বর্ণপটপটের রোগীকে একটু একটু করিয়া ঘুবেল আশ করা হইয়া, ঘুবেলে অভ্যস্ত করা হয়, আকিংখোরকে মাজা করা হইয়া, করা হইয়া নেপা হইতে মুক্ত করা উচিত, নতুবা রোগীর অবস্থা যে বড়ই কাহিল হইয়া পড়ে। ২০০ বৎসরের পরাধীন জাতি যে নুতন স্বাধীনতা পাইয়া অপরাপর স্বাধীন দেশের অঙ্গভূত করিতে ইচ্ছা বাতাবিক। কিন্তু সাময়িক ভাবে উহাকে সমাইয়া রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা পাইলে কি হইবে? দাম্পত্য প্রকৃতি আমাদের মজার মজার বর্তমান। যথার্থ ভাবি বোঝা অপসারিত হইলেও তার যে পূর্ববৎ বর্তমান বলিয়া বোধ হয়। বেশ স্বাধীন হইয়াছে, দেশের শাসন পদ্ধতি ও রাজকর্মচারী পূর্ববৎ। যেখানে বাহ্য ঠিক তাহাই হইয়াছে, কেবল মাত্র দেশ স্বাধীন হইয়াছে। পূর্ব আচরিত মনোভুক্তি জনসাধারণের শিষ্টাচার নিয়ম বর্তমান। দুই তিন পুরুষ পেরে যদি মনোভুক্তি ক্রমশঃ স্বাধীনতার উপযোগী হয়। দেশের ভবিষ্যৎ বাহ্য তাহা যিগকেও এই পরিস্থিতিতে সেইভাবে নিকাশীকা দিতে হইবে ও ক্রমশঃ আশ্রয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। চাউলের দর কমিলেই ডালের দর কমিবে, মৎস্যের দর আপনা হইতেই কমিবে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দিয়া স্থলগুলির উন্নতি করিবেন, ইচ্ছাতে অনেকেই আনন্দিত। আমাদের জাতির গুরুত্ব অনেকেই অবগত, কিন্তু সন্দেহ পাইয়া অনেকটা তুলিয়া বান, কতকটা মনুষ্যের মাত্রার মতো মত দিলাইয়া দেন—‘গণচক্র উপস্থান পুত’, পাছে নিজের স্বার্থনিষ্ঠিতে গোপনোপ উপস্থিত হয়।

কলিকাতার বহু স্থল আছে। কয়টি স্থলের নিজস্ব বাড়ি আছে? বাহাদুর নিজস্ব বাড়ি আছে, বাহাদুর তাড়াবে নিজস্ব ঘণ্টে টাকা আছে, তাহারা কি সবটুকু টাকা চালিয়া দিয়া নিজস্বগণকে পুষ্টিবেন? না ছাত্রদের মাহিনার হাব

বাড়াইবেন? তাহাতে কি সেখানে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে? ৩০০ টাকার নিজস্বকে ২০০ টাকা গ্রাণে গহিয়া দিবেন কি? ইহার ফলে যে লক্ষ লক্ষ লোক একাউন্ট কখনও ছিল না সেখানেও donation এর খাতা বড় হইবে আর মিথ্যা ‘বিল’ বই এর পাতা বাড়িবে। সবকালের টাকা না গ্রাণ করিলেও “দম্পত্য বিনম্রতি”। তাহাও আশে, যে সব স্থল তাড়া বাড়িতে আছে তাহাদের কথা। সবকালি সাহায্য পাইলেই কি বৃন্তের বাড়ি পাওয়া যাইবে? একে তেঁা তাড়া পাচ জন বেশি তাহার উপর আবার এক পাড়ার স্থল অন্য পাড়ার লইলে চলিবে না, কারণ কলিকাতার যাত্রার চলা কিংবা যাত্রা পার হওয়ার ভীষণ বিপদ।

তৎপরে কথা উঠিবে, দুই তিন পালান—সকাল সন্ধ্যা—স্থল চলিবে না। অতি প্রাণকণক হুস্ত হইবেন না। ছেলেরা সবটুকু উপস্থাপন করে প্রতি করিবে। প্রাতঃকালে স্থল লেখাপড়ার সময়ও খুব কমই হইয়া থাকে।

তারপরে আসিল তাহাদের কথা: বাহাদুর শুধু অর্থোপার্জনকর অন্য ব্যবসায়ীর মনোভুক্তি লইয়া স্থল চালান। সত্যসত্যই বাহাদুর এটুকু প্রথম স্থল পড়েন, তাহাদের অল্পোপ পরিচয়, চুক্তিতা, স্বার্থত্যাগ অবশ্যীঃ। কিন্তু যেই স্থল বড় হইয়া ওঠে, বিশ্ববিদ্যালয়ের (এবং মাদানিক শিক্ষাবোর্ডের) অধ্যয়ন গ্রহণ করা হয়, অমনি বেশকিছু লোক তাহা যিগকে আর প্রাণা সম্মান দিতে বাড়ি নন, বহু চোবের খাতার তাহাদের নাম লেখেন। প্রণেহীন, অকর্মণ্য, নিজস্বগণও তাহাদের কাঁবে কেলিতে ক্রটি করেন না। ইহার ফলে কলিকাতার বহু অধ্যয়নিত নামকান্য স্থল উঠিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়াও অনেক স্থলে থাকে কমিটির মেম্বারদের মধ্যে বেয়াবেয়ি।

সবেরই স্থলের ছাত্রসংখ্যা নানা কারণে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। গ্রামা স্থলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় একই থাকে।

সাময়িক ভাবে অহুমোহিত হুলে গ্রাম মেড়নত হইতে দুই শতের বেশি ছাত্র থাকে না। উহার চতুর্থাংশ পূরা বেতন দেয় না, বা দিতে অক্ষম। তিন চারটি গ্রাম একত্র হইয়া যে খুল করিবে, তাহাও গ্রাম্য দলান্ধিতে সম্ভবপর হয় না। যদিও বা কোন স্থানে সাময়িকভাবে সম্ভব হয় হইয়া কবে, তবে কিছু দিন পরে তাগের মায়েদ জাখ বহু হইয়া যায়।

তৎপরে আসিল আমাদেব গ্রাম্য পাঠশালা। লেখনিও সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে অক্ষম। তাহাও সরকার খতম করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের পাঠশালাগুলিকে প্রাণবন্ত না করিলে, প্রত্যেক বালককে লেখাপড়ার সুযোগ না দিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ক চিকান ডিকার কুলি নিয়া থাকিতে হইবে। যাবীন দেশের শিক্ষকগণ যদি এই ডিকালক অয়ে পবিপুটে হন, ছাত্রগণও এই দৃষ্টি অবলম্বন করিবে। কাজেই আইন করিরাই হউক, বা সরকারের টাকারই হউক, দেশের নিরক্ষরতা দূর করা প্রথম কর্তব্য। তৎপরে মাধ্যমিক শিক্ষা, ত্রয়ে কলেজের শিক্ষা, সর্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার চিন্তা আসিলে ভাল নয় কি? ইহাতে ব্যয়বাহন্যও করিবে। সরকার পরিচালনার চিন্তা হইতে আপাততঃ অব্যাহতিও পাইবেন। ইত্যবসরে দেশ ক্রমশঃ লেখাপড়ার কদর বৃদ্ধিবে। দুই মাস বিদেশে যুরিয়া ঘরের ববর কুলিয়া গিয়া পরের অগ্রকরণে দেখকে বড় করা যায় কি? No man was ever great by imitation.

বাহাতে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা পাকা হয়, ব্যাপক হয় সেই চেষ্টা আমাদেব প্রথম হওয়া উচিত। নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানালোকে নিজেব অবস্থা বুঝুক, দেশের দেশের অবস্থার কথা চিন্তা করুক, দেশ উন্নত হইলে অপর দেশের স্বা-ভাষ্যের কথা নিজেই বুঝিতে পারিবে। সত্য-মতানো কুলি কাগজের প্রাণগলান বিবৃতিতে কেবল অতাবজ্রিদের আলোয়ার আলোব শিছনে চুটাইবে। চুটানো জলকে প্রথমে কলনার কলনীতে তৎপর বালুর কলনীতে কেলিয়া জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়, তারপরে কপূর কিংবা কেওড়া মিশাইয়া পান করিলেই ভাল হয়। মদলা জলে কেওড়া দিলে আপাততঃ সুগন্ধযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জীবাণু যোগ বিস্তার করিবেই, তাহাতে সম্বদ নাই। সুতরাং জলকে প্রথম গরম করা প্রয়োজন, তৎপর পরিষ্কারের ব্যবস্থা। গ্রাম্য পাঠশালাগুলির সংস্কার করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজের শিক্ষা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বর চালিয়া দেওয়া কি সমীচীন? গাছেব গোড়া কাটিয়া মাথার জল দিলে কি গাছ বাচে? সরকারের যেমন সব ঠিক আছে কিছুই নড়ে নাই; শিক্ষারও যেখানে যেমন ব্যবস্থা আছে আপাততঃ ঠিক রাখিয়া বরং উৎসাহ দান করিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করিলে, লক্ষাধিক ম্যাট্রিকুলেট ও হাজার পনের প্রাজুরেট বেকারের সংখ্যাও কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইত। মাসিক ২৫০৮ টাকার বেতনের প্রতীকার বসিয়া বসিয়া পার্যায়িক মানসিক বৈজ্ঞান্য সকাব হইতেছে, ইহাতে কি আমাদেব 'বাবীন' দেশের অকল্যাণ হইতেছে না?

‘বানান ভুল’

[প্রিয়তম সেন]

গত জীবন সংখ্যায় বানান ভুল সম্বন্ধে যে
মন্তব্য লিখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে আমায়ই এক
ভুল বা এক জুটি থাকিয়া গিয়াছে। তাঃ বোনের
নির্দেশ ছিল, কুটম্বল খেলার পরিবর্তে ব্যাকমিটন
খেলা; আমি যেমন লিখিয়াছি, টেনিসের পরিবর্তে,
তাঁহা নয়। সম্ভবত প্রবীণ চিকিৎসক পেলার বৃহত্তর
ক্ষেত্র হইতে ক্ষুদ্রতর পরিমণ্ডে বানিয়া শিক্ষার্থীর
মধ্যে সতর্কতার ভাব জুটাইয়া তুলিতে চাহিয়া-
ছিলেন। যে বছর নিকট হইতে এই চিকিৎসার কথা
জানিয়াছিলাম, তিনি এই ভুল পরিচয় দিয়াছেন
যদিও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

চিকিৎসা শুধু বোনের নয়, মুখ্যত বোণীই
চিকিৎসা। হস্তবাং কোন্ নির্দেশ বা কোন্
বিধান কাহার ক্ষেত্রে খাটিবে, চিকিৎসকই
তাঁহা বলিতে পারেন। এট কথা বলিতেছি এজন্য
যে, কেহ কেহ আমার পূর্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত
হোমিওপ্যাথি ঔষধটির নাম জ্ঞানিতে চাহিয়াছেন।
হোমিওপ্যাথেরা তো দিনের করিষা বোনের লক্ষণ
অনুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করেন, হস্তবাং সকল
ক্ষেত্রে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে
চলাই সঙ্গত। অমনোযোগ বোনে দাড়াইলে
তাঁহার চিকিৎসাও ভেঁয়ানি হওয়া চাই।

“শিক্ষা”র নিয়মাবলী

১। ‘শিক্ষা’ বাংলা: মাস অন্তর্গত্রে বাহির হইবে। বার্ষিক টাকা তিন টাকা আগ্রিম দেয়। প্রতি
সংখ্যা ১০ আনা মাত্র।

২। অগ্রহাণে হইতে বৎসর আবৃত্ত। বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহকসংখ্যা গণনা করা হয়।
বৎসরের যে কোনও সময়ে গ্রাহক হইলেও অগ্রহাণে হইতে কাগজ পাইবেন।

৩। শিক্ষা তির অন্য বিষয়ের আলোচনার অন্তর্গত এ কাগজ নয়

৪। প্রবন্ধাদি কাগজের এক দিকে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। অমনোবীত ঘটনা কেবল বেওয়া
হয় না।

৫। প্রকাশের অন্ত প্রবন্ধাদি ‘শিক্ষা’ সম্পাদক, ১ ভোক্তার সেন, কলিকাতা ২২, এই ঠিকানায়
পাঠাইতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ২০০ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১২০ টাকা, সিকি ৭০ টাকা। পৃষ্ঠা
দুইয়ের কভারের পৃষ্ঠা ২৫০, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ১৬০, সিকি পৃষ্ঠা ৯০ টাকা।

৭। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাব্যক, ১ ভোক্তার সেন, পোঃ বাসবিহারী
এতিনিউ, কলিকাতা ২২, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

[ত্রিবিধবৃত্তম সেন]

বাংলা বর্ষলিপি । ১৩৪২ (২২য় বর্ষ) সম্পাদক

ত্ৰিবিধবৃত্তম আচাৰ্য চৌধুরী বি. এ ।

সংক্ৰান্তি বৈঠক, ১৭ প্ৰতিষ্ঠা ঘণ্টা,

বালিগড়, কলিকাতা—২২ ।

মূল্য আড়াই টাকা ।

অসংখ্য বারের মত এদারও সংক্ৰান্তি বৈঠক 'বাংলা বর্ষলিপি' হস্ত মূলে। প্রকাশ করিয়া সাধারণের হিতসাধন করিয়াছেন। আভিকার ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ইহার অনন্য চারিত্ৰ্য পত্রমণ্ডির মধ্যে মিলিবে। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ সকল স্থানেই লোকসংখ্যা, কলিকাতা ও হাওড়ার বালকট, বেলাপুলা ইত্যে আয়ত্ত করিয়া বিজ্ঞান ও শাসন পরিষদের সহজে সহজ জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠক এখানে অনায়াসে পাইবেন। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মানচিত্র সম্বন্ধিত কথার ইহার মূল্য বাড়িয়াছে। বঙ্গ শিকশালেই বাংলা বর্ষলিপি থাকা অবস্থাই বাঙ্গালী, আশা করি বঙ্গ শিক্ষার সকল কেন্দ্রেই ইহার একখণ্ড দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বাংলা হিন্দী ইংরাজী লক্ষবোধ ও কথোপ-
কথন শিক্ষা।

ত্রিবিধবৃত্তম দামগড় । দামগড় প্রকাশন, ১৮
ল্যান্ডাউন গ্রেস, কলিকাতা ২২ । মূল্য এক টাকা ।

বাঙ্গালী হিন্দী ভাষা লেখার মত ব্যাকরণ
কিছু কিছু প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু
লোকে ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষা না শিখিয়া
সোজাশুজি কথাবার্ড বলিতেই ভালবাসে। বতাই
ব্যাকরণ না হইলে নয়, তাহা কোনও রকমে জানিয়া
লইয়া ভাষা ভাষা হিন্দীতে কাজ চালাইতে চায়।
এই বইখানিতে লেখক বাংলা শব্দ, ভাষার হিন্দী
ও ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী
উচ্চারণও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; অসংখ্য বারের
মত উচ্চারণের বিশিষ্ট রকমের, তাহা শিক্ষকের
নিকট কিংবা হিন্দী ভাষাভাষীর নিকট না শিখিলে
হইবে না। স্বরাস্ত বা accent শিখিতে হইবে।

শুধু বিভাগের ছাত্রছাত্রী নয়, সাধারণ শিক্ষার্থী
পক্ষেও এই পুস্তকে খুবই সাহায্য হইবে, এবং
ইহাতে হিন্দীকে বাঙ্গালী সমাজে চালু করার
সুযোগ বাড়িবে।